মাসুদ রানা
হাইজ্যাক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা
দুই খণ্ড
একত্রে

মাসুদ রানা

হাইজ্যাক

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভাঙা এক ব্রিজের ওপারে সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল, ব্রিজ মেরামত করে চলে আসার চেষ্টা করছে এপারে। এসেই খুন করবে সবাইকে, নির্বিচারে। যতভাবে সম্ভব শত্রুদেরকে ছয়টা দিন দেরি করিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে সাহায্য আনতে চলল রানা আর লোপেজ। ভয়ঙ্কর হিমবাহ্ পেরিয়ে তুষার মোড়া আন্দেজ পর্বতমালার দুর্গম চূড়া ডিঙিয়ে, পৌঁছতে চাইছে ওরা আলটিমিরোসে—ওখানে যদি এয়ার ফোর্সের ফোরটিনথ স্কোয়াড্রন থাকে, তাহলে রক্ষা পাবে সবার জীবন। কিন্তু এইট্থ স্কোয়াড্রন থাকলেই সর্বনাশ! কি দেখবে ওরা অসাধ্য সাধন করে গিরিপথ পেরিয়ে? এদিকে এরাই বা কিভাবে ঠেকিয়ে রাখবে শত্রুদের? জানা কথা—ভুল লোকের হাতে গিয়ে পড়বে মাসুদ রানা।...তাই হয়ে থাকে সাধারণত। জানা কথা—আগেই ব্রিজ পেরিয়ে এপারে এসে পড়বে শত্রুদল।... সেটাই স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু তারপর? কি হবে তারপর?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

হাইজ্যাক

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM
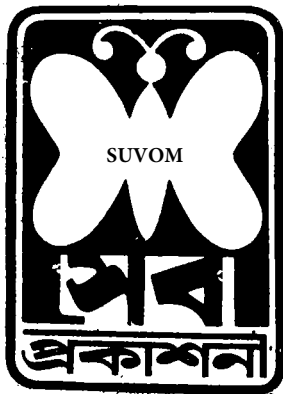
সেবা প্রকাশনী

পঁয়ত্রিশ টাকা

ISBN 984 16 9076 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮০
পঞ্চম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
HIJACK
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক
কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল
অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর
ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীল ছবি
প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা
হংকং সম্রাট*কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী
আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান
সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি
তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য
উদ্ধার*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী
বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ
চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ
আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয় শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট
মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে
মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক
তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর
কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া
ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ* নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি
কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা।

হাইজ্যাক-১

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮০

এক

দক্ষিণ আমেরিকা।

ক্যারিবিয়ান সাগরের তীর থেকে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কেপ হর্ন পর্যন্ত সাড়ে চার হাজার মাইল লম্বা বৈরী পার্বত্য এলাকা—অ্যান্ডেজ পর্বতমালা, দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর হয়ে লম্বালম্বি দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা দেশের উপর।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে বলিভিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে অ্যান্ডেজ এখানে কর্ডিলেরা নামে পরিচিত।

সান ক্রোস। ছোট একটা এয়ারপোর্ট। দু'ঘণ্টা বাকি ভোর হতে। ক্রিমসন কালারের একটা ঝরঝড় মার্কা স্পোর্টস কার ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল টারমাকে ঢোকার গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে ঘটাং করে দরজাটা বন্ধ করে দিল রবিনসন। নিবিড় ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে সে ফ্লাইট ম্যানেজার গেভিন লায়ালের জরুরী তলব পেয়ে। এ মাসে যে ক'ঘণ্টা প্লেন চালাবার কথা, তাকে দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি চালিয়ে নিয়েছে গেভিন; অথচ মাসের আজ মাত্র বিশ তারিখ। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কিছু বলতে গেলেই চাকরি ছেড়ে দিতে বলবে বদমেজাজী লোকটা।

'অ্যান্ডেজ এয়ারলিফট' অখ্যাত একটা এয়ারলাইন্স। তার মত ভাল একজন পাইলটের উপযুক্ত জায়গা এটা নয়। চেষ্টা করলে এর চেয়ে অনেক ভাল চাকরি পেতে পারে সে। কিন্তু স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জন্যে এলাকাটা আদর্শ, শুধু এই কারণে অ্যান্ডেজ এয়ারলিফটে দীর্ঘ পাঁচ বছর রয়ে গেছে সে—এখন আর অন্য কোথাও যেতেও ইচ্ছা করে না তার।

টেলিফোনে গেভিন তাকে জানিয়েছে, স্যামেয়ার-এর একটা সেভেন-টু-সেভেন বোয়িং যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন সান ক্রোস এয়ার-স্ট্রিপে নামতে বাধ্য হয়েছে, বোয়িং-এর কয়েকজন ভি.আই.পি প্যাসেঞ্জারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার সান্তিলানায় পৌঁছে দিতে হবে।

অ্যান্ডেজ এয়ারলিফটের সাথে সাউথ আমেরিকান এয়ারলাইন্সের কোন তুলনাই হয় না। স্যামেয়ারের কর্মকর্তারা বোধ হয় অ্যান্ডেজ এয়ারলিফটের নামই শোনেনি। দূর পাহাড়ের খনিগুলোয় শ্রমিকদের বহন করে টিকে আছে অ্যান্ডেজ এয়ারলিফট, কিন্তু স্যামেয়ার প্রথম শ্রেণীর অভিজাত এয়ারলাইন্স। আরামপ্রিয় সৌখিন ধনী লোকেরা চড়ে ওদের প্লেনে। স্যামেয়ারের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগের হঠাৎ পাওয়া এই সুযোগ তাই হাতছাড়া করতে চায়নি উচ্চাকাঙ্ক্ষী

গেভিন। উপরি কিছু রোজগার এবং একটা উপকার করে দিয়ে স্যা ময়ারের সুনজরে পড়াই তার উদ্দেশ্য।

গেট পেরিয়ে টারমাকের উপর দিয়ে হাঁটছে রবিন। ঘাড় ফিরিয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে তাকাতেই মস্ত সেভেন-টু-সেভেন স্যামেয়ার বোয়িংটাকে দেখতে পেল সে। কন্ট্রোল টাওয়ার ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে গেল দৃষ্টি। হ্যাঙ্গারের সামনে জীর্ণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের ডাকোটা, উজ্জ্বল আলোয় এত দূরে থেকেও দেখতে পাচ্ছে সে কোমর বাঁকা করে ভারী কাঠের বাক্স তুলছে ওতে গ্রাউন্ড কর্মীরা।

মেইন হলরুমে রাত-জাগা ক্লান্ত লোকের ভিড়। সবার চোখেমুখে অসন্তোষের ছাপ। এরা সবাই স্যামেয়ারের প্যাসেঞ্জার। এদের মধ্যে মাত্র বারোজন ভি.আই.পি প্যাসেঞ্জার, বাকি একশো চল্লিশ জনকে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না স্যামেয়ার আরেকটা বোয়িং পাঠিয়ে এদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রবিন, এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই তার। ভিড় ঠেলে ফ্লাইট ম্যানেজার গেভিনের কামরায় ঢুকল সে।

স্বভাবসুলভ উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল গেভিন। মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'এত দেরি করলে যখন, না এলেই পারতে!' রবিন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে তার মুখের সামনে হাত-ঝাপটা মেরে ধমকে উঠল, 'থামো!' ধপ করে বসল সে, গোলগাল মস্ত শরীরটা ডুবে গেল চেয়ারে। 'ব্যাপারটা কি, বুঝে নাও। স্যামেয়ারের সাথে চুক্তি হয়েছে ওদের বারোজন প্যাসেঞ্জারকে সান্তিলানায় পৌঁছে দেব আমরা। একনম্বর ডাকোটা নিয়ে যাচ্ছ তুমি, সার্ভিসিং-এর কাজ শেষ হয়ে এসেছে ওটার।'

'আমার সাথে কে যাচ্ছে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রবিন।

'বেনো।'

বিরক্তিতে ভরে উঠল রবিনের মন। রিচার্ড বেনোকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। বাচাল, শঠ, ঈর্ষাপরায়ণ লোক। 'আর কাউকে পাওয়া গেল না?'

'তোমার মত হাতে-পায়ে ধরতে হয়নি ওকে, স্বেচ্ছায় যেতে রাজী হয়েছে ও।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের। 'তাই নাকি?'

'বোয়িংটা নামার সময় এখানেই ছিল ও,' বেনোর প্রশংসায় গলার স্বর মোলায়েম হয়ে উঠল গেভিনের, 'আবার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে ও, প্রতিষ্ঠানের ওপর সত্যিই দরদ আছে ওর। ওর উপস্থিত বুদ্ধিরও প্রশংসা না করে পারি না। স্যামেয়ারের কয়েকজন ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারকে সান্তিলানায় পৌঁছে দেবার আইডিয়াটা ওর মাথাতেই আসে। সাথে সাথে ফোন করে আমাকে ও।' একটু বিরতি নিয়ে রবিনের ভাবলেশহীন মুখের উপর হাসল সে, বলল, 'ভাবছি একসাথে দুটো ইনক্রিমেন্ট দিয়ে অফিসেই বসাব ওকে।'

'প্লেনে ওর সঙ্গ আমার পছন্দ নয়।'

'স্বীকার করি তুমি একজন ভাল পাইলট, সেজন্যেই কো-পাইলট হিসেবে থাকছে তোমার সাথে বেনো, কিন্তু তাই বলে গর্ব করার কিছু নেই তোমার।

সুযোগ পেলে বেনোও একজন তুখোড় পাইলট হতে পারত।

'সেভেন-টু-সেভেন-এর গোলমালটা কোথায় দেখা দিয়েছে?'

'ফুয়েল ফিড-এ কি যেন হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখছে ইঞ্জিনিয়াররা,' কয়েকটা কাগজের শীট টেবিল থেকে তুলে নিল গেভিন, 'সার্ভিসিং-এর জন্যে মেশিনারীর কিছু বাক্স যাচ্ছে, এই নাও মেনিফেস্টো।'

'গড! এটা একটা আনশিডিউলড ফ্লাইট, এ-ধরনের ঝুঁকি না নিলেই কি নয়?'

'বাজে বকো না! অর্ধেক প্লেন খালি যাবে, তা আমি হতে দেব না। সাথে ফুল লোড নিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

জানালা পথে চট করে আকাশটা একবার দেখে নিল রবিন। চাঁদের আলোয় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখা যাচ্ছে। শান্ত আবহাওয়া। কিন্তু, ভাবছে সে, অ্যান্ডেজের উপর আবহাওয়ার অবস্থা এখন কেমন কে জানে! 'আমি ভেবেছিলাম ইমার্জেন্সী ট্রিপটা অন্তত নির্ঝঞ্ঝাট হবে। প্রতিবার ওভারলোড নিয়ে গিরিপথের মাঝখান দিয়ে যাওয়া—মাতালের মত এদিক ওদিক কাত হয় ডাকোটা, ভাগ্যের জোরে বারবার নাও বেঁচে যেতে পারে...'

'প্রথম শ্রেণীর একজন পাইলটের মুখে এ কথা শোভা পায় না,' ব্যঙ্গের সুরে বলল গেভিন, 'সময়ের দিক থেকে ভোরবেলাটা অ্যান্ডেজ নিরাপদ, বেলা চড়লে রোদের তাপে বরফ গলতে শুরু করলে পরিস্থিতি খারাপ হয়। সুতরাং আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই তোমার।'

কার্গোর মেনিফেস্টো-র সাথে প্যাসেঞ্জারদের তালিকাটাও রয়েছে। নামগুলোর উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল রবিন।

১। মিং হফ
২। মিসেস হফ
৩। ড. রেমন্ড কোনালি
৪। সিনর মন্টেস
৫। সিনোরিটা মন্টেস
৬। মি. মিগুয়েল লোপেজ
৭। মিস সোহানা চৌধুরী
৮। মি. গিলটি মিঞা
৯। ড. স্যামুয়েল জনসন
১০। মি. মাসুদ রানা
১১। মি. জোসেফ মিলার
১২। মিস জুডি

অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। খালি হয়ে যাচ্ছে হলরুম। ভাগ্যহত প্যাসেঞ্জাররা লাইন দিয়ে এয়ারবাসে চড়ছে, হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে ওদেরকে। সোফায় বসে থাকা একদল লোককে দেখে রবিন বুঝল, এদেরকে নিয়েই অ্যান্ডেজ পেরোতে হবে তার। হলরুমে থামল না রবিন, বাইরে বেরিয়ে এসে টারম্যাকের উপর দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে এগোচ্ছে। এই সুযোগে পড়ে নিচ্ছে মেনিফেস্টোটা। কার্গোর মোট ওজন দেখে আঁতকে উঠল সে। বারবার আই. এ. টি. এ-র নিয়ম

ভেঙে গেভিন অবৈধভাবে অনেক বেশি ওজনের মাল পাঠাচ্ছে, হঠাৎ যদি কোনদিন ইন্সপেক্টর এসে দেখে ফেলে, ব্যবসার লাইসেন্স নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। মুঠোর ভিতর নিয়ে পিষে গোল পাকিয়ে ফেলল সে কাগজটাকে।

ডাকোটার আন্ডার-ক্যারেজের নিচে দাঁড়িয়ে আয়েশ করে সিগারেট টানছে বেনো। রবিনকে দেখে টান টান করল বুকটা, গা-জ্বালানো একটু বাঁকা হাসি ফুটল মুখে, কিন্তু রবিনের দিকে এগিয়ে এল না। রবিনই এগিয়ে গেল, বলল, 'কার্গো তোলা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'চেক করেছ? ঢিল করে বাঁধা হয়নি তো?'

মুচকি হাসিটাকে মাঝপথে মুখ থেকে মুছে ফেলে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল বেনো। বলল, 'আমি নিজে চেক করেছি, খামোকা দুশ্চিন্তা করবেন না, সিনর।'

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেনোর দিকে রবিন। লোকটার চেহারার মধ্যে আশ্চর্য সপ্রতিভ একটা ভাব আছে, টুথব্রাশের রোঁয়ার মত খাড়া এবং সমান করে ছাঁটা গোঁফ, চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততার ঝিলিক। সবজান্তা ঢংয়ের হাসিটা লেগেই আছে মুখে। বেনোর এই হাসিটাকেই সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে রবিন।

'আবহাওয়ার খবর কি?'

আকাশের দিকে তাকাল বেনো। 'দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে।'

'তোমার দেখায় কিছু এসে যায় না,' রূঢ় গলায় বলল রবিন, 'মেটিয়রলজিক্যাল রিপোর্ট চাই আমি।'

বেনোর গমন পথের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রবিন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল কার্গোর দরজার দিকে। সমসাময়িক আর সব প্লেনের তুলনায় ডাকোটা অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য একটা সৃষ্টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাগড়া ঘোড়া বলে ডাকা হত একে। নিজের যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু সে যুগ পেরিয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

অ্যান্ডেজ এয়ারলিফটের এই ডাকোটার বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় যত্ন দেয়া হয়নি, অথচ খাটানো হয়েছে নির্দয় ভাবে। অন্য কোন পাইলটের পক্ষে এই প্লেন চালানো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কন্ট্রোল প্যানেলের অনেক নব, বোতাম, হাতল ভেঙে গেছে। ছেঁড়া তার জোড়া দেয়া হয়েছে অসংখ্য জায়গায়। ইঞ্জিনের অবস্থাও তথৈবচ। নাট-বল্টু সব ক্ষয়ে গেছে, ফুরিয়ে এসেছে যন্ত্রাংশের আয়ু। সুকৌশল দক্ষতার সাথে, অত্যন্ত সাবধানে একমাত্র রবিনই পারে ইঞ্জিন দুটোকে বশে রাখতে। কিন্তু জানে ও, একদিন বেঁকে বসবে ওরা, খেপে উঠবে প্রতিশোধ নেবার জন্যে, সেদিনই তুষার ধবল অ্যান্ডেজের চোখা মিনারগুলোর উপর প্রাণ দিয়ে চুকিয়ে ফেলতে হবে সমস্ত দেনা পাওনা।

প্লেনে উঠে চারদিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাল রবিন। সামনের দিকে দশটা সীট থাকার নিয়ম, কিন্তু অতিরিক্ত আরও দুটো সীট বসিয়েছে গেভিন। আগে এগুলো গদীমোড়া ছিল, এখন শুধু চামড়া দিয়ে মোড়া, তাও এখানে সেখানে ফেটে-ছিঁড়ে গেছে।

ফিউজিলাজের বাকি অংশে কার্গো রাখা হয়। এখন সেখানে অনেকগুলো বাক্স

দেখছে রবিন। গুনে দেখল এগারোটা। লেদার স্ট্র্যাপগুলো টেনেটুনে পরীক্ষা করল ও। সবগুলো ঢিলে হয়ে আছে। বাঁধনগুলো শক্ত করতে গিয়ে সেই পুরানো ভয়টা ভার হয়ে চেপে বসল বুকে। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে কার্গো যদি হঠাৎ কোনদিন একদিকে কাত হয়ে যায় অথবা তার দোষে ল্যান্ডিংয়ের সময় চাকার সাথে যদি রানওয়ের বেমক্কা ধাক্কা লাগে, এবং তার ফলে ভারী বাক্সগুলো যদি পিছলে ছুটে আসে সামনের দিকে, একজন যাত্রীও প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

ককপিটে ফিরে এসে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করল রবিন। পোর্ট ইঞ্জিনে কাজ করছে একজন মেকানিক, জানালা দিয়ে গলিয়ে মাথাটাকে বাইরে বের করে দিয়ে সব ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করল তাকে। তারপর প্লেন থেকে নেমে হ্যাঙ্গারে চলে এল চীফ মেকানিক ফেজের খোঁজে।

ফেজ লোকটা ভাল। রবিনের সাথে তার সম্পর্কটাও সুন্দর। রবিনের বিশেষ দুর্বলতার কথা জানা আছে তার, গেভিনের কড়া নিষেধ অমান্য করে রবিনের জন্যে মদের দু'একটা বোতল প্লেনে রেখে দিতে কখনও ভুল হয় না তার।

পরস্পরের ভাল মন্দ জেনে নেবার ফাঁকে ফেজ রবিনের ফ্লাস্কটা হুইস্কিতে ভরে দিল। দু'ঢোক গলায় ঢেলে বিদায় নিল রবিন। ডাকোটার কাছে ফিরে আসছে ও। ফুটতে শুরু করেছে ভোরের ম্লান আলো।

ককপিটে বসে ব্রীফকেসের টুকটাক জিনিস নাড়াচাড়া করছে বেনো, রবিন জানতে চাইল, 'মেট-রিপোর্ট পেয়েছ?'

কাগজের একটা শীট রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল বেনো। সেটা নিয়ে রবিন বলল, 'সাবধানে অ্যাপ্রনের কাছে নিয়ে গিয়ে থামাও প্লেনটাকে।'

মেট-রিপোর্টে চোখ রাখল রবিন। ভাল আবহাওয়া। ঝড় নয়, কুয়াশা নয়, ভারী মেঘ নয়—পাহাড়গুলোর উপর শান্ত এবং পরিষ্কার আবহাওয়া আশা করা হয়েছে। কিন্তু মেটিয়রলজিস্টদেরও ভুল হয়, জানে রবিন। আবহাওয়ার রিপোর্ট যত ভালই হোক, স্নায়ুতে চাপের মাত্রা কখনও কমে না ওর। মাটি থেকে শূন্যে ওঠার সাথে সাথে এই চাপ আরও বেড়ে যায়। আবার মাটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত হয়ে থাকে রবিন। একবারের জায়গায় বারবার চেক করে কলকব্জা। সব কিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আগেভাগে ধারণা পেতে চায়। এই গুণটা আছে বলে আজও বেঁচে আছে ও, অথচ ওর চেয়ে অনেক ভাল পাইলট অকালে ঝরে গেছে দুনিয়ার বুক থেকে।

মেইন বিল্ডিং-এর সামনে থামল ডাকোটা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রবিন দেখল আরোহীদের দলটাকে পিছনে নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে গেভিন। বেনোকে বলল ও, 'প্যাসেঞ্জারদের সীট বেল্ট ঠিক মত বাঁধা হয় কিনা দেখে এসো।'

'কেন?' তড়পে উঠল বেনো, 'আমি হোস্টেস নাকি!'

'তা নও। কিন্তু ককপিটের এই পাশে যে লোকটা বসে থাকে তার নির্দেশ কো-পাইলটের মানতে হয়। যাও।'

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল বেনো। মেইন কেবিনের দিকে এগোল সে। রবিনের দিকে পিছন ফিরতেই গাম্ভীর্য খসে পড়ল তার চেহারা থেকে। আপন মনে হাসছে

সে।

দ্রুত ককপিটে ঢুকল গেভিন। একটা কাগজ রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সই করো।'

জ্বালানী এবং ওজনের আই.এ.টি. এ সার্টিফিকেট। ওজনের ব্যাপারে বরাবরের মত এবারও কারচুপি করছে গেভিন, দেখেও কোন মন্তব্য করল না রবিন। মুখ বুজে সই করে দিল কাগজটায়।

'সান্তিলানায় পৌঁছেই খোঁজ নেবে রিটার্ন কার্গো আছে কিনা,' বলল গেভিন। 'থাকলে ফোন করবে আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রবিন। গেভিন বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে ভিতরে ঢুকল বেনো।

'স্ট্রিপের শেষ মাথায় নিয়ে চলো,' বলল রবিন। গরম করে তোলার জন্যে রেডিওটা অন করল ও।

মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ডাকোটা। রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছুল। হঠাৎ খেয়াল হলো রবিনের, গেভিন তাকে ফ্লাইট নাম্বার দেয়নি। তবে, আশা করল ও কন্ট্রোল নিশ্চয়ই জানে ব্যাপারটা। বোতামে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোন অন করল ও। বলল, 'এ. এ. স্পেশাল ফ্লাইট, ডেসটিনেশন সান্তিলানা—এ. এ. টু সান ক্রোস কন্ট্রোল—রেডি টু টেক অফ।'

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল রবিনের কানে, 'সান ক্রোস কন্ট্রোল টু অ্যান্ডেজ এয়ারলিফট স্পেশাল। পারমিশন গিভেন—টাইম টু পয়েন্ট থ্রী থ্রী জি.এম.টি.।'

'রবিন, অ্যান্ড আউট,' থ্রটলের দিকে হাত বাড়াল রবিন, স্টিকটা ধরে এদিক ওদিক দোলাতে শুরু করল। বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ওর কপালে। এখানে সেখানে আটকাচ্ছে স্টিকটা। বেনোর দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কন্ট্রোল থেকে হাত সরাও।' তারপর দ্রুত থ্রটলের লিভারটা সামনের দিকে ঠেলে দিল ও, সাথে সাথে গর্জে উঠল ইঞ্জিন দুটো। চার মিনিট পর লম্বা এক দৌড় শেষে শূন্যে ডানা মেলল ডাকোটা।

মগ্ন হয়ে পড়ল রবিন। ডাকোটার নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব কিছুর অস্তিত্ব ভুলে গেছে এখন সে। পৃথিবীর ছাদে উঠে যাচ্ছে প্লেন। দীর্ঘ যাত্রা। ঝাড়া একটি ঘণ্টা নিজেকে দম ফেলার অবকাশ দিল না রবিন। সেকেলে বুড়িটা নতুন কোন চমক দেবার মতলব যদি এঁটে থাকে, আগেভাগে তার আভাস পেতে চায় ও। কথা শোনে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে যন্ত্রপাতি নেড়ে হুকুম করছে বারবার, ডাকোটার কম্পন অনুভব করে বুঝতে চাইছে তার মতিগতি। ষাট মিনিট পর একটু স্বস্তিবোধ করল ও। আড়চোখে এই প্রথম তাকাল বেনোর দিকে।

ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে বেনো। উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে হারিয়ে গেছে তার শূন্য দৃষ্টি।

অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে অটোমেটিক পাইলট চালু করে দিল রবিন, কিন্তু এরপরও পনেরো মিনিট নজর বন্দী রাখল কন্ট্রোল প্যানেলকে। শেষ ফ্লাইটে প্লেনটার আচরণের মধ্যে গোলযোগের আভাস প্রকাশ পেয়েছিল, তবে ফেজ ওকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে, মেরামতের পর এখন আর বিপদের কোন ভয় নেই।

ফেজের উপর বিশ্বাস রাখে ও, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে—সাবধানের মার নেই, একথা জানা থাকায় সব কিছু নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিতে অভ্যস্ত সে।

শরীরটাকে ঢিল করে দিয়ে সীটের পিছনে হেলান দিল রবিন। সামনে তাকাল। গুটি গুটি পায়ে পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসছে ভোর, কিন্তু মাটি থেকে ওরা অনেক উপরে রয়েছে বলে সামনের আকাশটা আশ্চর্য আলোয় উদ্ভাসিত দেখাচ্ছে। কারণটা জানা আছে রবিনের। অ্যান্ডেজের আকাশ ছোঁয়া তুষার ধবল চূড়ায় সূর্যের প্রথম কিরণ পড়েছে, বরফে লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই আলো। পাহাড়গুলো এখনও অদৃশ্য, নিচের বনভূমি থেকে উঠে আসা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে।

অবসর পেয়ে আরোহীদের কথা ভাবতে শুরু করল রবিন। নিজেদেরকে কিসের ভিতর ঢুকিয়েছে তা কি ওদের জানা আছে? এটা প্রেশারাইজড জেট প্লেন নয়, অথচ অনেক উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে, বাতাসে অক্সিজেন কম। ওদের মধ্যে হার্টের রুগী না থাকলেই হয়, ভাবল রবিন। উচিত ছিল সময় থাকতে পরিস্থিতিটা ওদেরকে জানানো, কিন্তু সে দায়িত্ব গেভিন পালন করেনি। প্লেনে আধুনিক অক্সিজেন মাস্কেরও ব্যবস্থা নেই। পোর্ট এবং স্টারবোর্ড সাইডে নামকাওয়াস্তে অক্সিজেন বটলের সাথে মাউথ টিউব ফিট করা আছে।

জুলফির নিচেটা চুলকাতে চুলকাতে চিন্তা করছে রবিন। তার আজকের প্যাসেঞ্জাররা শ্রমিক নয়, এরা সবাই অভিজাত ভদ্রলোক, স্যামেয়ারে চড়তে অভ্যস্ত, কষ্ট সহ্য হয় না ধাতে। প্রত্যেকেরই কাজের তাড়া আছে, তা না হলে অ্যান্ডেজ এয়ারলিফটে চড়ার কথা কল্পনাও করত না। কি করা উচিত এখন তার? নিয়ম ভেঙে কথা বলবে ওদের সাথে? ওরা যখন দেখবে অ্যান্ডেজের মাথার উপর দিয়ে নয়, সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ডাকোটা, আতঙ্কে চঞ্চল হয়ে উঠবে সবাই। তার চেয়ে আগেই ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা ভাল।

ইউনিফর্ম ক্যাপটা ঠেলে মাথার পিছন দিকে নামিয়ে দিল রবিন। বলল, 'টেক ওভার, বেনো। যাত্রীদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আমি।'

ভুরু জোড়া কপালে তুলল বেনো। বিস্ময়ের ধাক্কায় হাসতে ভুলে গেছে সে। 'কেন?'

'কেন আবার! দরকার বলে মনে করছি, তাই।'

'ও, বুঝেছি! ওই মেয়েটাকে আরেকবার দেখতে চান...'

'মেয়ে? কোন্ মেয়ে? মিস জুডি?'

'ঠিক ধরেছেন,' হাসল বেনো। 'মেয়ে তো নয়, পাকা আপেল। টসটস করছে...'

'হয়েছে,' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

'ভুল করে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটার দিকে নজর দেবেন না আবার, সিনর,' বলল বেনো। 'সাথে বয়ফ্রেন্ড আছে ওর।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রবিন। ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়ায়। লোকটার ক'টা দাঁত ফেলে দেয় ঘুষি মেরে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে দরজা খুলল ও, ঢুকল মেইন কেবিনে।

প্রায় একই সাথে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে বারোজন প্যাসেঞ্জার। স্মিত

হাসল রবিন, ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'গুড মর্নিং, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর বলল, 'এক ঘন্টার মধ্যে পাহাড়ে পৌঁছুব আমরা। শীতের প্রকোপ তখন খুব বেড়ে যাবে, তাই তোমাদের সবাইকে অনুরোধ, যে যার ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে নাও। এটা প্রেশারাইজড প্লেন নয়—তবে চিন্তার কিছু নেই, খুব উঁচুতে বড়জোর ঘন্টাখানেক থাকব আমরা, তার বেশি নয়।'

'প্রেশারাইজড নয়?' মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারার একজন প্যাসেঞ্জার চিকণ গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তে জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল সে, 'সে-কথা আগে কেন জানানো হয়নি আমাকে?'

মনে মনে গেভিনের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে রবিন। প্যাসেঞ্জার লোকটার দিকে তাকাল সে। ফোলা ফাঁপা মদ খাওয়া চেহারা দেখে বুঝতে পারল, এ লোক স্বার্থপর, জীবনে কখনও কষ্ট করেনি, করতে জানে না। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে হাসল সে, বলল, 'কোন অসুবিধে হবে না, মি.…'

'মিলার…জোসেফ মিলার।' চিকণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

'মি. মিলার, কোনরকম অসুবিধে হবে না। প্রতিটি সীটের সাথে একটা করে অক্সিজেন মাউথপীস আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে বোধ করলে ওটা ব্যবহার কোরো। চিৎকার না করে আমি বরং এক এক করে সবার কাছে গিয়ে কথা বলি।' থলথলে মাংস আর চর্বি সর্বস্ব প্রকাণ্ড মুখটা লাল হয়ে উঠল জোসেফ মিলারের. তার ছোট আকারের দুই চোখে ক্রোধ আর অবজ্ঞা লক্ষ্য করে অবাক হলো রবিন। তবু ভদ্রতার খাতিরে মৃদু হাসল সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পোর্ট সাইডের দুটো সীটের দিকে ঝুঁকে পড়ল রবিন। 'তোমাদের নাম জানতে পারি, প্লীজ?'

প্রথম লোকটা বলল, 'আমি ডক্টর স্যামুয়েল জনসন।' তার পাশ থেকে সুঠামদেহী জানাল, 'মিগুয়েল লোপেজ।'

'তোমাদের সান্নিধ্য পেয়ে আমি আনন্দিত,' বলল রবিন।

'আমার কোন অভিযোগ নেই,' বলল ড. জনসন। 'তবে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এ ধরনের ঘুড়ি যে আজও উড়ছে তা আমার জানা ছিল না।'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল রবিন। বলল, 'বুঝতেই তো পারছ, এটা একটা ইমার্জেন্সী ফ্লাইট। এটা প্রেশারাইজড জেট নয় তা বলতে ভুলে গেছে আমাদের ফ্লাইট ম্যানেজার, সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

সহাস্যে ড. জনসন বলল, 'মজার ব্যাপার কি জানো, এদিকে আমি এসেছি হাই অলটিচ্যুড স্টাডি করার জন্যে। শুরুতেই ভাগ্য প্রসন্ন, বোঝা যাচ্ছে। কতটা ওপর দিয়ে উড়ব আমরা, ক্যাপ্টেন?'

'সতেরো হাজার ফিটের বেশি নয়,' বলল রবিন। 'চূড়ার ওপর দিয়ে নয়, পাহাড় সারির মাঝখান দিয়ে এগোব আমরা। দরকার হলে অক্সিজেন মাউথপীস ব্যবহার করবে।' পিছন থেকে কেউ শার্টের প্রান্ত ধরে টানছে অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রবিন।

সেই নাদুসনুদুস আমেরিকানটা, জোসেফ মিলার। 'আমি জানতে চাই…'

অভদ্রের মত চোখমুখ বিকৃত করে চেঁচাচ্ছে সে।

'পরে কথা বলব,' বলল রবিন। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল মিগুয়েল লোপেজের দিকে। 'অ্যান্ডেজের সাথে তোমার পরিচয় আছে, মি. লোপেজ?'

মুচকি হাসল সুঠামদেহী লোপেজ। সংক্ষেপে জবাব দিল সে, 'আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বেশ কিছু দিন দূরে ছিলাম, আবার ফিরে যাচ্ছি।'

'তাহলে তো এদিকের অবস্থা সবই জানা আছে তোমার।'

সহানুভূতির ছাপ মারা মৃদু হাসি ফুটল লোপেজের মুখে।

পরের দুই সীটে পক্ককেশী এক বৃদ্ধা আর রোগা পটকা, বেঁটেখাট এক লোক পাশাপাশি বসে আছে। লোকটার বয়স চল্লিশের কম হবে না, আন্দাজ করল রবিন। এশিয়ান বলে মনে হচ্ছে। চোখ দুটো আশ্চর্য, কচি শিশুর মত সরলতা ফুটে আছে সেখানে। বৃদ্ধার বয়স নব্বুইয়ের কম তো হবেই না, অনুমান করল রবিন। বার্ধক্যের চাপে শরীরটা ছোট হয়ে গেছে তার। মুখে অসংখ্য কাটাকুটি দাগের মত রেখা ফুটে আছে, ঝুলে পড়েছে লোলচর্ম। মাথার চুল, ভুরু, চোখের পাতা—সব ধবধবে সাদা। দাঁত নেই বলে ঠোঁট জোড়া ভিতর দিকে বেঁকে আছে। পাশে বসা রোগাটে লোকটার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন তিনি। এশিয়ান লোকটা তাঁকে চকলেট অফার করছে। রবিনের সাথে চোখাচোখি হতেই লোকটা বলল, 'গিলটি মিয়া,' তারপর মুখস্থ করা ইংরেজি বুলির ভাঁড়ার থেকে টপ করে একটা বেছে নিল সে, বলল, 'ফ্রম বাংলাদেশ। বিজনেসম্যান।'

'মিস জুডি,' অশীতিপর বৃদ্ধা সহাস্যে চোখ পিট পিট করছেন। 'সমাজ সেবিকা।'

ওদের সাথে কয়েক মুহূর্ত কাটাল রবিন। হাসল বেনোর রসিকতায়। পাকা আপেলই বটে!

পিছনের সীটে বসা পুরুষ এবং মেয়েটার দিকে তাকাল এবার ও। ককপিট থেকে কেবিনে ঢোকার পর এরা দু'জনেই সবার আগে ওর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল।

মেয়েটা আশ্চর্য সুন্দরী। সঙ্গী নির্বাচনে দারুণ রুচির পরিচয় দিয়েছে, সন্দেহ নেই। লোকটার চেহারার মধ্যেই ফুটে আছে আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। পেশীবহুল। ব্যাকব্রাশ করা চুল। পরনে গরম কাপড়ের দামী স্যুট। হাতের জ্বলন্ত চুরুট থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দুই চোখে বুদ্ধি আর সাহসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অদ্ভুত একটা জোড়া এরা, ভাবল রবিন, মনে এমন দাগ কেটে গেল, কখনও মুছে যাবে না এদের ছবি। 'সিনর,' রানার চোখে চোখ রেখে স্মিত হেসে জানতে চাইল রবিন, 'তোমার পরিচয়?'

'মাসুদ রানা,' মৃদু একটু হেসে বলল রানা। 'বিজনেসম্যান।' পাশে বসা সোহানাকে দেখিয়ে বলল, 'সোহানা চৌধুরী। কোন অভিযোগ নেই আমাদের, ক্যাপ্টেন।'

উত্তরটা পেয়ে একটু অবাক হলো রবিন। ঠিক ব্যবসায়ী বলে মনে হয় না লোকটাকে।

অদ্ভুত একটা ভরাট দৃঢ়তা রয়েছে এর কণ্ঠস্বরে, কথা বলার ভঙ্গিটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মার্জিত। 'ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে বলল সে। 'একটু কষ্ট হবে

তোমাদের, সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'ও কিছু না,' বলল রানা। 'কষ্ট করার অভ্যাস আছে আমাদের।'

'হেই, কাপ্তান!' জোসেফ মিলারের চিৎকারটা কর্কশ ঘেউ ঘেউ-এর মত কানে বাজল সবার।

ইচ্ছে করেই তার দিকে ফিরল না রবিন। এমন অসহিষ্ণু আর অভদ্র লোক তো আর দেখিনি, ভাবতে ভাবতে অপর সারির শেষ প্রান্তের দুই সীটে বসা বুড়ো বুড়ির দিকে এগোল সে। এরাই হফ দম্পতি, বুঝতে পারল। বয়সের দিক থেকে দু'জনই সত্তর পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, প্রাণবন্ত সতেজ চোখ দেখে বোঝা যায় মনের দিক থেকে আজও এরা তরুণ।

'আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, মিসেস হফ?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মোটেও না!' মিসেস হফ স্বামীর দিকে ফিরলেন, 'কি গো ঠিক বলিনি?'

'খাসা লাগছে আমার,' বৃদ্ধ হফ সায় দিয়ে বললেন। আগ্রহে ভরা মুখটা রবিনের দিকে তুলে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, আমরা কি পোর্টো ডি লাস এগুইলাসের মধ্যে দিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'এদিকটার সাথে আপনার বুঝি পরিচয় আছে?'

বুড়ো হফ হাসলেন। 'উনিশশো বিশ সালে এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম,' বললেন তিনি। 'কৈশোরটা কোথায় অপচয় করেছি তা আমার স্ত্রীকে দেখাবার জন্য আবার আসতে হলো।' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। 'মানে, ক্যাপ্টেনকে আমি ঈগল পাসের কথা জিজ্ঞেস করলাম। উনিশশো আটাশ সালে ওই গিরিপথটা পেরোতে দুই হপ্তা লেগেছিল আমার, অথচ আজ ওটা পেরোতে এক কি দুই ঘণ্টা লাগছে।'

পরের দুই সীটে তীক্ষ্ণ নাসা এক বৃদ্ধের পাশে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। বৃদ্ধের মুখে ছোট করে ছাঁটা সাদা দাড়ি। 'সিনর মন্টেস?' জানতে চাইল রবিন।

মৃদু মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিতে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল বৃদ্ধের। বললেন, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ক্যাপ্টেন, এই পরিস্থিতির সাথে পরিচয় আছে আমাদের।' দস্তানা পরা একটা হাত নেড়ে দেখালেন। 'সেজন্যে তৈরি হয়েই আছি। অ্যান্ডেজকে আমরা চিনি, সিনর, এ-ধরনের বিমানের সাথেও পরিচয় আছে। যুবক বয়সে পায়ে হেঁটে, খচ্চরের পিঠে চেপে এসব এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি—কয়েকটা নামকরা শৃঙ্গেও উঠেছিলাম। কি, উঠিনি, বেনেদেতা?'

অত্যন্ত মূল্যবান একটা ফারকোট গায়ে জড়িয়ে আছে সিনোরিটা বেনেদেতা মন্টেস। 'তা উঠেছ,' ম্লান কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু সে বয়স নেই তোমার, কাকু। তোমার হার্টের যা অবস্থা, ধকলটা সইবে কিনা…'

'একটুতেই ভয় পাস তুই। আমি যদি শান্ত থাকতে পারি, কোন পরিস্থিতিতেই সুবিধে করতে পারবে না হার্ট—ঠিক কিনা, সিনর?'

'সিনর,' বলল রবিন, 'এই অক্সিজেন টিউব কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে তোমার?'

'খুব ভাল ভাবে,' বললেন বৃদ্ধ।

ভাইঝির দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'আপনার কাকু ভাল থাকবেন

সিনোরিটা।' মেয়েটা কিছু বলবে এই আশায় চুপ করে থাকল সে, কিন্তু বেনেদেতা কোন জবাব দিল না দেখে সামনের সীট দুটোর দিকে এগোল।

দুই সীটের একটায় জোসেফ মিলার, আরেকটায় অন্য এক ভদ্রলোক। তার বয়স চল্লিশের মত। পরিচ্ছন্ন একটা ভাব চেহারার মধ্যে, লক্ষ্য করল রবিন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতেই জবাব দিল লোকটা, 'ডক্টর রেমন্ড কোনালি।' ফ্রেঞ্চ কাট কালো দাড়ি তার মুখে। একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'এখন পর্যন্ত বেশ আরামেই তো আছি।'

'আমার বমি পাচ্ছে,' নাটকীয় ঘোষণার সুরে পাশের সীট থেকে বলল জোসেফ মিলার। 'এটা একটা জঘন্য পরিবেশ; দুর্গন্ধে নাক দিয়ে মগজ নেমে আসতে চাইছে আমার।' খপ করে রবিনের একটা হাতের কব্জি চেপে ধরল সে, 'বেশি কাপ্তানী না দেখিয়ে ভাল চাও তো ফিরিয়ে নিয়ে চলো সান ক্রোসে।'

'শান্ত হোন,' অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বলল রবিন, 'এমন কিছু করা উচিত হবে না আপনার যাতে সবাই আপনাকে পাগল ভাবে।'

'অ্যাই, মুখ সামলে কথা বলো!' মিলার চোখ রাঙাল, 'জানো, আমি কে?' নিজের বুকে বুড়ো আঙুলের ডগা ঠুকল সে। 'ডুরেল অ্যান্ড মিলার ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানীর নাম শুনেছ? আমি তার একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক আমি। একজন মালটি মিলিয়নিয়ার। হেজিপেজি...'

'হাত ছাড়ুন,' শান্ত কিন্তু আশ্চর্য দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবিন।

'এই এয়ারলাইন্সের মালিককে আমি দেখে নেব...' রবিনের হাত ছেড়ে দিয়ে শুরু করল মিলার।

'সে আপনারই মত একজন আমেরিকান,' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রবিন, পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে ককপিট কেবিনের দিকে এগোল।

এখনও অটোমেটিক পাইলটের উপর প্লেনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে বেনো, তাকিয়ে আছে সামনের পাহাড় শ্রেণীর দিকে। বসল রবিন। ক্রমশ এগিয়ে আসছে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর। সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ও। তারপর কোর্স চেক করে বলল, 'চিমিটাসেল-এর ওপর বিয়ারিং নিতে শুরু করো। টু হানড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রী ট্রু বিয়ারিং হলে জানাবে আমাকে। ড্রিলটা তো জানোই তুমি।'

ঝপ করে কয়েক হাজার ফিট নিচে নেমে গেল রবিনের দৃষ্টি, পরিচিত ল্যান্ড মার্ক খুঁজছে ও। রিও সাংগ্রির বাঁকবহুল, প্যাঁচানো গতিপথ এবং তার উপর রেলওয়ে ব্রিজটা দেখতে পেয়ে সন্তোষ বোধ করল। দিনের বেলা এবং দীর্ঘ দিন ধরে এই রুটে প্লেন নিয়ে যাওয়া আসা করে ও, নিচের পাহাড় আর মাটি নিজের হাতের তালুর মতই পরিচিত ওর, চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পেরেছে কিনা। টের পাচ্ছে রবিন উত্তর পশ্চিমের বাতাস মেটিয়রলজিস্টদের হিসাবে যতটুকু তীব্র হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশ একটু বেশি তীব্র। সেই অনুপাতে কোর্স বদল করল ও। তারপর আবার অটোপাইলট চালু করে দিয়ে সীটের পিছনে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসল। চিমিটাসেলের উপর

প্রয়োজনীয় বিয়ারিং না পাওয়া পর্যন্ত হাতে আর কোন কাজ নেই। নিচের দিকে তাকিয়ে পিছন দিকে দ্রুত অদৃশ্যমান ধূসর পাহাড়ের পাদদেশ, তারপর সাদা তুষারে মোড়া চূড়া দেখছে রবিন। একটু পর ব্রীফকেস থেকে বের করে কামড় বসাল স্যান্ডউইচে।

হঠাৎ বিয়ারিং কম্পাস নামিয়ে রাখল বেনো, বলল, 'ত্রিশ সেকেন্ড!'

সামনের উঁচু শৃঙ্গগুলোর দিকে তাকাল রবিন। কঠিন পাথরের বিশাল বিপুল বিস্তার চারদিকে—দুর্ভেদ্য, দুর্গম। এইসব পাহাড়কে চেনে রবিন। এদের কেউ কেউ ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যেমন চিমিটাসেল, এরা পথ চিনতে সাহায্য করে ওকে। বাকি সব পাহাড় ওর পরম শত্রু—বিশালদেহী দানবগুলো গা ঢাকা দিয়ে থাকে ধাবমান হিমবাহের পিছনে, ওত পেতে থাকে ঘন কুয়াশার ভিতর। কিন্তু ওদেরকে ভয় পায় না রবিন। বিপদটা কোথায় এবং কি রকম জানা আছে ওর, জানা আছে কিভাবে সেই বিপদ এড়িয়ে চলতে হয়।

'এখন!' বলল বেনো।

সাথে সাথে আস্তে করে কন্ট্রোল কলাম ঘুরিয়ে দিল রবিন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল ঘোরানোটা নিখুঁত হয়েছে। হাতের সাথে একযোগে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে পা দুটোও। বিরাট এলাকা নিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে পোর্ট সাইডে একটা বাঁক নিচ্ছে ডাকোটা, আকাশ ছোঁয়া দেয়ালের গায়ে একটা কালো অন্ধকার ফাঁক, সেই গহ্বর লক্ষ্য করে তীরবেগে এগোচ্ছে।

'সিনর রবিন,' ফিস ফিস করে উঠল বেনো।

'এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না!' তাকাল না রবিন, সে ফুরসত নেই ওর।

'দুঃখিত,' চাপা স্বরে বলল বেনো, 'একটু বিরক্ত করতেই হচ্ছে!'

ক্লিক করে শব্দ হলো একটা।

দুই

নিমেষে চোখের কোণে চলে এল মণি দুটো, জিনিসটা আড়চোখে দেখেই শক্ত হয়ে গেল রবিনের শরীরটা—একটা অটোমেটিক পিস্তল ধরে আছে বেনো তারই দিকে তাক করে।

ঝট্ করে মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল রবিন। অবিশ্বাসে বড় হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। 'পাগল হয়েছ নাকি?'

সবজান্তা ঢংয়ের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বেনোর। 'না। এ-যাত্রা আমরা পোর্টো ডেলাস এগুইলাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি না, সিনর রবিনসন।' কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য এনে আবার বলল, 'কোর্স বদলাও। ওয়ান-এইট-ফোর অন এ ট্রু বিয়ারিং।'

ধীরে ধীরে বুক ভরে বাতাস নিল রবিন আগের কোর্সেই এগোচ্ছে ডাকোটা। 'হাতের ওটা ফেলে দাও, বেনো। যা করার করেছ, কথা দিচ্ছি, ভুলে যাবার চেষ্টা

করব আমি। আমার আচরণে একটু বেশি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্যে পিস্তল বের করাটা বাড়াবাড়ি। সরাও ওটা, সান্তিলানায় পৌঁছে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এর একটা মীমাংসা করে নেব।'

ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল বেনো। 'বোকা। তুমি কি ভেবেছ ব্যক্তিগত কারণে পিস্তল ধরেছি আমি তোমার দিকে? সে যাক,' হাতের পিস্তলটা রবিনের দুই ভুরুর মাঝখানে স্থিরভাবে ধরে রেখে বলল বেনো, 'আমার হাতের এই জিনিসটার নল থেকে কি বেরোয় নিশ্চয় জানা আছে তোমার? এখন তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। হয় কোর্স বদলাও, নয় মগজে একটা বুলেট নাও। প্লেন আমিও চালাতে পারি, ভুলো না।'

'গুলির শব্দ শুনতে পাবে ওরা,' বলল রবিন।

'দরজায় তালা মেরে দিয়েছি,' বলল বেনো। 'আর শুনতে পেলেই বা কি? একমাত্র পাইলটের কাছ থেকে কন্ট্রোল কেড়ে নিতে পারবে না ওরা।'

পিস্তলের ট্রিগারে বেনোর আঙুলটা চেপে বসছে, দেখতে পেয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল রবিন। মৃত্যু আশঙ্কায় শিউরে উঠল ও, কিন্তু তা মাত্র এক নিমেষের জন্যে। পর মুহূর্তে বারোজন আরোহীর কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওদের প্রাণ রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার, ভাবল ও। এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে বারোটা প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। বেনোর গুলি খেয়ে মরার চেয়ে শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্যে বেঁচে থাকা দরকার ওর। কিন্তু বেনোর মতলবটা কি?

'তিন সেকেন্ড পর গুলি করব।'

কন্ট্রোল কলাম ঘুরিয়ে দিল রবিন। বাঁক নিয়ে দক্ষিণ মুখো হয়ে উড়ছে এখন ডাকোটা, অ্যান্ডেজের প্রধান শিরদাঁড়ার সাথে সমান্তরাল ভাবে। বেনোর দেয়া বিয়ারিং-এ কম্পাস স্থির করে রেখে হাত বাড়াল রবিন অটো পাইলট কন্ট্রোলের দিকে।

'না। হাতে কাজ না থাকলে মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপে। অটো পাইলট নয়, নিজে প্লেন চালাও।'

ধীরে ধীরে হাতটা ফিরিয়ে আনল রবিন, মুঠোর ভিতর চেপে ধরল হুইলটা। স্টারবোর্ডের দিকে ফিরল ও। বেনোকে ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেল দৃষ্টি। পাহাড়ের তুষার ধবল উঁচু মাথাগুলো মিছিল করে চলে যাচ্ছে পিছন দিকে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল ও।

মুচকি হেসে বলল বেনো, 'এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা এয়ার-স্ট্রিপে ল্যান্ড করছি আমরা।'

এই কোর্সে কোন এয়ার-স্ট্রিপ আছে বলে জানা নেই রবিনের। মিলিটারি স্ট্রিপ ছাড়া এত উঁচু পাহাড়ী এলাকায় আর কোন স্ট্রিপ নেই, থাকতে পারে না। মিলিটারি স্ট্রিপগুলোও অ্যান্ডেজ চেইনের এদিকে নেই, আছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, ভাবল রবিন। চট করে একবার দেখে নিল ওর বাঁ হাতের নাগালের মধ্যে হুকে ঝোলানো মাইক্রোফোনটা। বেনোর দিকে তাকিয়ে দেখল তার কানে এয়ারফোন নেই। মাইক্রোফোন সেটটা অন করা গেলে, ভাবছে ও, ওদের কথাবার্তা বেনোর অজ্ঞাতে প্রচার হতে থাকবে।

বারোজন প্যাসেঞ্জার সহ একটা ডাকোটা বিপদে পড়েছে, এই খবরটা অন্তত জানবে কেউ না কেউ। কোনরকমে বেনোর চোখকে ফাঁকি দিয়ে বোতামটা টিপে দিলেই হাসিল হয় উদ্দেশ্য।

'এই কোর্সে কোন এয়ার-স্ট্রিপ নেই,' বেনোকে বলল রবিন, ওর বাঁ হাতটা হুইল ছেড়ে দিয়েছে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সেটা।

'আছে। তোমার জানা নেই।'

আঙুলে মাইক্রোফোনের ছোঁয়া অনুভব করল রবিন। যন্ত্রপাতি চেক করার ভান করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। বেনোর দৃষ্টিপথ থেকে মাইক্রোফোনটাকে আড়াল করে আঙুল দিয়ে খুঁজছে বোতামটা। খুঁজে পেয়েই টিপে দিল দ্রুত। হাতটা নামিয়ে সীটের পিছনে হেলান দিল ও। গলার স্বর চড়িয়ে বলল, 'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে, বেনো। আরোহীসহ একটা প্লেন হাইজ্যাক করা সহজ, কিন্তু শেষ রক্ষা করা অত সহজ নয়। সময় মত এই ডাকোটা সান্তিলানায় না পৌঁছুলে সার্চ শুরু হবে।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসল বেনো। 'বুদ্ধু! রবিন, তুমি একটা বুদ্ধু। তুমি যখন প্যাসেঞ্জারদের সাথে কথা বলছিলে তখন আমি খুলে নিয়েছি টিউবগুলো। রেডিও কাজ করছে না।'

অকস্মাৎ তলপেটের ভিতর একটা শূন্যতা অনুভব করল রবিন। গায়ে গা ঠেকানো ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা সামনের অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাল ও, ভয়ে কেঁপে উঠল শরীরটা। এই বৈরী এলাকার সাথে পরিচয় নেই ওর, এর কোথায় কি বিপদ ওঁৎ পেতে আছে জানা নেই। অসহায় বোধ করছে ও। নিজের কথা ভাবছে। বারোজন প্যাসেঞ্জারের কথা ভাবছে।

ঠাণ্ডা বরফ হয়ে উঠেছে প্যাসেঞ্জার কেবিনের ভিতরটা। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বাতাসও পাতলা হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ভুগছেন বৃদ্ধ সিনর মন্টেস। শুকিয়ে নীলচে হয়ে গেছে তাঁর ঠোঁট দুটো। পাংশু হয়ে গেছে মুখের চেহারা। অক্সিজেন টিউব মুখে চেপে ধরে জোরে জোরে বাতাস টানছেন তিনি। তাঁর ভাইঝি বেনেদেতা হাতব্যাগ হাতড়ে ট্যাবলেটের একটা শিশি বের করল। তাকে অভয় দেবার জন্যে কষ্ট করে হাসলেন সিনর মন্টেস। ইঙ্গিতে মুখ খুলতে বলল বেনেদেতা। সিনর মন্টেস হাঁ করতে তাঁর মুখের ভিতর একটা ট্যাবলেট রাখল সে।

সুঠামদেহী মিগুয়েল লোপেজ বারবার ঘাড় ফিরিয়ে নজর ফেলছে বৃদ্ধ সিনর মন্টেসের উপর। উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তার চেহারায়।

অতি যত্নের সাথে বৃদ্ধা মিস জুডির জন্যে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালছে গিলটি মিয়া, আর মিসেস জুডি সদ্য কথা বলতে শেখা শিশুর মত টুক টুক করে কত কথাই না বলে চলেছেন।

হাসি খুশি হফ দম্পতিও জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে আছেন। দু'জনের কোলের উপর ছড়িয়ে রয়েছে বাহান্নটা তাস। এতক্ষণ জোড়পাতি খেলছিলেন ওঁরা। 'যাই বলো, ব্যাপারটা গোলমেলে। ওই, ওদিকে যাচ্ছিলাম আমরা—ওই পাসটার ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিল প্লেন। হঠাৎ পাইলট বাঁক নিয়েছে···এখন আমরা দক্ষিণ দিকে

এগোচ্ছি। কেন?' জানতে চাইলেন মি. হফ।

'আমার চোখে তো বাপু কোন পরিবর্তন ধরা পড়ছে না,' মিসেস হফ তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পাকা চুল নেড়ে বললেন। 'সেই থেকে শুধু পাহাড় আর বরফই তো দেখছি।'

'যাই বলো, ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না।' তাসগুলো গুছাতে শুরু করলেন মি. হফ, কিন্তু তাকিয়ে আছেন বাইরে।

কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে মৃদু খোঁচা মারল সোহানা।

কোলের উপর খোলা বইটা থেকে মুখ তুলল রানা। সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠোঁট জোড়ার ওপর এত দরদ তোমার?'

'মানে?'

'স্বীকার করি, তোমার ঠোঁটের সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্যে একটা বই লিখে ফেলা যায়,' বলল রানা, 'কিন্তু শুধু চুমো খেতে দেবার জন্যে নয়, ও-দুটোর আরও ফাংশন আছে। কারও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কনুই ব্যবহার করাটা ঠিক...'

'ঠাট্টা নয়,' জানালার দিকে চোখের মণি ঘোরাল সোহানা, 'ওদিকে তাকাও। কোর্স বদলে অন্য দিকে যাচ্ছে প্লেন।'

তাকাল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'তাই তো!' দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল প্লেনের ভিতরটা। ঠাণ্ডার আধিক্যে এবং অক্সিজেনের অভাবে সবার অবস্থাই কম বেশি কাহিল, লক্ষ করল ও। 'হয়তো কিছুই নয় ব্যাপারটা। সঙ্গত কোন কারণে ঘুরপথে যাচ্ছে পাইলট। চেহারা আর কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে হয়েছে লোকটাকে আমার। চিন্তার কিছু নেই।' ঘাড় ফিরিয়ে বৃদ্ধ সিনর মন্টেসের দিকে আরেকবার তাকাল রানা।

রানার দেখাদেখি সোহানাও তাকাল সেদিকে।

চোখ ফিরিয়ে মাথার উপর একটা শেলফে রাখা ফার্স্ট এইড বক্সটার দিকে তাকাল রানা। পাশেই চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা কুঠার। রানার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে সোহানা বলল, 'বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ফার্স্ট এইড বক্সটা দরকার হতে পারে, তাই না?'

'পারে,' সংক্ষেপে উত্তর দিল রানা।

'ওই দেখা যায়,' বলল বেনো। 'ওখানে ল্যান্ড করবে তুমি।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রবিনের। ডাকোটার নাকের কিনারা ঘেঁষে নিচে নেমে গেল ওর দৃষ্টি। কালচে পাথর আর সাদা তুষারের মাঝখানে ছোট্ট একটা এয়ার-স্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা কার্নিসের অসমান পাথর কেটে সমান করা হয়েছে মাত্র। এক ঝলক দেখার সুযোগ পেল রবিন, পর মুহূর্তে ওদের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

হাতের পিস্তলটা নাড়ল বেনো। 'প্লেন ঘোরাও।'

এয়ার-স্ট্রিপটাকে কেন্দ্র করে চক্কর মারতে শুরু করল রবিন। ছাড়া ছাড়া ভাবে এখানে কয়েকটা ওখানে কয়েকটা কেবিন দেখা যাচ্ছে নিচে। সাপের মত এঁকেবেঁকে পাহাড় থেকে নেমে গেছে একটা রাস্তা। বুদ্ধি করে কে যেন তুষার

সরিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে এয়ার-স্ট্রিপটাকে। কিন্তু প্রাণ স্পন্দনের চিহ্ন নেই কোথাও। পাথুরে কার্নিসটা থেকে নিজের দূরত্ব হিসাব করে অলটিমিটারের দিকে তাকাল রবিন। 'অসম্ভব, বেনো!' বলল সে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ! ডাকোটা নিয়ে ওখানে ল্যান্ড করা কোন পাইলটের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তোমার পক্ষে সম্ভব,' বলল বেনো।

'না। এমনিতেই প্লেনটা ওভারলোডেড। সী-লেভেল থেকে সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে রয়েছে স্ট্রিপটা। নিরাপদে নামতে হলে কম করেও আরও তিনগুণ লম্বা রানওয়ে চাই। সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে বাতাস কি রকম হালকা, ভেবে দেখেছ? ল্যান্ড করার সময় গতি মন্থর করলে বিপদ ঘটবে, বাতাস প্লেনটাকে ঠেকা দিয়ে সাহায্য করবে সে আশা নেই। সরাসরি বাড়ি খাবে প্লেন, সে ধাক্কা সামলে ওঠা সম্ভব নাও হতে পারে। স্ট্রিপের অপর প্রান্ত ছাড়িয়ে নেমে যাব আমরা, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে ডাকোটা।'

'ওসব বুঝি না,' বলল বেনো। 'আমি জানি তুমি নিরাপদে ল্যান্ড করতে পারবে ওখানে।'

'না। বারোজন প্যাসেঞ্জারের প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলতে আমি রাজী নই।'

ঢোক গিলল বেনো। 'বেশ, আমিই দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগে তোমাকে খুন করতে হবে আমার।'

পিস্তলের কালো চোখটা ওর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছে রবিন। ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে লোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসছে, পিঠ বেয়ে সড় সড় করে নামছে ঘামের ধারা। বেনোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্ট্রিপটার দিকে আবার তাকাল ও। 'এ কাজ কেন করছ তুমি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল।

'বললেও তুমি বুঝবে না,' ভারী গলায় বলল বেনো। 'তুমি ইংরেজ, এসব তোমার বোঝার কথা নয়।'

শান্ত দেখাচ্ছে রবিনকে। কিন্তু দ্রুত চিন্তা করছে ও। চেষ্টা করলে হয়তো প্রায় অখণ্ড অবস্থায় ডাকোটাকে ল্যান্ড করাতে পারবে সে, কিন্তু বেনোর পক্ষে এ-কাজ সম্ভবই নয়—নির্ঘাত পাউডার বানিয়ে ছাড়বে সে প্লেনটাকে।

'ঠিক আছে,' বলল ও, 'সাবধান করে দিয়ে এসো প্যাসেঞ্জারদের। সবাইকে কেবিনের শেষ প্রান্তে থাকতে বলো।'

'ওদের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল বেনো। 'ককপিটে তোমাকে একা রেখে যাব—তা কি হয়?'

'বেশ, যেয়ো না,' বলল রবিন। 'কিন্তু মনে রেখো, এর জন্যে জবাবদিহি তোমাকে করতেই হবে। সাবধান করে দিচ্ছি, কন্ট্রোলে যেন তোমার হাত না লাগে। একজন পাইলটের পায়ের কড়ে আঙুল হবার যোগ্যতাও নেই তোমার।'

'কাজে মন দাও,' হুকুমের সুরে বলল বেনো।

'তুমি বললেই ল্যান্ড করছি না আমি,' বলল রবিন। 'ঝুঁকিটা নেবার আগে ভাল করে দেখে নিতে চাই জায়গাটা।'

স্ট্রিপটাকে ঘিরে আরও চারবার চক্কর মারল রবিন। ডাকোটার নিচে বেসামালভাবে ঘুরছে সেটা, আর সেটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। ভাবছে,

ইতিমধ্যে প্যাসেঞ্জারেরা টের পেয়ে গেছে কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। সাধারণ কোন প্লেন এভাবে একদিকে কাত হয়ে বারবার বাঁক নিয়ে চক্কর মারে না।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনের চেহারা ভেসে উঠল রবিনের চোখের সামনে। ব্যবসায়ী লোকটা—কি যেন নাম তার…রানা…মাসুদ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মাসুদ রানা। কেন যেন, কোন কারণ ছাড়াই, মনে হলো তার, বিপদ আঁচ করতে পেরে এই লোকটা কিছু একটা করতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো করার কি আছেই বা? দরজায় তালা মেরে দিয়েছে বেনো। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল, প্যাসেঞ্জার কেবিনে একটা কুঠার আছে। লোকটার চোখে কি পড়বে সেটা?

লম্বা এবং চওড়া—দু'দিকেই বিপজ্জনকভাবে খাটো স্ট্রিপটা। আরও ছোট প্লেনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। একেবারে কিনারায় ল্যান্ড করতে হবে ওকে, একদিকের ডানা একটা পাথরের পাঁচিল ছুঁই ছুঁই করবে তখন। বাতাস কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে বইছে সেটাও বিবেচ্য। কেবিনগুলোর দিকে তাকাল ও। কিন্তু চিমনির মাথায় ধোঁয়ার রেশ মাত্র নেই দেখে নিরাশ হলো।

'আরও কাছ থেকে দেখার জন্যে স্ট্রিপের ওপর দিয়ে যাব,' বলল রবিন, 'কিন্তু এবার ল্যান্ড করব না।'

বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করার ভঙ্গিতে দূরে সরে যাচ্ছে ডাকোটা, তারপর স্ট্রিপটার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল ল্যান্ড করার ভঙ্গিতে। লম্বালম্বিভাবে স্ট্রিপটার মাঝখানে একটা সরলরেখা কল্পনা করে নিয়ে ডাকোটার নাক সেই রেখায় সই করে নিল রবিন। নেমে এল ডাকোটা। স্ট্রিপটার ঠিক উপরে এখন ওরা। সোজা সামনের দিকে ছুটছে। স্টারবোর্ডের দিকে পাথর আর বরফের অফুরন্ত মিছিল বিদ্যুৎবেগে পিছন দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়—মাঝপথে গলায় আটকে গেল রবিনের নিঃশ্বাস। পাথরের পাঁচিলে ডানার ডগার একটু ছোঁয়া লাগলেই সব শেষ। সামনে তাকাল রবিন। তীব্র বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ডাকোটার নিচে এয়ার-স্ট্রিপটা, গোগ্রাসে গিলে ফেলছে যেন প্লেন স্ট্রিপটাকে। স্ট্রিপটার শেষ প্রান্তে আর কিছু নেই—স্রেফ গভীর, নিচু উপত্যকা আর নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্টিক ধরে হ্যাঁচকা টান মারল রবিন; নাক উঁচু করে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল ডাকোটা।

প্যাসেঞ্জাররা করছে কি? ব্যবসায়ী লোকটা কি তবে বিপদ আঁচ করতে পারেনি? ভাবল রবিন। বেনোকে বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ল্যান্ড করতে গেলে প্লেনটা অক্ষত থাকবে না?'

'কিছু এসে যায় না,' বলল বেনো। 'নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবছি না আমি। আমাকে নিরাপদে নামিয়ে দাও।'

ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল রবিনের, বলল, 'তোমার নিরাপত্তার কথা ভাবছি না আমি।'

'সেক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাব,' বলল বেনো। 'তাহলেই আমার কথা ভাবা হবে।'

আবার বিরাট একটা বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে দূরে সরে গেল রবিন, তারপর ল্যান্ড

করার ভঙ্গিতে ফিরে আসতে শুরু করল। নামার জন্যে কি কৌশল অবলম্বন করবে তাই নিয়ে চিন্তা করছে ও। আন্ডার ক্যারেজ উঁচু বা নিচু করে, যে-কোন একটা বেছে নিয়ে ল্যান্ড করতে পারা যায়। যে স্পীডে থাকবে প্লেন তাতে বেলী-ল্যান্ডিং সুবিধের হবে না, কিন্তু ঘন ঘন ঘষা খেয়ে দ্রুত কমে যাবে ডাকোটার গতিবেগ। সমস্যা হলো—সে কি সোজাভাবে ধরে রাখতে পারবে প্লেনটাকে? অপরদিকে সে যদি আন্ডার ক্যারেজ ডাউন রেখে ল্যান্ড করতে যায় তাহলে রানওয়ে স্পর্শ করার আগেই এয়ারস্পীড হারাবে—সেটাও একটা অতিরিক্ত সুবিধে বটে।

গম্ভীর মুখে একটু হাসল রবিন। ঠিক করল, দুটো কৌশলই প্রয়োগ করবে সে। আন্ডার ক্যারেজ কতটা চাপ গ্রহণ করবে তার চুলচেরা হিসেব জানা আছে ওর। এতদিন ওর সমস্যা ছিল কিভাবে যথাসম্ভব আস্তে নামানো যায় প্লেনটাকে। আজ সে আন্ডার ক্যারেজ ডাউন রেখে নামতে চেষ্টা করবে। স্পীড দ্রুত কমিয়ে ফেলে ঝপ্ করে সজোরে নামবে স্ট্রিপে। তাতে বেলী-ল্যান্ডিংয়ের ফায়দাও পাওয়া যাবে।

স্ট্রিপের মাঝখানে কল্পিত রেখার উপর আবার ডাকোটার নাক সই করল রবিন। 'বেশ, নামছি তাহলে,' বলল ও। 'ফ্ল্যাপস ডাউন; আন্ডার ক্যারেজ ডাউন।'

দ্রুত এয়ারস্পীড হারাতে শুরু করল ডাকোটা। ঝুঁকিটা নেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বুক ধড়ফড় করছিল রবিনের। নামতে শুরু করে সব ভয় আর সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিল ও মন থেকে। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর সেটাকে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চেপে কন্ট্রোলে মন দিল ও। এমন নিবিষ্ট ভাবে আগে কোনদিন মন দেয়নি।

ফ্লাস্কের মুখ খুলে কাপে হুইস্কি ঢালতে যাচ্ছিল জোসেফ মিলার, এই সময় একদিকে কাত হয়ে এয়ার-স্ট্রিপটাকে চক্কর মারতে শুরু করল ডাকোটা। ডক্টর রেমন্ড কোনালির প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে মেদসর্বস্ব শরীরটা সীট থেকে আলুর বস্তার মত ধপ করে পড়ে গেল। আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল গলা থেকে, কাপ থেকে ছলকে বেরিয়ে এসে তার দুটো চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে হুইস্কি। চোখ রগড়াচ্ছে সে, আর অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়ছে ক্যাপ্টেনকে।

সীট থেকে পড়ে গেছেন সিনর মন্টেস এবং মি. হফও। টলতে টলতে সেদিকে এগোচ্ছে সুঠামদেহী মিগুয়েল লোপেজ। মি. হফকে টেনে হিঁচড়ে সীটে তোলার চেষ্টা করছেন তাঁর বুড়ি। সিনর মন্টেসের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্প্যানিশ ভাষায় দ্রুত কি যেন জিজ্ঞেস করল লোপেজ।

একটা কাগজে পেন্সিল দিয়ে রানা এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধরের কল্পিত ছবি কার্টুনের ভঙ্গিতে আঁকা শেষ করেছে সোহানা, হঠাৎ তার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। পেন্সিলের সীসটা পিছলে কাগজের গায়ে বিশ্রী একটা দাগ তৈরি করল। তীব্র প্রতিবাদের সুরে কি যেন বলে উঠল সোহানা, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে সোহানার মাথার উপর দিয়ে জানালা পথে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা বাইরের দিকে।

কেবিন জুড়ে ইংরেজি, বাংলা আর স্প্যানিশ ভাষায় চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু হয়ে গেছে।

গিলটি মিয়াকে জড়িয়ে ধরে বিড় বিড় করছেন বৃদ্ধা মিস জুডি, 'ওহ গড,

আমাদের ওপর দয়া করো...'

হুইস্কিতে ভেজা পুরু ঠোঁট চেটে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে জোসেফ মিলার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এয়ার-স্ট্রিপটাকে দেখতে পেল সে। 'শালা ইংরেজের বাচ্চা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে...'

সিনর মন্টেসকে ধরে সীটে তুলে দিয়েছে সুঠামদেহী লোপেজ। দ্রুত কথা বলছে সে সিনোরিটা বেনেদেতার সাথে। চোখ ইশারায় তাকে ককপিটে ঢোকার দরজাটা দেখাল লোপেজ। সম্মতি জানাবার ভঙ্গিতে দ্রুত ঘাড় কাত করল বেনেদেতা।

স্বামীকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন বৃদ্ধা মিসেস হফ। বিড় বিড় করছেন, 'বিপদ কেটে যাবে! খারাপ কিছুই ঘটবে না! বিপদ কেটে যাবে! খারাপ...'

প্রথমবার ল্যান্ড করার ভঙ্গিতে এয়ার-স্ট্রিপের দিকে এগোতে শুরু করল রবিন, সোজা হয়ে গেল ডাকোটা। ককপিটের দিকে এগোচ্ছিল লোপেজ, দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঝুঁকে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে।

মিসেস হফ পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। সাদা বরফ আর কালচে পাথরের মিছিল বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে পিছন দিকে, কয়েক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই ধাক্কা খাবে ডাকোটার ডানার সাথে। প্লেনের নাক উঁচু করে দিল এই সময় পাইলট। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল লোপেজ।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রানা। টলতে টলতে গিয়ে ককপিটের দরজার সামনে দাঁড়াল ও। হাতল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল নিচের দিকে।

দরজা খুলল না। কয়েক পা পিছিয়ে এল রানা। কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারার জন্যে ছুটল সামনের দিকে। প্লেনটা আবার বাঁক নিতে শুরু করায় কাত হয়ে পড়ল একদিকে, গতি মন্থর হয়ে গেল রানার, ধাক্কাটা তেমন জোরাল হলো না।

অসুস্থ বৃদ্ধ সিনর মন্টেসের দৃষ্টি অনুসরণ করে সিনোরিটা বেনেদেতা এবং সুঠামদেহী লোপেজ তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

এবার ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন।

নিজের সীটের কাছে ফিরে এসেছে রানা। মাথার উপর বেল্ট দিয়ে বাঁধা কুঠারটা খুলে নিয়ে ককপিটের দরজার সামনে ফিরে এল আবার। কুঠারটা কাঁধের কাছে তুলে দরজায় আঘাত করতে যাচ্ছে ও, এমন সময় শক্ত মুঠোয় ওর হাতের কব্জি চেপে ধরল কে যেন।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। চোখাচোখি হলো সুঠামদেহী মিগুয়েল লোপেজের সাথে। 'এতে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হবে,' মৃদু হেসে রানার চোখের সামনে ভারী একটা পিস্তল তুলল সে।

রানাকে ছাড়িয়ে এক পা এগিয়ে গেল লোপেজ। দ্রুত পরপর তিনবার গুলি করল দরজার তালায়।

ডাকোটার চাকা এয়ার-স্ট্রিপ স্পর্শ করতে যাচ্ছে। ঝাঁকুনিটা অনুভব করার এক সেকেন্ডেরও কম সময় আগে গুলির আওয়াজ পেল রবিন, বুলেট লেগে অলটিমিটার

এবং টার্ন-অ্যান্ড-ক্লাইম্ব ইন্ডিকেটর চোখের সামনে চুরমার হয়ে যেতে দেখল। পিছন দিকে কি ঘটছে তা দেখার সময় নেই ওর। ওভারলোডেড ডাকোটা স্ট্রিপের এ-প্রান্তের কিনারা স্পর্শ করেছে মাত্র, তীব্র ঝাঁকুনিটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও, বিদ্যুৎবেগে ছুটছে সামনের দিকে।

ঝপাৎ করে নামল আন্ডার ক্যারেজ। কর্কশ, ভারী দানবীয় আওয়াজের সাথে প্লেনের গোটা কাঠামো তীব্র ঝাঁকি খেল। পেটের দিকে নিচু হয়ে গেছে ডাকোটা। ছেঁড়াফাড়ার ঘষা খাওয়ার প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে স্ট্রিপের শেষ প্রান্তের দিকে উন্মত্ত গতিতে ছুটছে। কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত রবিন, ঝাপটা মেরে ওকে হাত-পা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে যন্ত্রপাতিগুলো। প্লেনটাকে সোজা রাখার উপরই নির্ভর করছে এখন সবার প্রাণ।

চোখের কোণ দিয়ে দেখল রবিন, ঝট করে দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল বেনো। পিস্তলটাও ঘুরে গেল দরজার দিকে। একটা ঝুঁকি নিল রবিন। স্টিক থেকে একটা হাত তুলে অন্ধের মত ঘুষি ছুঁড়ল ও। ওই একটা ঘুষি মারার মতই সময় ছিল ওর হাতে। ভাগ্য ভাল, বেনোর গায়েই কোথাও লাগল সেটা। কিন্তু ফলাফল দেখার আগেই আবার কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

এখনও তীব্র বেগে সামনে ছুটছে ডাকোটা। ইতিমধ্যে স্ট্রিপের অর্ধেকের বেশি পেরিয়ে এসেছে। স্ট্রিপটা যেখানে শেষ হয়েছে, উপত্যকার ঠোঁটের কাছে, একেবারে কাছাকাছি ঝপ করে নেমে যাওয়া শূন্যতা দেখতে পাচ্ছে রবিন। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শিউরে উঠল ও।

মরিয়া হয়ে সবেগে উপর দিকে ঘুরিয়ে দিল রাডারটা। পাথর ভাঙার কান ফাটানো আওয়াজের সাথে বেঁকে গেল ডাকোটা একদিকে।

স্টারবোর্ডের ডানার ডগা পাথরের পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা খেল। চরকির মত দ্রুত আধপাক ডান দিকে ঘুরে গেল ডাকোটা। গায়ের জোরে ডান দিকে উঁচু করে ধরে আছে রাডারটা রবিন। সরাসরি ছুটে আসছে পাথরের পাঁচিল ওর দিকে, দেখতে পাচ্ছে ও। পাথরে ধাক্কা খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল ডাকোটার নাক, উইন্ডস্ক্রীনের সেফটি গ্লাস ঝাঁকি খেয়ে ফেটে শতধা বিভক্ত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে মাথায় আঘাত অনুভব করল রবিন। সাথে সাথে জ্ঞান হারাল সে।

কে যেন চাপড় মারছে ওর মুখে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুভব করল রবিন। প্রতিটি চড়ের সাথে একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরে যাচ্ছে মুখ। ঘুমের আমেজটুকু দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাক মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ করে থামতে বলছে ও, কিন্তু চড় মারা বন্ধ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত চোখ মেলল রবিন।

ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিল রানা। রবিনকে চোখ মেলতে দেখে পাশে দাঁড়ানো লোপেজের দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। বলল, 'পিস্তলটা ধরে রাখো ওর দিকে।' তারপর রবিনকে প্রশ্ন করল, 'এর মানে কি?'

ব্যথায় মুখ বিকৃত করল রবিন, মাথায় তুলল একটা হাত। কপালের একটু উপরে গোল আলুর মত ফুলে উঠেছে, সেটায় আঙুল বুলিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'বেনো কোথায়?'

'বেনো কে?'
'আমার কো-পাইলট।'
'বেঁচে আছে, কিন্তু বাঁচবে না।'
'আরও কষ্ট পেয়ে মরলে খুশি হতাম,' তিক্ত গলায় বলল রবিন। 'আমার দিকে পিস্তল ধরেছিল ও…'
'কিন্তু কন্ট্রোলে তোমাকে দেখেছি আমরা,' কড়া দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল রানা। 'প্লেনটাকে এখানে তুমিই নামিয়েছ—কেন?'
'বেনোর আদেশে—সে আমাকে বাধ্য করেছে।' কোন রকমে উঠে বসল রবিন, কিন্তু মাথাটা বন করে ঘুরে উঠল তার।
'ক্যাপ্টেন সত্যি কথা বলছে,' বলল লোপেজ। 'কো-পাইলট বেনো আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে ঘুষি মারে—এটুকু দেখেছি আমি।'
দ্রুত মুখ তুলে লোপেজের দিকে তাকাল রানা। পর মুহূর্তে মুখ নামিয়ে লোপেজের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে তাকাল বেনোর দিকে। জানতে চাইল, 'জ্ঞান আছে ওর?'
ককপিটের অপরদিকে তাকাল রবিন। ফিউজিলাজের গা ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে দেড় হাত লম্বা একটা কঠিন পাথর। এই পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বেনোর পাঁজরের খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য, এখনও জ্ঞান হারায়নি সে। খোলা চোখ জোড়ায় ফুটে আছে কদর্য ঘৃণা, এদিকেই তাকিয়ে আছে সে।
একঘেয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ বিরক্ত করছে রবিনের কান দুটোকে। 'ওদের কার কি অবস্থা?'
'চুপ!' ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে নির্দেশ দিল রানা। কারণ কথা বলতে শুরু করেছে বেনো।
ঠোঁট জোড়া নড়ছে বেনোর, দুই কোণ বেয়ে ফেনা আর রক্ত গড়িয়ে নামছে। 'ওরা আসছে!' অস্পষ্ট স্বরে বলল সে, 'এই পৌঁছুল বলে!' হাঁপাচ্ছে বেনো, বোঝা যাচ্ছে সময় হয়ে এসেছে তার, অথচ চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। রক্তাক্ত ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল তার, হাসছে সে। বলল, 'আমাকে ওরা হাসপাতালে নিয়ে যাবে, আমি ভাল হয়ে উঠব, কিন্তু তোমাদের কারও রেহাই নেই। এক এক করে তোমাদেরকে…তোমাদের সবাইকে খুন করবে ওরা…' খক খক করে কেশে উঠল বেনো, গলগল করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসে তার গলা বুক সব ভাসিয়ে দিল। কাশির দমকে কেঁপে উঠছে শরীরটা, সেই অবস্থায় একটা হাত উপর দিকে তুলল সে, সিধে করা আঙুলগুলো বেঁকে যাচ্ছে, দ্রুত একটা মুঠো পাকাল সে, বলল, 'ভিভাগুই…'
নিষ্প্রাণ সাপের মত ঝুপ্ করে পড়ে গেল বেনোর হাতটা। বিস্ফারিত চোখ দুটোয় বিস্ময়—যেন মৃত্যু এসে আশ্চর্য করে দিয়েছে তাকে।
এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল রানা। পাল্স দেখে বলল, 'শেষ।'
'বদ্ধ উন্মাদ!' বলল রবিন, 'কি প্রলাপ বকে গেল, কিছুই বুঝলাম না!' মাথাটা নাড়া খেয়েছে তীব্রভাবে, এখনও ঘুরছে বলে উঠে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না।

প্যাসেঞ্জার কেবিনে এখনও গোঙাচ্ছে মেয়েলোকটা। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' বলল রানা, 'বেরোও সবাই!'

ঠিক এই সময় দুলে উঠল ডাকোটা, এক নিমেষে গোটা ককপিট উঠে পড়ল শূন্যে। প্রচণ্ড শক্তিতে ধাতব পদার্থ টেনে ছেঁড়ার কর্কশ শব্দ শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল সবার কলজে। ফিউজিলাজ ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়া পাথরটা অ্যালুমিনিয়ামের আচ্ছাদন ছিঁড়ে আরও বড় করছে গর্তটাকে। কি ঘটছে তা হঠাৎ অনুমান করতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'নোড়ো না! ফর গডস সেক, কেউ নোড়ো না!' বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে রবিনের দিকে তাকাল সে। 'জানালা ভাঙো ক্যাপ্টেন—কুইক!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতে সময় নিচ্ছে রবিন।

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, কুঠারটা এখনও হাতে রয়েছে ওর। চিড় ধরা উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচে আঘাত করল ও। কাঁচের ভিতর ঢোকানো স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে গেল কুঠার। একজন মানুষ গলে বেরিয়ে যাবার মত গর্ত করে একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে রবিন। ভাবছে—এই লোকটা সম্পর্কে তার ধারণা ঠিকই ছিল। বিপদে এ লোক দিশা হারায়নি, বরং তৎপর হয়ে উঠেছে। প্লেনের ক্যাপ্টেন হিসেবে এই বিপদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা তারই, কিন্তু সে অসুস্থ বলে তার অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেই দায়িত্ব তুলে নিয়েছে কাঁধে। বিপদে ভরসা করা যায় এমন একজন লোক তাদের মধ্যে আছে ভেবে খুশি হলো সে।

'বাইরে গিয়ে কি দেখব অনুমান করতে পারছি,' বলল রবিন। 'পিছন দিকে কেউ যাবে না তোমরা—অন্তত আমি যতক্ষণ যেতে না বলি। যারা নড়তে চড়তে পারছে তাদের সবাইকে এখানে ডেকে নাও, রানা।'

ছোট ফাঁকটা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রবিন, ডাকোটার প্রকাণ্ড নাকের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। মোচড় খেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে শরীরটাকে ককপিট থেকে বের করে আনল ও, ফিউজিল্লাজের উপর নেমে ডাকোটার পিছন দিকে তাকাল। প্লেনের একটা ডানা এবং লেজ রানওয়ের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে উপত্যকার উপর শূন্যে ঝুলছে। ফিউজিলাজের গা ভেদ করে ঢুকে পড়া পাথরটাই এখনও ঝুলিয়ে রেখেছে প্লেনটাকে, একটু এদিক ওদিক হলেই ভারসাম্য হারিয়ে খসে পড়বে নিচে। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন, হঠাৎ লেজটা আরও কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল, সাথে সাথে অ্যালুমিনিয়াম ছেঁড়ার কর্কশ আওয়াজ পাওয়া গেল ককপিট থেকে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় শরীরটা ঘুরিয়ে ককপিটের দিকে মুখ করল রবিন। রানাকে বলল, 'বিপদে আটকে পড়েছি আমরা।' ককপিটের ভিতর পাথরটাকে দেখাল সে। 'ওটা ঝুলিয়ে রেখেছে গোটা প্লেনটাকে। ছেড়ে দিলে সোজা দুশো ফিট নিচে গিয়ে পড়ব।'

ভুরু থেকে গড়িয়ে চোখের পাতায় নেমে এল এক ফোঁটা ঘাম, দ্রুত চোখ বুজল রবিন। 'প্যাসেঞ্জার কেবিনে কেউ গেলে ভারসাম্য থাকবে না,' গলার

কাঁপুনিটা নিজেই টের পেল ও। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, কেউ নড়াচড়া না করলেও খসে যেতে পারে...'

'যারা পারো, এদিকে চলে এসো।' দরজার দিকে ফিরে বলল রানা।

শব্দ শুনে বোঝা গেল থেমে থেমে পা ফেলছে কে যেন। এক মুহূর্ত পর দরজায় দেখা গেল ডক্টর স্যামুয়েল জনসনকে। মাথার মাঝখানে চকচকে সুন্দর টাকটা বেঢপ ভাবে ফুলে আছে, জুলফি গড়িয়ে নামা রক্ত অবশ্য শুকিয়ে গেছে এরই মধ্যে। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে এখনও সে, রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখের চেহারা।

চিৎকার করল রানা, 'আর কেউ?'

ব্যাকুল গলা ভেসে এল সিনোরিটা বেনেদেতার, 'আমার কাকুকে সাহায্য করুন, প্লীজ।'

পথ থেকে ডক্টর জনসনকে সরিয়ে দরজার ওপারে পা রাখল লোপেজ। 'সাবধান!' দ্রুত বলল রানা, 'ভিতরে বেশি দূর যেয়ো না।'

উত্তর না দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল লোপেজ। বৃদ্ধ মন্টেসকে দু'হাত দিয়ে ধরে তোলার সময় ছোটখাট রোগাটে একজন লোকের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে বলল, 'ধন্যবাদ।' বৃদ্ধ মন্টেসের পাশে বসে অনর্গল বাংলা ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল লোকটা, শরীরের সর্বত্র হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছিল কোথাও কোন হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা।

বৃদ্ধ মন্টেসকে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল লোপেজ, ওদের পিছু পিছু এল বেনেদেতা।

সোহানার গলার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। অশীতিপর বৃদ্ধা মিস জুডিকে বলছে, 'বিপদ কেটে গেছে, আপনি ভয় পাবেন না...' রবিনের দিকে তাকাল ও, বলল, 'ভিড় না বাড়িয়ে এক এক করে সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া যাক, কি বলো?'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বলল রবিন। 'ওপরে উঠে অপেক্ষা করুক সবাই। এদিকটায় ওজন যত বেশি হবে ততই ভাল। মেয়েরা...,' ককপিটে বেনেদেতা একমাত্র মেয়ে লক্ষ্য করে তাকে বলল, 'তুমি আগে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল বেনেদেতা। 'কক্ষনো না! আগে আমার কাকু।'

'সিনর মন্টেস অসুস্থ,' বলল রানা, 'তাঁকে ধরাধরি করে ওপরে তুলতে সময় লাগবে। তুমি উঠে যাও, সিনরের দিকে আমি খেয়াল রাখব।'

জেদ ধরে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বেনেদেতা।

বিরক্ত হয়ে ডক্টর জনসনের দিকে ফিরল রবিন। 'তুমি এসো, ডক্টর। নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে।'

ডক্টর জনসনকে উপরে উঠতে সাহায্য করল রবিন। আবার যখন ককপিটের ভিতর তাকাল সে, দেখল নিচু গলায় বেনেদেতার সাথে দ্রুত কথা বলছে রানা। মত বদলে মাথা কাত করল বেনেদেতা, অর্থাৎ কাকুকে রেখে উপরে উঠতে এখন আর তার আপত্তি নেই। বিস্ময় বোধ করল রবিন। তার কথায় সাপের মত ফণা তুলল, কিন্তু রানার কথায় কি সুন্দর চট করে রাজী হয়ে গেল! আশ্চর্য গুণী লোক সন্দেহ নেই। শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদের মনও জয় করে ফেলেছে।

নিঃশব্দে বেনেদেতার হাত ধরে তাকে উপরে উঠতে সাহায্য করল রবিন।

প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে এরপর বেরিয়ে এল ডক্টর রেমন্ড কোনালি। মাথায় আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, হুঁশ ফিরে পেয়ে নিজেই ককপিটে চলে এসেছে। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ তার পোশাক-আশাক এবং চেহারায় সেই পরিচ্ছন্ন ফিটফাট ভাবটুকু এখনও অম্লান। মুখে হাত বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে তার সাধের কালো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। রবিন তাকে সাহায্য করল উপরে উঠতে।

'প্যাসেঞ্জার কেবিনটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে,' রবিনকে বলল ডক্টর কোনালি। 'পিছনের সীটের মি. হফ সম্ভবত মারা গেছেন। মিসেস হফও সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন, বোধ হয় বাঁচবেন না। একটা মেয়ে আর ছোটখাট চেহারার এক লোক সেবা-শুশ্রূষা করছে দেখে এলাম।'

'জোসেফ মিলার কোথায়?'

'লাগেজের নিচে দু'জনেই আমরা চাপা পড়েছিলাম,' বলল কোনালি। 'জ্ঞান ফিরে পেয়ে লাগেজের নিচ থেকে তাকে বের করতে গিয়ে দেখলাম আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'মিস জুডির অবস্থা?'

'কোথাও ব্যথা পাননি। ভয় পেয়েছেন বলেও মনে হলো না। একেবারে বোবা বনে গেছেন।'

প্যাসেঞ্জার কেবিনের সব খবর রানাকে শোনাল রবিন। সিনর মন্টেস জ্ঞান হারিয়েছেন, তাঁর পাশে বসে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে লোপেজ।

অক্সিজেনের অভাবে হাঁপাচ্ছে সবাই। কেউ কম, কেউ বেশি। রবিনের মাথার ব্যথাটা বাড়তে শুরু করেছে।

খানিক ইতস্তত করে বলল রানা, 'ওজনের দিক থেকে এদিকটা এখন ভারী। ওদিকে এখন যেতে পারি, কি বলো?'

'হালকা পায়ে হেঁটে যাও,' বলল রবিন। 'গিয়েই তোমার বান্ধবী আর সহকারীকে এদিকে পাঠিয়ে দাও।'

নিঃশব্দে এগোল রানা। দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই দেখল মিস জুডিকে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, দুই চোখে শূন্য দৃষ্টি। গিলটি মিয়া দ্রুত হাতে লাগেজ সরাচ্ছে, সেগুলোর ভিতর জোসেফ মিলারের ফোলা মুখটা দেখা যাচ্ছে। একেবারে শেষ প্রান্তে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে সোহানা, কি করছে বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে।

'সোহানা, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'মিস জুডিকে নিয়ে ককপিটে চলে যাও—কুইক।'

দম দেয়া পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল সোহানা। কাঁধ থেকে খসে পড়ল শাড়ির আঁচল, সেদিকে খেয়াল নেই তার। রানার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে সে। দুই চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি। রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ওকে ফেলে রেখে যেয়ো না।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে ককপিটের দিকে এগোল সোহানা। মিস জুডির হাত ধরে তার পিছু নিল গিলটি মিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল রানা,

তারপর এক পা এগিয়ে সুটকেস আর ব্যাগ সরিয়ে মুক্ত করল জোসেফ মিলারকে। নড়েচড়ে উঠল লোকটা। দু'হাত দিয়ে কাঁধ ধরে কয়েকবার নাড়া দিল তাকে রানা, চোখ মেলে তাকাল সে।

'দাঁড়াতে পারবে?' ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড রানাকে দেখে নিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করল মিলার। আবার বলল রানা, 'সোজা ককপিটে চলে যাও।'

সোজা হলো রানা। তিন পা এগিয়েই রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। চেনার কোন উপায় নেই বুড়ো হফকে। হাসি খুশি সতেজ-প্রাণ লোকটা এখন রক্ত মাংসের একটা চ্যাপ্টা পিণ্ড হয়ে গেছে। ভারী কার্গোর বাক্সগুলো ধসে পড়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে পিছনের দুটো সীট, সেই সাথে খুন করেছে বুড়ো হফকে। প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন মিসেস হফ, যদিও এভাবে বেঁচে যাওয়ার চেয়ে বোধহয় মরে যাওয়াই ভাল ছিল। হাঁটুর কাছ থেকে দুটো পা-ই আলাদা হয়ে গেছে তাঁর। কাঁধে একটা স্পর্শ অনুভব করল রানা।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, মিলার। 'ককপিটে যেতে বলেছি তোমাকে,' বলল রানা।

'এখান থেকে নড়ব না আমি,' খানিকটা জেদ, খানিকটা আবদারের সুরে বলল মিলার। 'বাইরে ঠাণ্ডা। ওরা বলছে সবাইকে নাকি অনেক হাঁটতে হবে—ওসব আমার সইবে না। আমি এখানে থাকব।'

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বুঝতে পারল রানা। ধাঁই করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল লোকটার নাকে। পড়ে যেতে না দিয়ে আরেক হাত দিয়ে তার মাথার চুল মুঠো করে ধরে ফেলল ও, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল দরজা পর্যন্ত। লোপেজকে ডেকে বলল, 'গাধাটাকে সামাল দাও। বাড়াবাড়ি করলে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে রাখো।'

মিস জুডি, সোহানা এবং গিলটি মিয়াকে উপরে তুলে নিয়েছে রবিন। 'কি দেখলে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'মিসেস হফ বাঁচবেন না।'

'বের করে আনো ওকে,' ককপিটের বাইরে থেকে চিৎকার করে বলল সোহানা। 'রানা, প্লীজ!'

আবার ফিরে গেল রানা প্যাসেঞ্জার কেবিনে। মিসেস হফ বেঁচে আছেন কিনা বুঝতে পারল না ও। তবে শরীর এখনও গরম, এই যা। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে কিনা ধরা যাচ্ছে না। পালসও পাচ্ছে না রানা। পাঁজাকোলা করে তুলে আনল তাঁকে ককপিটে।

বীভৎস দৃশ্যটা দেখেই আঁতকে উঠল লোপেজ। দুই হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে আছে মিসেস হফকে রানা। হাঁটুর কাছ থেকে দুটো পা নেই, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে অনবরত।

জ্ঞান ফিরে এসেছে সিনর মন্টেসের। রবিনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলল লোপেজ, 'সিনরকে তুলে নাও ওপরে।' ইতিমধ্যে গায়ের শার্ট খুলে ফেলেছে সে। ছিঁড়ে ফালি ফালি করছে সেটাকে।

একটা সীটে মিসেস হফকে নামিয়ে রাখল রানা। রবিন আর ও দু'জন ধরাধরি

করে উপরে উঠতে সাহায্য করল সিনর মন্টেসকে।

রানা আবার প্যাসেঞ্জার কেবিনের দিকে এগোচ্ছে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের, গলা চড়িয়ে বলল, 'আবার কেন?'

'কাপড়, গরম কাপড় দরকার হবে আমাদের,' বলল রানা। 'প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে রাতে...'

রানার কথা শেষ হলো না, আবার একবার নড়ে উঠল ককপিট, সেই সাথে পাথরের সাথে অ্যালুমিনিয়ামের ঘষা খাওয়ার কর্কশ শব্দ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। লোপেজও একচুল নড়ছে না। কয়েক সেকেন্ড পর উপর থেকে রবিন বলল, 'এটাই বোধহয় লাস্ট ওয়ার্নিং। এরপর আর কোন সুযোগ না দিয়ে খসে পড়বে। উঠে এসো তোমরা...'

'কিন্তু গরম কাপড় না থাকলে রাতের মধ্যেই সবাই আমরা মারা যাব,' বলল রানা।

'কিন্তু উপস্থিত ঝুঁকিটা নেয়ারও কোন মানে হয় না।'

মিসেস হফের ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে লোপেজ, মুখ না তুলেই সে বলল, 'সিনর রানা ঠিক বলছে। কাপড় না থাকলে ঠাণ্ডায় সবাই মারা যাব আমরা রাতের মধ্যেই।'

'ঝুঁকি নিতে চাও নাও,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রবিন। 'কিন্তু তার আগে আমি এদের সবাইকে রানওয়েতে নামিয়ে দিতে চাই। লোপেজ, তোমার হলো? ভাল কথা, আমার সীটের পাশে একটা পকেট আছে, ওতে এই এলাকার কিছু এয়ার চার্ট পাবে, বের করে নিতে ভুলো না।'

'ঠিক আছে,' মাথা না তুলেই বলল লোপেজ।

ফিউজিলাজের মাথা থেকে এক এক করে সবাইকে এয়ার-স্ট্রিপে নামিয়ে দিল রবিন। এরপর প্যাসেঞ্জার কেবিনে ঢুকে সুটকেসগুলো নিয়ে আসতে শুরু করল রানা। পেট উঁচু ভাঁড়ের মত একধারে মুখ হাঁড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে মিলার। তাকে ঠ্যালা-গুঁতো মেরে উইন্ডস্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করল রানা। ফিউজিলাজের উপর উঠে এবার সে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল রবিনের জন্যে। নিচে নামতে চায় না। উপায় নেই দেখে তাকে ঠেলে ফেলে দিল রবিন। নিচে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকল সে।

লোপেজ রক্তাক্ত পিণ্ড মিসেস হফকে তুলে দিল রবিনের হাতে। তারপর নিজে উঠে রবিনের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিল অচেতন শরীরটা। দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে মিসেস হফকে ধরে রেখে লাফ দিয়ে রানওয়েতে নামল সে।

রবিনের হাতে দ্রুত সুটকেস পাচার করছে রানা, রবিন সেগুলো বিশৃঙ্খলভাবে নিচে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ডালা খুলে গেল কয়েকটা সুটকেসের।

হঠাৎ আবার নড়ে উঠল ডাকোটা।

'সিনর রানা!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল রবিনের গলা থেকে। 'উঠে এসো।'

'আরও সুটকেস রয়েছে যে।'

'গেট আউট, ফর গডস সেক!' আতঙ্কে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেল রবিনের। 'নেমে যাচ্ছে প্লেন!'

রানার বাড়ানো হাতটা খপ করে ধরল রবিন, দুই সেকেন্ড পর ছেড়ে দিল আবার। নিজেই এখন উঠতে পারবে রানা। দ্রুত ফিউজিলাজের মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নিচে।

দুই সেকেন্ড পর নিচের দিকে লাফ দিল রানা। রানওয়েতে ওর পা স্পর্শ করার আগেই ডাকোটার সামনের ভাগটা স্যাঁত করে সোজা উঠে গেল আকাশের দিকে, কিনারা থেকে গড়িয়ে নামতে শুরু করল প্লেনটা। কর্কশ আওয়াজের সাথে ধুলোর একটা পাহাড় উঠল। দুশো ফিট নিচ থেকে ভেসে এল সংঘর্ষের শব্দ। তারপর সব নিস্তব্ধ।

চারদিকে দাঁড়ানো বোবা লোকগুলোর দিকে তাকাল রানা। তারপর চোখ ঘুরিয়ে দেখল ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা নির্দয় পাহাড়গুলোকে। তুষার ছুঁয়ে ছুটে আসছে হিম বাতাস, ঠাণ্ডায় কেঁপে গেল শরীরটা। পরমুহূর্তে লোপেজের সাথে চোখাচোখি হতে সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে শিউরে উঠল ও।

ওরা দু'জনেই জানে, এই অপ্রত্যাশিত বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ডাকোটা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে নিজেদেরকে তারা আরও ভয়াবহ, আরও কষ্টকর পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তিন

'ব্যাপারটা প্রথম থেকে শোনা যাক,' বলল রানা।

এয়ার-স্ট্রিপের কাছেই কেবিনগুলোর একটায় আশ্রয় নিয়েছে ওরা। কেবিনটা খালি এবং নির্জন, কিন্তু নিশ্ছিদ্র—ফুটোফাটা দিয়ে বাতাস ঢোকার কোন উপায় নেই। ছোট একটা ফায়ার প্লেসও আছে, অন্য একটা কেবিন থেকে কাঠ নিয়ে এসে সেখানে একটা আগুনও জ্বেলে ফেলেছে ডক্টর কোনালি। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে অনেকেই বারবার তাকাচ্ছে। ধুলো-বালি আর তুষার লেগে প্রায় সবার কাপড়চোপড় এরই মধ্যে নোংরা হয়ে গেছে। মারাত্মক ভাবে আহত হয়নি যারা তাদেরও কেউ পুরোপুরি অক্ষত নয়, এখানে সেখানে কেটেছিঁড়ে গেছে প্রায় সবারই। কিন্তু ডক্টর কোনালির দিকে তাকালে মনে হচ্ছে সদ্য ইস্ত্রি করা পোশাক পরেছে সে। শরীরের কোথাও এতটুকু ময়লা বা কাটাছেঁড়ার দাগ নেই। সুযোগ পেলেই বাঁ হাতের মধ্যমায় গলানো হীরের আঙটিটা সাদা পশমের ওভারকোটে ঘষে নিচ্ছে সে। পরিচ্ছন্ন থাকার অদ্ভুত একটা গুণ রয়েছে লোকটার মধ্যে, অথচ কারও চেয়ে কম খাটাখাটনি করছে না সে, কাজের ব্যাপারে বাছবিচারও করছে না।

বৃদ্ধ সিনর মন্টেস কেবিনের একধারে শুয়ে আছেন। তাঁর দেখাশোনা করছে বেনেদেতা! সুঠামদেহী লোপেজ অত্যন্ত কম কথার লোক, নিঃশব্দে মিসেস জুডি আর সোহানাকে সাহায্য করছে সে। ওরা দু'জন মিসেস হফের শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

মদের নেশা এখনও কাটেনি জোসেফ মিলারের। চিৎ হয়ে শুয়ে রক্তচক্ষু মেলে

তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার গায়ে হাত তোলা! তোমাকে আমি দেখে নেব।'

শুনতে পেলেও তাঁর কথায় কান দিচ্ছে না রানা।

লোপেজ ডাক্তার নয়, কিন্তু রোগ এবং ওষুধপত্র সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে তার। কথাটা সে কাউকে বলেনি, কাজ দিয়ে প্রমাণ করছে।

মিসেস হফের চিকিৎসা দরকার, তাই কেবিনে ঢুকেই রানা আহ্বান করেছিল ডক্টর জনসনকে।

'দুঃখিত,' জনসন বলল, 'আমি একজন ফিজিসিস্ট—ফিজিশিয়ান নই।'

কোনালিও একজন ডক্টর। তাই সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়েছিল রানা।

ম্লান মুখে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। 'দুঃখিত,' বলল কোনালি। 'আমি একজন হিস্টোরিয়ান।'

'কি করা যায় দেখছি আমি,' বলল লোপেজ। পিস্তলধারী লোকটা নেমে পড়ল ডাক্তারের ভূমিকায়।

রানার দিকে মনোযোগ ফেরাল রবিন। বলল, 'বেশ, শোনো—যতটুকু জানি, বলছি।'

টেলিফোন করে ফ্লাইট ম্যানেজার তাকে ডাকার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে সব বলল রবিন। বেনোর সাথে তার যা কথাবার্তা হয়েছে তার কিছুই বাদ দিল না। 'আমার বিশ্বাস,' সব শেষে মন্তব্য করল সে, 'হঠাৎ করে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল ওর।'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'না। এর মধ্যে পাগলামির ছিটেফোঁটাও নেই। গোটা ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত। এই এয়ার-স্ট্রিপের খবর জানা ছিল বেনোর, এখানে পৌঁছবার কোর্সও জানত সে। তুমি ঠিক জানো, স্যামেয়ারের বোয়িং যখন নামে তখন সান ক্রোস এয়ারপোর্টে বেনো ছিল?'

'জানি। ফ্লাইট ম্যানেজারের মুখে কথাটা শুনে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম, এখন মনে পড়ছে। রাত দুপুরে এয়ারপোর্টের ধারে কাছে থাকার লোক বেনো ছিল না, অথচ...'

টেকো ডক্টর মাথা নেড়ে বলল, 'স্যামেয়ার বোয়িংয়ে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে তা কি তবে জানত সে?'

ডক্টর জনসনের দিকে তাকাল রানা, 'ঠিক ধরেছ। জানত। বেনো প্লেন হাইজ্যাক করেনি, সে হাইজ্যাক করেছে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদেরকে। রবিন বলছে কার্গো বলতে বাক্সগুলোয় সাধারণ মাইনিং মেশিনারী ছাড়া আর কিছু নেই—সুতরাং ধরে নেয়া যায় ওগুলো চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল না বেনোর।'

সবাই চুপ করে শুনছে রানার কথা।

'তার মানে,' বলল রানা, 'বোয়িং-এ যে যান্ত্রিক গোলযোগটা দেখা দিয়েছিল সেটা সাধারণ কোন দুর্ঘটনা নয়, স্যাবোটাজ। বাধ্য হয়ে বোয়িং সান ক্রোসে নামবে, এটা জানত বেনো, তাই সে ওখানে অপেক্ষা করছিল।' একটু বিরতি নিয়ে বলল রানা, 'এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে সুসংগঠিত একটা দল কাজ করছে।'

'তা আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি,' বলল রবিন। 'বেনো আশা করেছিল এখানে তার দলের লোকেরা থাকবে। মরার আগে কি বলল মনে আছে?...ওরা আসছে, এই পৌঁছুল বলে!'

'কিন্তু আমরা এখনও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,' বলল ডক্টর ফিটফাট।

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল ও। 'বাইরে একজনের থাকা দরকার।'

বৃদ্ধা মিস জুডির কানে কানে কি যেন বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে গিলটি মিয়া।

ব্যাপারটাকে রানা হালকা ভাবে দেখছে না বুঝতে পেরে সবাই কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠল।

'কিন্তু কারা ওরা? বেনোর সাথে তাদের কি সম্পর্ক?' হতভম্ব দেখাচ্ছে রবিনকে।

বেনোর শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করল রানা, '...কিন্তু তোমাদের কারও রেহাই নেই। এক এক করে তোমাদেরকে...তোমাদের সবাইকে খুন করবে ওরা...ভিভাগুই...'

'ভিভাগুই? মোটামুটি ভাল স্প্যানিশ জানি আমি,' বলল রবিন। 'ভিভাগুই—শব্দটা স্প্যানিশ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু...'

সুঠামদেহী লোপেজ নিঃশব্দে মুখ তুলল। চোখাচোখি হলো তার সাথে সিনোরিটা বেনেদেতার। দু'জন দু'জনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'স্প্যানিশ ভাষাটা আমিও জানি,' বলল রানা। 'ভিভাগুই বলে কোন শব্দের সাথে আমার পরিচয় নেই। যাকগে। আমি আরও একটা কথা ভাবছি।'

রানার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য অনুভব করে সবাই ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

'এ ব্যাপারে একা শুধু বেনোই কি দায়ী? নাকি তার সাথে প্লেনের ভেতর আরও কোন সহযোগী ছিল?'

কেবিনের শেষপ্রান্ত থেকে দুর্বল একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তা জানি না। তবে একদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্যে দায়ী একা আমি।'

মিসেস হফ ছাড়া বাকি সবাই একযোগে ঘাড় ফেরাল বৃদ্ধ সিনর মন্টেসের দিকে।

পরাস্ত, অসুস্থ দেখাচ্ছে সিনর মন্টেসকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। কথা বলার জন্যে আবার তিনি মুখ খুলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাতচাপা দিল বেনেদেতা। বলল, 'তুমি চুপ করো, কাকু। আমি বলছি যা বলার।'

মুখ তুলে কেবিনের এদিকে প্রথমে রবিন, তারপর রানার দিকে তাকাল বেনেদেতা, বলল, 'আমার কাকার নাম মন্টেস নয়, বরগুয়িজ।' কথাটা বলে এমনভাবে চুপ করে রইল যে এরপরে যেন আর কিছু বলার দরকার করে না।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তারপর সবিস্ময়ে বলল রবিন, 'মাই গড, বুড়ো ঈগল স্বয়ং!' অসুস্থ বৃদ্ধের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'হ্যাঁ, সিনর রবিন,' বিড় বিড় করে বললেন বৃদ্ধ বরগুয়িজ। 'ঈগল বটে, কিন্তু

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত!'

'কে ও?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল জোসেফ মিলার। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নাকি? যত্তোসব নাটুকেপনা!'

নিঃশব্দে তাকাল তার দিকে লোপেজ। মুখের চেহারায় তেমন কোন ভাব নেই, কিন্তু দুই চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ক্রোধের আগুন।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল রানা।

চরম বিরক্তির সাথে মিলারের দিকে একবার তাকাল ডক্টর টেকো। বলল, 'ছিঃ!'

মৃদু গলায় বলল রানা, 'সিনর বরগুয়িজ সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

'এই দেশে, এই সেন্ট্রাল কর্ডিলেরায় এ পর্যন্ত যে ক'জন রাজনৈতিক নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনর বরগুয়িজ,' বলল রবিন। 'পাঁচ বছর আগে তিনি এদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এক সামরিক অভ্যুত্থানে পদচ্যুত হন। অল্পের জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াড়কে ফাঁকি দিয়ে দেশত্যাগ করেন।'

'সেজন্যে এখনও নিজের কপাল চাপড়ায় জেনারেল মোয়াজা,' মৃদু, দুর্বল হাসি দেখা দিল সিনর বরগুয়িজের ঠোঁটে।

'দুর্বোধ্য লাগছে,' টাক নেড়ে বলল ডক্টর জনসন; 'আপনি বলতে চাইছেন এতগুলো গণ্যমান্য লোককে বিপদে ফেলার জন্যে এ-দেশের সরকার দায়ী? একজন প্রতিপক্ষকে ধরার জন্যে কোন সরকার এ-ধরনের ষড়যন্ত্র করতে পারে···?'

মাথা নেড়ে কথা বলতে যাচ্ছিলেন সিনর বরগুয়িজ, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলে উঠল বেনেদেতা, 'আমার কাকাকে আর কোন প্রশ্ন করতে পারবে না তোমরা। দেখতে পাচ্ছ না উনি অসুস্থ?'

'সিনরের হয়ে তুমি কথা বলতে পারো,' পরামর্শ দিল রানা। 'আমরা কেন কি অবস্থায় পড়েছি জানা দরকার আমাদের সবারই।'

রানাকে সমর্থন করে সবাই মিলে একটা গুঞ্জন তুলল।

অনুমতির জন্যে কাকার দিকে তাকাল বেনেদেতা। সিনর বরগুয়িজ নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। 'বলো কি জানতে চাও,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল বেনেদেতা, 'তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ একজন প্রশ্ন করো আমাকে।'

রবিন, ডক্টর জনসন, ডক্টর কোনালি এবং মিসেস জুডি—চারজন একযোগে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

বেনেদেতার দিকে তাকাল রানা, প্রশ্ন করল, 'সেন্ট্রাল কর্ডিলেরায় কেন ফিরে এসেছেন তোমার কাকা?'

'দেশকে রক্ষা করার জন্যে। জেনারেল মোয়াজাকে উৎখাত করতে চান কাকা। জনসাধারণ তাঁকে আবার দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেতে চায়।'

'ব্যাপারটা হাস্যকর নয়?' বলল রানা। 'অসুস্থ একজন বৃদ্ধ সাথে এক ভাইঝিকে নিয়ে যাচ্ছেন দেশের সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে—পাগলামি নয়?'

মুখ ভেংচে ইংরেজিতে যা বলল মিলার তার সারমর্ম অনেকটা এই রকম, 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।'

মিলার নীচ প্রকৃতির লোক, তা ইতিমধ্যেই জানা হয়ে গেছে সবার। বেনেদেতা তার কথায় কানই দিল না। কিন্তু চটে উঠল রানার উপর। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। ফুলে উঠল নাকের ফুটো। 'তুমি বিদেশী—তুমি কিচ্ছু জানো না। মোয়াজার দিন শেষ হয়ে এসেছে—সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার সবাই এ-কথা জানে। মোয়াজার নিজেরও তা জানতে বাকি নেই। অত্যন্ত লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ লোক সে। দেশের প্রতিটি নিরীহ মানুষ তাকে ঘৃণা করে।'

জুলফির নিচেটা আঙুল দিয়ে ঘষছে রবিন, বলল, 'বেনেদেতা ঠিক কথাই বলছে। জেনারেল মোয়াজার অত্যাচারে দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠে গেছে, এ-কথা বহুবার শুনেছি। পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার সুইস ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছে সে, এটা একটা ওপেন সিক্রেট। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, দেশের মানুষ রুখে দাঁড়ালে বিদ্রোহ দমন করার বদলে লেজ গুটিয়ে পালানোটাই বেশি পছন্দ করবে সে। যা কামাবার কামিয়ে নিয়েছে, সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে। এই অবস্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি সে নেবে বলে মনে হয় না।'

'সেই সুযোগই খুঁজছে ছাত্ররা,' বলল বেনেদেতা। 'আজ প্রায় তিনমাস ধরে প্রকাশ্য কোন অনুষ্ঠানে ভয়ে হাজির হয় না মোয়াজা। এ থেকেই তার অবস্থা বোঝা যায়। দেশটাকে সে দেউলিয়া করে ছেড়েছে, কিন্তু আমার কাকা সান্তিলানায় পৌঁছুলেই দেশের মানুষ জেগে উঠবে, তখন মোয়াজাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে।'

'ধরে নিতে পারি, জেনারেল মোয়াজাকে উৎখাত করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

একটু ইতস্তত করে বেনেদেতা বলল, 'অবশ্যই। ডেমোক্রেটিক কমিটি অভ অ্যাকশন সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাকি শুধু আমার কাকার সান্তিলানায় পৌঁছানো।'

'সেখানে উনি কি পৌঁছুতে পারবেন?' বলল রানা। 'একটা সুসংগঠিত দল তাঁকে বাধা দিচ্ছে। তুমি বলছ সরকার নয়—তবে কারা?'

'সন্ত্রাসবাদীরা,' চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলে উঠল বেনেদেতার। 'তারা চায় না আমার কাকা আবার প্রেসিডেন্ট হোক। দেশটাকে তারা নিজেদের মুঠোয় আনতে চায়। কায়েম করতে চায় আর এক সন্ত্রাসের রাজত্ব।'

'হুঁ,' বলল রবিন। 'মোয়াজার দিন শেষ। দ্বন্দ্বটা এখন সিনর বরগুয়িজ বনাম সন্ত্রাসবাদী একটা গ্রুপের মধ্যে।'

'কিন্তু ক্ষমতা দখলের জন্যে এখনও তৈরি নয় ওরা,' বলল বেনেদেতা। এতটুকু জনসমর্থন নেই ওদের। মোয়াজাকে সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করবে, অতটা যোগ্যতা অর্জন করেনি এখনও। ওরা চাইছে আপাতত মোয়াজাই ক্ষমতায় থাকুক এবং দিনে দিনে আরও দুর্বল হোক। ইতিমধ্যে নিজেরা প্রস্তুতি নেবে। যখনই দেখবে ক্ষমতা দখল করার মত অবস্থা হয়েছে তখনই মোয়াজাকে সরিয়ে তার জায়গায় নিজেরা বসবে। কিন্তু এখন যদি আমার কাকা মঞ্চে নামেন, তাঁকে সরানো ওদের পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হবে না। সেজন্যেই ওরা কাকাকে খুন

করার পরিকল্পনা নিয়েছে।'

'বেনো তাহলে ওদেরই একজন ছিল?'

'নিশ্চয়ই!' বলল রবিন। 'এখন শব্দটার অর্থ বুঝতে পারছি! ভিভাগুই—মানে, ভিভা আগুইলার! আঁদ্রে আগুইলার সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা! মাই গড!'

'যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি আমরা,' চিন্তিতভাবে আবার সবাইকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল রানা।

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের,' ঢোক গিলে বলল বেনেদেতা। 'কাকাকে পেলে ওরা...'

হঠাৎ রানা ঝট্ করে তাকাল লোপেজের দিকে। 'তোমার ব্যাপারটা কি, লোপেজ? একবারে যে বোবা মেরে গেছ? পরিচয় দিয়েছ ইমপোর্টার বলে—কি আমদানী করো তুমি?'

'উত্তেজিত হয়ো না, সিনর রানা,' বৃদ্ধ নেতা বললেন, 'মিগুয়েল লোপেজ আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

'স্বাস্থ্য আর গাম্ভীর্য দেখে আমার মনে হয় আপনার বডিগার্ড,' ফোড়ন কাটল রবিন। রানার দিকে ফিরল ও, 'কি দেখে সন্দেহ হলো তোমার?'

'সশস্ত্র লোক মাত্রই সন্দেহের পাত্র,' বলল রানা। 'সে যাক। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও আমি পাইনি। এখানে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি তাদের মধ্যে আর কেউ জোকার আছে কি? কিংবা আর কোন সন্ত্রাসবাদী?'

স্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশটা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে নিঃশব্দে। কেউ নড়ছে না। হঠাৎ থুরথুরে বুড়ি মিস জুডি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'সাত বছর কম একশো বয়স আমার, মুখ দেখে বলতে পারি কে কেমন—এখানে তোমরা সবাই ভাল মানুষ...'

মিসেস হফের দেখাশোনা করছিল লোপেজ। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ভদ্রমহিলা মারা যাচ্ছেন। রক্ত ঝরে গিয়ে ছিবড়ে হয়ে গেছে শরীরটা। অক্সিজেন দেয়া না গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন।' তার চোখের কালো মণি সিনর বরগুয়িজের দিকে ঘুরে গেল। 'সিনরেরও অক্সিজেন দরকার।' বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। 'তাঁর হার্টের অবস্থা এমনিতেই ভাল নয়, অক্সিজেন না পেলে যে কোন মুহূর্তে ফেল করতে পারে হার্ট।' সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'আরও নিচে নেমে যাওয়া উচিত আমাদের। এত উঁচুতে থাকা সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

'কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার সবার,' মৃদু, শান্ত গলায় বলল রানা। 'সভ্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। আমাদেরকে উদ্ধারের জন্যে লোকজন আসবে, এরকম আশা করা নেহাত বোকামি হবে।' পরিস্থিতির গুরুত্ব স্মরণ করে ওর নিজেরই গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। 'তার ওপর, একদল সন্ত্রাসবাদী আমাদেরকে খুঁজছে। আমরা সী-লেভেল থেকে সতেরো হাজার ফিট উপরে রয়েছি। খাদ্য, পানি এবং অক্সিজেন—বেঁচে থাকার এই তিনটে দরকারী জিনিস আমাদের নেই—পাবারও আশা নেই। আমার জানামতে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন লোকবসতি নেই।

মোটকথা, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব সে আশা কম। কেউ যদি মনে করো আমি আতঙ্ক ছড়াবার চেষ্টা করছি, ভুল করবে।'

বাস্তব জগতে ফিরে এল ওরা সবাই। বিপদের কুৎসিত চেহারাটা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে রানা, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ কাউকে অভয়বাণী শোনাতে পারছে না। পরিবেশটা স্তব্ধ হয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। যে যার নিজস্ব চিন্তায় গম্ভীর। ফেলে আসা ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত জগৎ—মনে পড়ে যাচ্ছে সব। আবার কি তারা ফিরে যেতে পারবে সেখানে? শেষ পর্যন্ত তবে কি বেঘোরে প্রাণ হারাতে যাচ্ছে ওরা?

'আসলে বিপদটা আরও ভয়ঙ্কর,' বলল রবিন। 'তুমি বরং রেখে ঢেকে কম করে বলছ, সিনর রানা।'

মাথার ব্যথাটা সাংঘাতিক বেড়ে গেছে রবিনের। উঁচু পাহাড়ে বাতাসের চাপ কম, তার মানে অক্সিজেনের অভাব, ফলে ঘনঘন এবং দ্রুত হয়ে ওঠে শ্বাস টানা, হার্ট বিটের হার বেড়ে যায়। স্থানীয় ভাষায় এই অসুস্থতার নাম সরোচ। শব্দটা এর আগে শুনেছে রবিন, কিন্তু এর খপ্পরে পড়েনি কখনও আগে। ধীর গলায় বলল ও, 'প্লেনের অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো যদি ফেটে গিয়ে না থাকে…'

'তাই তো!' বলল লোপেজ। তাকাল রানার দিকে। 'চলো, তুমি আর আমি গিয়ে দেখে আসি। মিসেস হফকে নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না। অক্সিজেন পাওয়া গেলে তার অবশ্য দরকারও হবে না। কিন্তু পাওয়া না গেলে পাহাড় থেকে নামতেই হবে।'

'প্লেন থেকে কিছু পেট্রল নিয়ে এসো,' বলল রবিন। 'কাজে লাগতে পারে।' মিলারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'ওঠো, মিলার। আগুনটা জিইয়ে রাখার জন্যে কাঠ আনতে হবে।'

শুয়েই থাকল মিলার। বলল, 'এ-ধরনের ছোট কাজ করতে অভ্যস্ত নই আমি।'

ঝেড়ে একটা লাথি মারতে যাচ্ছিল রবিন লোকটার পাঁজরে, কিন্তু দরজার কাছ থেকে লোপেজ সতর্ক করে দিল তাকে, বলল, 'সরোচ! ওর কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভাল।'

লোপেজকে নিয়ে কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। সর্বাঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড শীত। হি হি করতে করতে চারদিকে তাকাল রানা। আশপাশে একমাত্র সমতল জায়গাটার উপর তৈরি করা হয়েছে এয়ার-স্ট্রিপটা, ওটা ছাড়া সব দিকে খাড়া, ঢালু পাহাড়ের গা। নীল আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে সাদা বরফ, তাকানো যায় না, চোখে ধাঁধা লাগে। পাহাড়ের গা যেখানে একেবারে খাড়া সেখানে তুষার জমতে পারেনি, কালো কুৎসিত পাথর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে আছে।

চারদিক নিঝুম, নিষ্প্রাণ, নির্জন। এক কণা সবুজ নেই কোথাও, নেই একটা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। কঠিন ইস্পাতের মত আকাশের নীল, চোখ ধাঁধানো তুষারের সাদা আর পাথরের কালো রঙকে চারদিকের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীরের মতই শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে রানার। গায়ের সাথে জ্যাকেটটাকে

আরও ভাল করে এঁটে নিয়ে অন্যান্য কেবিনগুলোর দিকে তাকাল ও। 'কি ছিল বলো তো এখানে?'

'এখানে কয়েকটা খনি আছে,' বলল লোপেজ। 'কপার এবং জিঙ্ক—টানেলগুলো ওদিকে,' এয়ার-স্ট্রিপের শেষ দিকের একটা পাহাড়ের গা দেখাল সে। 'কিন্তু এত উঁচুতে কাজ করা সম্ভব নয়—চেষ্টা করাই উচিত হয়নি ওদের। আমাদের পাহাড়ী লোকেরাও হার মেনে গেছে। এখন খনিগুলো পরিত্যক্ত।'

'তার মানে এ জায়গা তোমার চেনা?'

'এদিকের প্রায় সব পাহাড় আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার জন্মস্থান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

এয়ার-স্ট্রিপ ধরে একশো গজ এগোবার আগেই সাংঘাতিকভাবে হাঁপাতে শুরু করল রানা। মাথায় অসহ্য ব্যথা। বমি বমি ভাব। দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, ফুলে উঠছে বুক, তবু বাতাসের ভয়ঙ্কর অভাব বোধ করছে।

'উঁহুঁ,' নিষেধ করল লোপেজ, 'জোর করে বাতাস টেনো না। চেষ্টা ছাড়া, স্বাভাবিকভাবে টানো আর ফেলো, তাতেই প্রয়োজনীয় বাতাস পাবে। জোর করলে তোমার লাঙস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ধুয়েমুছে সব বেরিয়ে যাবে। তাতে তোমার রক্তে অ্যাসিডের ভারসাম্য নষ্ট হবে, যার পরিণতি মাসল ক্র্যাম্পস।'

সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলল রানা, 'অনেক কিছু জানো দেখছি।'

'মেডিসিনের ওপর পড়াশোনা করেছি একসময়,' সংক্ষেপে বলল লোপেজ।

এয়ার-স্ট্রিপের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল ওরা। ভালভাবেই বিধ্বস্ত হয়েছে ডাকোটা। পোর্টউইং ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেছে, গোটা লেজটাও তাই। এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল লোপেজ, 'পাহাড় বেয়ে নামার দরকার নেই ঘুরে গেলে অনেক সহজ হবে।'

প্লেনের কাছে পৌঁছুতে অনেক সময় লেগে গেল। একটা মাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার অটুট পেল ওরা! কুঠারটা দিয়ে ফিউজিলাজের একটা অংশ সহ সেটাকে মুক্ত করল লোপেজ। গজ দিয়ে মেপে দেখা গেল মাত্র এক তৃতীয়াংশ অক্সিজেন রয়েছে। তাতেই সন্তুষ্ট লোপেজ, বলল, 'যথেষ্ট। রাতটা আমরা কেবিনেই কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু, ভাবছি, সন্ত্রাসবাদী গ্রুপটা যদি এসে পড়ে—কি হবে?'

'এসে পড়লে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব। সামনে কাজ আমাদের অনেক। একবারে একটা কাজের কথা ভাবব আমরা, সেটা শেষ হলে আরেকটা।'

'বেনোর কথা শুনে মনে হয়েছিল তার দল আশপাশেই কোথাও আছে। কিন্তু কই?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

দু'জনের পক্ষে সিলিন্ডারটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটা মাউথপীস এবং এক বোতল পেট্রল নিয়ে কেবিনে ফিরে গেল লোপেজ। প্রয়োজনীয় আর কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখছে রানা। খাদ্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, আশঙ্কা করছে ও। কিন্তু বেনোর সীট পকেটে এক বাক্স মিল্ক চকলেট ছাড়া কিছুই পেল না।

রবিন, জনসন এবং কোনালিকে নিয়ে ফিরে এল লোপেজ। সিলিন্ডারটাকে চারজন ধরাধরি করে নিয়ে যেতেও গলদঘর্ম হতে হলো ওদেরকে। একবারে বিশ গজের বেশি এগোতে পারা যাচ্ছে না। রবিন আন্দাজ করল, সান ক্রোসে সে একাই সিলিন্ডারটাকে মাথায় তুলে অনায়াসে এক মাইল পাড়ি দিতে পারত। এখানে চারজনের পক্ষেও তা সম্ভব হচ্ছে না। পেশী থেকে সব শক্তি শোষণ করে নিয়েছে উচ্চতা।

অক্সিজেন দেয়ায় মিসেস হফের কোন পরিবর্তন হলো না। কিন্তু সিনর বরগুয়িজের বেলায় একেবারে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। তাঁর মুখে রক্তিমাভা ফিরে এসেছে দেখে দুর্ঘটনার পর এই প্রথম হাসল বেনেদেতা। আগুনে কাঠ যোগাচ্ছে সোহানা, এবার সে তাকে সাহায্য করতে উঠল।

খুব বেশি হাঁপাচ্ছেন দেখে থুরথুরে বুড়ি মিস জুডিকেও অক্সিজেন দেয়ার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু কথাটা তাঁর কানে যেতেই অমায়িক হেসে তিনি বললেন, 'না, ভাই। যাদের বাঁচার আশা আছে, আর বেঁচে থাকা দরকার তাদের জন্যে রেখে দাও। আমি মরণের পথে পা বাড়িয়েই আছি···শুধু ভাবছি, এই বিপদে যদি তোমাদের কোন কাজে লেগে মরতে পারি···।'

কথাটা শুনে মুগ্ধ হলো রানা। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কথাটা ভেবে অদ্ভুত একটা শক্তি অনুভব করল ও নিজের মধ্যে।

পাথর দিয়ে ঘা মেরে কাঠগুলোকে ভেঙে ছোট করছিল গিলটি মিয়া, কোনালির হাতে কুঠারটা দেখে একগাল হাসল সে। 'মনে করে এনেচ তাহলে!'

দু'পাশে রানা আর লোপেজকে নিয়ে আগুনের ধারে বসে এয়ারচার্টের ভাঁজ খুলল রবিন। পেন্সিল দিয়ে একটা ক্রস চিহ্ন এঁকে বলল, 'কোর্স বদল করার সময় এখানে ছিলাম আমরা। এরপর ওয়ান এইট-ফোর-এর ট্রু কোর্সে পাঁচ মিনিটের অল্প কিছু বেশি সময় উড়েছি,' চার্টে একটা রেখা আঁকল সে। 'দুশো নটের কিছু বেশি স্পীডে উড়ছিলাম—ধরো ঘণ্টায় দুশো চল্লিশ মাইল স্পীডে। তারমানে, মোটামুটি বিশ মাইল মত এসেছি আমরা···এই এখানে।' চার্টে আরেকটা ক্রস চিহ্ন আঁকল রবিন।

'ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি এয়ার-স্ট্রিপটা নেই,' বলল রানা।

'পরিত্যক্ত, তাই নেই,' বলল লোপেজ। 'পাহাড় থেকে রাস্তাটা নেমে রিফাইনারীর দিকে চলে গেছে। সেটাও পরিত্যক্ত, তবে পাহাড়ীরা থাকতে পারে ওখানে।'

'কত দূর?' জানতে চাইল রানা।

'প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার।'

'পঁচিশ মাইল,' গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। 'এই পরিস্থিতিতে সোজা কথা নয়।'

'খুব কঠিন যে তাও নয়,' বলল লোপেজ। ম্যাপে একটা আঙুল রাখল সে। 'এই উপত্যকাটার পাঁচশো ফিট নিচে, এই এখানে পৌঁছুতে পারলে শ্বাসকষ্টে এতটা ভুগতে হবে না। ওখানে একটা নদী পাব। রাস্তা ধরে গেলে ষোলো কিলোমিটারের পথ।'

'আগামীকাল খুব ভোরে রওনা হব আমরা,' বলল রানা।

'মিসেস হফের কি হবে?' জানতে চাইল রবিন। 'তাকে নাড়াচাড়া করা কি উচিত হবে?'

'এত উঁচুতে বাঁচার কোন আশা নেই তার,' বলল রানা। 'যেভাবে হোক নিয়ে যাব। কেবিনের কপাট খুলে বা বাঁশ দিয়ে একটা স্ট্রেচার তৈরি করে নেয়া যাবে।'

'কিন্তু দুই পা হারিয়ে এই বয়সে বেঁচে থেকে ওর লাভ কি!' উন্মাদের মত মেঝেতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিল রবিনসন। 'বেনো রে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস তুই!'

বিষাদের ছায়া নেমে এল সবার চেহারায়।

রাতে কখন যেন অচেতন অবস্থায় মারা গেলেন মিসেস হফ। সকাল বেলা জানা গেল ব্যাপারটা, ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে লাশ। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিস জুডি। নিজেকে দায়ী করলেন তিনি, 'কি কুক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে থাকলে…'

ম্লান মুখে বলল লোপেজ, 'দুর্ভাগ্য, আমাদের কারও কিছু করার ছিল না।'

এ মৃত্যু প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তবু কঠিন হয়ে বাজল সবার বুকে। কয়েক মিনিটের সান্নিধ্যেই লক্ষ্য করেছিল সবাই আশ্চর্য এক সুখী পরিবার ছিল এই হফ দম্পতি। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও তারুণ্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ছিল তাঁদের চোখমুখ। রানার মনে হলো, নীচ, ঘৃণ্য এবং নির্দয়ভাবে তাড়িয়ে দেয়া হলো ওদেরকে দুনিয়া থেকে। এই ব্যবহার প্রাপ্য ছিল না ওদের।

রানা, রবিন, এবং মিলার—তিনজন মিলে অগভীর একটা কবর খুঁড়ল। মিলার এ কাজে হাত লাগাতে প্রথমে রাজী হয়নি, কিন্তু রবিনের ধমক খেয়ে বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসেছে। 'দেখে নেব!' এই হুমকিটা দিতে অবশ্য ভুল করেনি সে।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি কারও। সরোচ-এর আরও একটা প্রতিক্রিয়া এটা। সবাই একমত হলো তাড়াতাড়ি যথা সম্ভব নিচে নেমে যাওয়া দরকার।

এক বৃদ্ধা মারা যেতে আরেক বৃদ্ধা মিস জুডির উপর আরও বেশি মনোযোগ দিল ওরা সবাই—যে করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাকে।

রাতের মধ্যে সিনর বরগুয়িজের অবস্থা আবার খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। রবিনও অসুস্থ বোধ করছে। পাগল করে তুলছে তাকে মাথার ব্যথাটা। সবার চেয়ে বেশি হাঁপাচ্ছে সে। অক্সিজেন দরকার ওর।

অক্সিজেন সিলিন্ডারটা খালি দেখে বোকা বনে গেল রানা। লোপেজকে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে হিস হিস শব্দ পেয়েছিলাম, কাকে অক্সিজেন দিচ্ছিলে?'

দুই চোখে অবিশ্বাস নিয়ে গজের দিকে তাকিয়ে রইল লোপেজ। 'আমি? না তো! আজ সিনর বরগুয়িজের দরকার হবে ভেবে রেখে দিয়েছিলাম। শেষ হয়ে গেল কিভাবে?'

ঠোঁট কামড়ে একধারে একা বসা মিলারের দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'তাই তো বলি, ব্যাপার কি, হঠাৎ সকাল বেলাই অমন তাজা হয়ে উঠল কিভাবে ও!' মিলারের দিকে পা বাড়াল সে।

রবিনের একটা হাত ধরে তাকে থামাল রানা। 'কেউ যখন দেখিনি আমরা,

থাক।' সিলিন্ডারে একটা লাথি মারল ও। 'এটাকে অন্তত আর বইতে হবে না।'

মনে পড়ে যেতে চকলেটের বাক্সটা বের করল রানা। দশটা টুকরো, ভাগ করতে হবে এগারো জনের মধ্যে। রানা, রবিন এবং লোপেজ ত্যাগ স্বীকার করল। দুটো করে দেয়া হলো সিনর বরগুয়িজ এবং মিস জুডিকে, বাকি সবাই একটা করে পেল। রবিন লক্ষ্য করল, নিজের ভাগটা মুখে না পুরে সিনর বরগুয়িজের জন্যে রেখে দিল বেনেদেতা। ওদিকে গিলটি মিয়া নিজের ভাগের চকলেটটা অতি গোপনে বৃদ্ধা মিস জুডির গাউনের পকেটে ফেলে দিল। অনুরোধ করলে হয়তো নেবে না, কিন্তু নিজে যদি পকেটে আবিষ্কার করে তখন সেটা খেতে আপত্তি করবে না। সম্ভবত এই রকম কিছু ভেবেই কাজটা করল সে।

'ওকে সার্চ করলে আরও চকলেট বেরোবে,' দেয়ালের দিকে চেয়ে বলল মিলার। 'নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে নিজে খাবে বলে।'

প্রচুর গরম কাপড় পাওয়া গেল সুটকেসগুলোয়। দরকার মত বের করে নিয়ে বাকি সব রেখে দেয়া হলো। সাংঘাতিক মোটা একটা ওভারকোট দিল রবিনকে রানা। 'দুষ্প্রাপ্য ভিকুনা দিয়ে তৈরি, খুব দামী জিনিস,' বলল রানা। 'যতদিন বাঁচবে ব্যবহার করতে পারবে।'

'যদি জানতাম আজকের পুরো দিনটাও বেঁচে থাকছি!' ম্লান মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল রবিন।

লাগেজ রেখে যেতে হবে শুনে বেঁকে বসল মিলার। স্ট্রেচার বহন করার দায়িত্ব নিতেও রাজী হলো না সে। হুঁশিয়ার করে দিল তাকে লোপেজ, 'বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে, মিলার। সাবধান না হলে খারাবী আছে তোমার কপালে।'

'মুড়ি-মুড়কি একদর, এ আমি মানি না,' বলল মিলার। 'আমি একটা বিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান। চাকর-বাকরের মত ফরমাশ খাটার জন্যে অন্য লোক খুঁজতে হবে তোমাদের। আমাকে যা-তা লোক মনে করো না, বিপদটা কাটুক, তখন বোঝাব কত ধানে কত চাল...'

টেনে চড় মারতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু নিজের শক্তি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে ক্ষান্ত হলো সে। লোপেজ এগিয়ে আসছে দেখে পথরোধ করে দাঁড়াল রানা। 'বাদ দাও, লোপেজ। ওর গায়ে তোমার হাত পড়লে আরেকটা বোঝা বাড়বে—তাও তো সেই আমাদেরকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজের স্টীমে হাঁটছে, হাঁটুক না!'

জেদ ধরে বসল কোনালি। 'কিন্তু ভেবেছে কি ও? আমরা এখানে যারা রয়েছি, ওর চেয়ে কম কিসে?'

বাঁকা হেসে কোনালিকে বাধা দিল মিলার। 'তোমাদের সবাইকে পঞ্চাশবার করে কিনতে পারি আমি,' সগর্বে বলল সে। 'ব্যাঙ্কে আমার কত টাকা আছে জানো? সাড়ে চার মিলিয়ন ডলার!'

'সাড়ে চার মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আধখানা চকলেট চেয়ে দেখো,' বলল রানা, 'কেউ দেবে না তোমাকে। সব সময় টাকার দাম থাকে না, মিলার। এখানে আমরা সবাই সমান—সমান বিপদগ্রস্ত। অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

তুষার ধবল শৃঙ্গগুলোকে পিছনে রেখে নামছে ওরা। উঁচু নিচু রাস্তা, তাড়াহুড়োর সাথে পাহাড়ের গা কেটে কোনরকমে তৈরি করা হয়েছে। চুলের কাঁটার মত অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কয়েকটা বাঁক খানিক পর পর। ডিনামাইট বিস্ফোরণের স্বাক্ষর বহন করছে প্রতিটি বাঁক। চওড়ার দিকটা খুব কম, কোনরকমে একটা গাড়ি যেতে পারবে, তবে খানিক পর পর চওড়ায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে রাস্তাটা।

একজায়গায় চাকার দাগ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন। বলল, 'এদিকে গাড়ি এসেছিল—আমি জানতাম।'

'জানতে?' প্রশ্ন করল লোপেজ।

'এয়ার-স্ট্রিপ থেকে তুষার সরানো হয়েছে, লক্ষ্য করোনি?'

পালাবদল করে বইছে ওরা স্ট্রেচারটা। এক মাইলটাক নেমে বিশ্রামের জন্যে থামল ওরা পকেট থেকে হুইস্কি ভর্তি ফ্লাস্কটা বের করে লোপেজকে রাখতে দিল রবিন। 'সিনর বরগুয়িজের জন্যে দরকার হলে খরচ করো।' রবিন লক্ষ্য করল লোভাতুর দৃষ্টিতে ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে আছে মিলার।

আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। সবার আগে রানা। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকদের একটা খুদে দলের মত লাগছে ওদেরকে। রানার পাশে এক মিনিটের জন্যে একবার দেখা গেল সোহানাকে। দুর্ঘটনার পর থেকে পরস্পরের প্রতি মনোযাগ দেয়ার অবকাশ মেলেনি। নিচু স্বরে কিছু কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। রানার কি একটা কথায় ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল সোহানা। তারপর হাঁটার গতি মন্থর করে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করল। সবচেয়ে পিছনে রয়েছে গিলটি মিয়া এবং মিস জুডি। ছোট্ট দুটো শরীর পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে। হাঁপাচ্ছে বুড়ি, আর টুক টুক করে নানান কথা বলছে। তার চোখে দুনিয়ার সবাই ভাল মানুষ, দু'চারজন মন্দ লোক যারা আছে তারাও নাকি নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে একসময়। এবং তখন আর কোন সমস্যা থাকবে না, মানুষ শুধু মানুষের ভাল করার কথাই ভাববে তখন। পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বুড়িকে গিলটি মিয়া। যদিও বুড়ির জড়ানো উচ্চারণের ইংরেজি ধরতে গেলে কিছুই বুঝছে না সে।

ওদের সামনে রয়েছে লোপেজ, এবং তার ঠিক সামনেই মিলার।

বেনেদেতা স্ট্রেচারের সাথে হাঁটছে। তার পাশে চলে এল সোহানা। নিচু গলায় কিছু বলল ওকে বেনেদেতা। কথাটা শুনে সোহানা তাকাল রবিনের দিকে। বলল, 'সিনর রবিন, আপনি তো অসুস্থ, স্ট্রেচারটা বরং আর কাউকে…'

'কেউ সুস্থ নই আমরা,' বলল রবিন। 'ধন্যবাদ, সিনোরিটা—তেমন কষ্ট হচ্ছে না আমার।'

তৃতীয়বার বিশ্রাম নেবার পর সবার শ্বাস কষ্ট অনেক লাঘব হলো। চারবারের পর জ্ঞান ফিরে পেলেন সিনর বরগুয়িজ, নিঃশব্দে নিজের চারদিকটা দেখলেন। তাঁর জন্যে সবাই ভুগছে বুঝতে পেরে দুর্বল গলায় সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

স্ট্রেচার বইছিল রানা আর রবিন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। বাধ্য হয়ে থামতে হলো রবিনকেও।

'কি হলো, রানা?'

'লোপেজ…'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল রবিন। দেখল দৌড়ে এদিকে আসছে লোপেজ। তার হাতে পিস্তলটা দেখা যাচ্ছে। 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে,' বলল রবিন।

সামনে এসে দাঁড়াল লোপেজ। হাঁপাচ্ছে। 'সামনে অনেকগুলো কেবিন আছে—ভুলে গিয়েছিলাম আমি। আমার বিশ্বাস, বেনোর স্যাঙাতরা ওখানেই আছে…'

'হুঁ,' একটু চিন্তা করল রানা। 'পিস্তলটা দাও আমাকে…'

'আমাকে দাও,' প্রায় ছোঁ মেরে লোপেজের হাত থেকে পিস্তলটা নিল রবিন। 'আমি গিয়ে দেখি—আমার কাছ থেকে সিগন্যাল পেলে তবে তোমরা এগোবে।' রানার দিকে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'ঝুঁকিটা আমাকে নিতে দাও। আমি মারা গেলে, এমন কেউ নেই যার ক্ষতি হবে।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, হন হন করে এগোল।

সন্ত্রাসবাদীদের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল অনেকে। হঠাৎ প্রসঙ্গটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই হকচকিয়ে গেল ওরা। বিপদটা কল্পনায় চাক্ষুষ করতে পারছে সবাই। সন্ত্রাসবাদীরা নিশ্চয়ই সশস্ত্র, অনুমান করা যায়, সংখ্যার দিক থেকেও বেশি হবে তারা। বেনোর কথা অনুযায়ী প্লেনের সমস্ত আরোহীকে হত্যা করাই তাদের উদ্দেশ্য। অসহায়ভাবে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এইখানেই কি তবে জীবনের ইতি?

'সিনর,' মেয়েলী একটা কণ্ঠস্বর পিছু ডাকল রবিনকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'সাবধানে, প্লীজ!' মৃদু গলায় বলল বেনেদেতা। 'তোমার ধারণা সঠিক নয়। তুমি মারা গেলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল রবিন তিন সেকেন্ড। কোন উত্তর দিতে পারল না। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে এগোল আবার।

রাস্তায় কোথাও শেলটার নেবার জায়গা নেই দেখে ভীত সন্ত্রস্ত দলটাকে দ্রুত পিছিয়ে নিয়ে এল রানা। এক গাদা বোল্ডারের পিছনে গা ঢাকা দিল সবাই। ইতিমধ্যে সামনের বাঁকে পৌছে গেছে রবিন। সবার দায়িত্ব লোপেজের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে সেই দিকে ছুটল রানা।

পায়ের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরল রবিন। রানাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কাছে পৌছে রানা বলল, 'লোপেজ বলছে, এই কেবিনগুলোয় মাইনাররা থাকত। এর চেয়ে ওপরে স্থায়ীভাবে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বেনোর লোকজনরা সত্যি যদি এসে থাকে, এখানেই আছে তারা।'

উঁকি মেরে কেবিনগুলো দেখল ওরা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'রাস্তা ছেড়ে ঘুর পথে এগোব আমরা।'

পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে বেশ খানিকটা উঠে কেবিনগুলোর পিছন দিকে চলে এল ওরা।

'ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না,' বলল রবিন। 'তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নেমে যাচ্ছি আমি। এখান থেকে কাউকে যদি

দেখতে পাও, প্রয়োজন হলে ডাইভার্ট করতে পারবে তুমি।'

'কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'পাথর ছুঁড়ব?'

নিঃশব্দে হাসল রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে। দুই মিনিট পর কেবিনগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল।

এক এক করে প্রত্যেকটি কেবিনের ফুটোয় চোখ রেখে দেখে নিল রবিন। সব খালি। চিৎকার করে ডাকল সে রানাকে।

প্রচুর খাবার পাওয়া গেল কেবিনগুলোয়। তিনটে কেবিনে গরম বিছানা এবং কেরোসিন-চালিত হিটার রয়েছে। কেবিনগুলোর সামনে গাড়ির চাকার দাগ কারও দৃষ্টি এড়াল না।

'অবাক কাণ্ড!' বলল লোপেজ। 'এগুলো পরিত্যক্ত কেবিন। এখানে লোকজন আসার কথা নয়। কিন্তু চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে দু'একদিনের ভেতরই মানুষ এসেছে। অথচ কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাদেরকে। ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার যাই হোক, ভরপেট খেয়ে রাতটা এখানেই কাটাব আমরা,' বলল রানা। 'রাতে বাইরে থাকলে বরফ হয়ে যাব সবাই।'

একটা কেবিন থেকে উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে এল কোনালি। তার হাতে টিনের একটা মগ। কাছে এসে বলল, 'কয়েকটা প্লেটে আধ-খাওয়া খাবার পেয়েছি। এই মগটায় কফি ছিল, জমে বরফ হয়ে গেছে।'

'দেখি,' কোনালির হাত থেকে মগটা নিল লোপেজ। বরফ পরীক্ষা করে বলল, 'এই বরফের বয়স দু'দিনের বেশি নয়। চলে যাবার সময় হিটার অফ করলেও কেবিনটা আরও কিছু সময় গরম ছিল...'

'ধরো, গতকাল সকালে কফি খেয়েছে ওরা।'

রবিন বলল, 'সে সময় আমরা সান ক্রোস থেকে টেক অফ করছি।'

'ব্যাপারটা সত্যিই দুর্বোধ্য,' বলল রানা। 'খেটেপিটে প্রস্তুতি নিল, তারপর কি এমন ঘটল যে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে যেতে হলো ওদেরকে?'

কেউ জবাব দিতে পারল না।

ঠিক হলো, পালা করে সারারাত পাহারা দেবে ওরা প্রেশার স্টোভ জেলে গরম সুপ তৈরি করতে বসেছে বেনেদেতা আর সোহানা। কোনালি টিনজাত খাবার বাছাই করছে। জনসন চালু করছে হিটারগুলো।

'দূর ছাই!' চেঁচিয়ে উঠল কোনালি। 'এই, স্প্যানিশ ভাষাবিদ কে আছ এখানে? কোন্ টিনে কি আছে বুঝব কিভাবে?'

'ব্রেনটা একটু খাটাও, ডক্টর ফিটফাট,' খোঁচা মারার সুযোগটা হাত ছাড়া করল না সোহানা। 'লেবেলে ছাপা ছবিগুলো কি বলছে?'

হাসতে হাসতে রানার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল লোপেজ পাহারা দেবার জন্যে ভাল একটা জায়গা বাছতে। খানিক পর রানা একা ফিরে এসে বলল, 'সোজা মাইল দুই রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা জায়গা পাওয়া গেছে। প্রথম দু'ঘণ্টা পাহারা দেবে লোপেজ।'

সকলের খাওয়া শেষ হতে বেনেদেতা সিনর বরগুয়িজকে খাওয়াতে বসল, লোপেজের খাবার নিয়ে বেরিয়ে গেল সোহানা।

'তুমি একজন ইতিহাসবেত্তা,' কোনালিকে বলল রবিন, 'এদিকে সম্ভবত ইনকাদের···প্রাচীন পেরুর রাজরাজড়াদের সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে এসেছিলে?'

'মোটেও না,' দ্রুত মাথা নেড়ে বলল কোনালি। 'ইনকাদের সম্পর্কে আমার একবিন্দু আগ্রহ নেই। আমি মধ্যযুগের ইতিহাস পড়াই। এদিকে স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি।'

'তুমি কি পড়াও ডক্টর জনসন?'

'আমি একজন পদার্থবিদ,' সহাস্যে বলল টেকো জনসন। 'হাই অলটিচ্যুড কসমিক রে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।'

যত্নের সাথে বিছানা করে দিয়েছে গিলটি মিয়া, তাতে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন মিস জুডি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইল রবিন। 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, মিস জুডি?'

'পানামায়,' বললেন বৃদ্ধা। 'আমার প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারক করার জন্যে।'

'তার মানে আপনার একটা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল রবিন। 'এই বয়সে···।'

'এগারোটা দেশে কাজ করছি আমরা। সিনর বরগুয়িজ রাজী হলে বারো নম্বর শাখা খুলব আমরা সেন্ট্রাল কর্ডিলেরায়। মানুষের দুঃখে সহানুভূতির সাথে একটু হাসলেও সেবা করা হয়, ভাই। বয়সটা কোন বাধা নয়।'

'যদি পুনর্বাসিত হতে পারি, কৃতজ্ঞচিত্তে আপনার সেবা গ্রহণ করব আমরা।' মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন সিনর বরগুয়িজ।

'এই কেবিনগুলো এখানে এল কোত্থেকে?' জানতে চাইল কোনালি।

'ওপরে খনি আছে, দেখেছ তো? ওই খনির শ্রমিকদের লিভিং কোয়ার্টার ছিল এগুলো। ওদের ওয়ার্কশপও ছিল এখানে। দামী আর ভারী মেশিনারী সরিয়ে নিয়ে গেছে সব, সস্তা আর অপ্রয়োজনীয় যা কিছু, ফেলে গেছে।'

কেবিনের দেয়ালে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং দেখে জনসন বলল, 'বিদ্যুৎ কোত্থেকে পেত?'

'নিশ্চয়ই নিজেদের প্ল্যান্ট ছিল ওদের,' বলল রবিন। তারপর গিলটি মিয়ার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কিসের ব্যবসা করো তুমি, গিলটি মিয়া?'

'বুদ্ধির।'

'বুদ্ধির ব্যবসা? সে কেমন?'

'রানা ইনভেস্টিগেশনের ঢাকা ব্রাঞ্চের চীফ আমি।'

চট করে রানার দিকে তাকাল রবিন।

তিক্ত একটু হাসল রানা।

'কিন্তু এই সংকটে একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের কিছুই করার নেই,' বলল ও।

'সবার খবরই তো নিলে, তোমার খবর কি শোনাও দেখি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তোমার মত দক্ষ পাইলট খুব বেশি নেই। এত থাকতে অখ্যাত এক দেশের ততধিক অখ্যাত এয়ারলাইন্সে পড়ে আছ কেন?'

নিমেষে চেহারাটা কালো হয়ে গেল রবিনের। কিন্তু দ্রুত সামলে নিল নিজেকে ও। বলল, 'আমার উচ্চাশা নেই, তেমন আপনজনও কেউ নেই। চুপচাপ এক কোণে পড়ে ছিলাম, এই আর কি। ভাগ্যে তাও সইল না। একটা প্লেন ধ্বংস করার পর কার চাকরি থাকে, বলো?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'কি যেন চেপে যাচ্ছ।'

বেনেদেতা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে, বুঝতে পেরে সেদিকে তাকাল না রবিন। রানার সামনে একটা হাত পেতে বলল, 'এসব কথা থাক। থাকলে একটা চুরুট দাও।'

হাভানা চুরুটের প্যাকেটটা ঠেলে দিল রানা। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখল, সোহানা ঢুকেছে কেবিনে। 'কি খবর?'

'ভাল। রাস্তায় এখন পর্যন্ত কাউকে দেখেনি লোপেজ।'

'গিলটি মিয়াকে দেখছি না যে?'

'ওপাশের কেবিনে,' বলল সোহানা। 'নামাজ পড়ছে।'

ঠিক সেই সময় দরজায় দেখা গেল মিলারকে। বলল, 'শুধু নামাজ পড়লে কথা ছিল। মোনাজাতের জন্য সেই যে আধঘণ্টা আগে হাত তুলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, তার আর থামার লক্ষণ নেই। ঘুমটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার। নামাজ পড়ার আর সময় পায়নি...।'

'না না, মানুষের ধর্ম কর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করতে নেই, ভাই,' চঞ্চল হয়ে উঠলেন মিস জুডি।

লোপেজকে রেহাই দেবার জন্যে এক সময় বেরিয়ে গেল জনসন। কেবিনে ফিরে এসে সরাসরি সিনর বরগুয়িজের কাছে গিয়ে বসল লোপেজ। উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বৃদ্ধ বললেন, 'সবাইকে ডাকো, আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

চোখ ইশারায় রানা আর রবিনকে ডাকল লোপেজ। সিনর বরগুয়িজের বিছানার কিনারায় গিয়ে বসল ওরা।

'প্রশ্নটা একসময় উঠবেই,' বললেন অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা। 'তাই এখনই এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত তোমাদের। আমি সন্ত্রাসবাদীদের কথা বলছি। তাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা আমাদের কথা ভুলে গেছে। আমার বিশ্বাস, তাদের মুখোমুখি আমাদেরকে হতেই হবে। তখন কি করবে তোমরা আমার জানা দরকার। তোমরা সবাই বিদেশী..., তাদের একমাত্র শত্রু আমি—আমাকে যদি তাদের হাতে তুলে দাও, তোমরা সবাই হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারো। তোমরা কি ভাবছ এ বিষয়ে?'

'আপনাকে পেলেই আমাদেরকে রেহাই দেবে, এ-কথা ভাবছেন কেন?' বলল রানা।

'তোমরা তাদের সাথে দর কষাকষির একটা সুযোগ হয়তো পেতেও পারো,' সিনর বরগুয়িজ বললেন, 'পাশের কেবিনে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত নাও। তোমরা কি করবে তা আমার জানা দরকার। নিজের নিরাপত্তার দিকটা আমাকেও তো ভেবে দেখতে হবে।'

'চলো তাহলে,' ব্যস্ততার সাথে উঠে দাঁড়াল মিলার, এগোল দরজার দিকে।

কিন্তু রানা এবং রবিন নড়ল না।

'বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার আগে একটা প্রশ্ন আছে আমার,' বলল রানা। 'সন্ত্রাসবাদীরা এত ঝামেলা স্বীকার করতে গেল কেন? স্যামেয়ার বোয়িং বা ডাকোটায় একটা টাইম বোমা রেখে দিলেই তো তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হত।'

মৃদু হেসে বৃদ্ধ বললেন, 'দুটো কারণে সহজ পথটা বেছে নেয়নি ওরা। এক, এর আগে পাঁচবার আমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বোমার ওপর আস্থা নেই আর। দুই, আমাকে ওরা গোপনে খুন করতে চায়। জানাজানি হয়ে গেলে দেশবাসী বিদ্রোহ করবে, এই ভয় রয়েছে ওদের।'

'গোপন রাখতে চাইলে আমাদের সবাইকে খুন করতে হবে, তাই না?' বলল রানা। 'তার মানে এটা একা আপনার সংকট নয়, আমরা সবাই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।'

'কিন্তু কখন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বলা তো যায় না,' বৃদ্ধ বললেন, 'যদি দর কষাকষির সুযোগ পাও একটা?'

'ঠিক! তখন আমরা কি করব? চলো, পাশের কেবিনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলি।' দরজার কাছ থেকে বলল মিলার।

'এ বিষয়ে আলোচনার আর কিছু আছে বলে মনে করি না,' বলল রানা। 'আলোচনা যদি করতেই হয় যথাসময়ে তা করা যাবে। আমাদের সাথে তাদের দেখা নাও হতে পারে। যদি হয়, তখন ভেবে দেখা যাবে।'

'কৌশলে প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দিচ্ছ তুমি,' সিনর বরগুয়িজ বললেন। 'বেশ! কিন্তু, দেখো, এ প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হবে।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল রানা। বলল, 'নিচের দিকে না নেমে ডাকোটার পাশে থাকতে পারলে ভাল হত। আমাদের খোঁজে উদ্ধারকারী প্লেন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু এখন ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

'ওখানে থাকলে আরও দু'একজন মারা যেত এরই মধ্যে,' বলল লোপেজ।

'ওখানে থাকলেও লাভ হত না কিছু,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'প্লেনটা এমন জায়গায় পড়েছে, আকাশ থেকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আর উদ্ধারকারী প্লেন—আসবে বলে মনে হয় না।'

ঝট্ করে রবিনের দিকে ফিরল রানা। 'তার মানে?'

'এই ফ্লাইটের কোন নাম্বার ছিল না,' বলল রবিন। 'সান্তিলানা কন্ট্রোল টাওয়ার জানেই না আমরা সেখানে যাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু তোমার ফ্লাইট ম্যানেজার ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে না?'

'সান্তিলানায় পৌঁছে ফোন করতে বলেছিল আমাকে। আমার ফোন না পেয়ে রাগ হবে তার, কিন্তু দুশ্চিন্তা হবে না। এর আগেও অনেকবার ফোন করিনি আমি, কিন্তু কোনবারই সে নিজে থেকে খবর নেয়নি। অন্তত তিন চার দিন অপেক্ষা করবে সে।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। বলল, 'তার মানে সত্যিই হারিয়ে গেছি আমরা!'

*

এ রাতেও ভাল ঘুম হলো না রবিনের। পাহারায় রয়েছে মিলার, ঘড়ি দেখে এবার তাকে রেহাই দেবার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে বিছানা ছাড়ল সে। লেদার জ্যাকেটের উপর রানার উপহার দেয়া ওভারকোটটা চাপিয়ে নিয়ে কেবিন থেকে বেরোতে যাবে, পিছন থেকে রানা বলল, 'মিলারের সাথে লেগো না। কিছু বললে চুপ করে থেকো।'

'ঠিক আছে,' বলে বেরিয়ে এল রবিন। মোড়ে পৌঁছে রাস্তা থেকে নেমে পাথরের উঁচু স্তূপটার দিকে এগোচ্ছে।

স্তূপটার কাছেপিঠে কোথাও নেই মিলার।

মৃদু গলায় ডাকল রবিন, 'মিলার!'

সাড়া নেই।

সন্তর্পণে পাথরের উঁচু স্তূপটার গা ঘেঁষে চক্কর মারতে শুরু করল রবিন। স্তূপের মাথার উপর বেঢপ কি যেন পড়ে রয়েছে, পিছনে রাতের কালো আকাশ, জিনিসটা কি তা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। স্তূপটার গা বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। মাথায় উঠে অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ পেল, মিলারের নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। রবিনের পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে টং করে বাড়ি খেল পাথরের গায়ে একটা বোতল, ভেঙে গেল সেটা। মদ খেয়েছে মিলার। চার হাত-পা ছড়িয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

'ইউ ব্লাডি ফুল!' বিড়বিড় করে বলল রবিন, হাঁটু মুড়ে বসল মিলারের পাশে; তার গালে চাপড় মারতে শুরু করল। কিন্তু অবস্থা যাকে তাই, গোঙাচ্ছে কিন্তু হুঁশ ফিরছে না। এই খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে ঠাণ্ডায় নির্ঘাত মারা যাবে লোকটা। মরুক ব্যাটা, ভাবল রবিন। কিন্তু জেনেশুনে কাউকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া যে তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাও জানা আছে তার। অথচ চর্বির ডিপোটাকে কাঁধে তুলে এখান থেকে যাওয়া সম্ভব নয় তার একার পক্ষে।

নিচে, পাহাড়ের দিকে তাকাল রবিন। সব অনড়। অগত্যা স্তূপ থেকে নিচে নেমে রাস্তার দিকে এগোল ও।

জেগে আছে রানা। ঘরে রবিনকে ঢুকতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কি ব্যাপার, রবিন?' হঠাৎ উদ্বিগ্ন হলো ও। বিছানায় উঠে বসল।

'জ্ঞান হারিয়েছে মিলার।'

'ড্যাম দিস অলটিচ্যুড,' বলে জুতোয় পা গলাতে শুরু করল রানা।

'অলটিচ্যুডের দোষ নয়,' বলল রবিন, 'মদ গিলেছে।'

মুখ তুলল রানা। 'পেল কোথায়? লোপেজের কাছ থেকে তোমার ফ্লাস্কটা চুরি...'

'না। সিনর বরগুয়িজের লাগবে না ভেবে লোপেজ সেটা ফেরত দিয়েছে আমাকে। চুরি যায়নি, আমার পকেটেই রয়েছে। ঘরগুলোর কোন একটাতে ছিল বোধ হয়, সেখান থেকে পেয়েছে ব্যাটা।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো।'

কাজটা কঠিন। প্রকাণ্ড মাংসল শরীর মিলারের, তার ওজনটাই বিরাট সমস্যা।

অনেক কায়দা-কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসল তাকে ওরা, একটা বাঙ্কে শুইয়ে দিল।

হাঁপাচ্ছে রানা। বলল, 'সতর্ক নজর না রাখলে আমাদের সবার মৃত্যু ডেকে আনবে এই লোক।' একটু থেমে বলল, 'চলো, তোমার সাথে আমিও যাই, দু'জোড়া চোখে বিপদ আঁচ করতে সুবিধে হবে।'

ফিরে এসে পাথরের স্তূপ বেয়ে মাথায় চড়ে বসল ওরা। পাশাপাশি শুয়ে পড়ল দু'জন। পনেরো মিনিট চুপচাপ কাটল। অন্ধকার পাহাড়গুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিন্তু কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। 'সব বোধহয় ঠিকঠাক আছে,' একসময় বলল রানা। শক্ত পাথরের সাথে চেপে থাকা হাড়গুলোকে রেহাই দেবার জন্যে শুয়ে থাকার ভঙ্গি বদলাল ও। বলল, 'বুড়ো ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'ভাল,' মনে যে শব্দটা প্রথম এল সেটাই উচ্চারণ করল রবিন।

'বড় বেশি ভাল,' বলল রানা। 'সেখানেই বিপদ। দুনিয়ার এই দিকটায় উদার রাজনীতিকদের ঠাঁই পাওয়া কঠিন। তাকে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তুলে দেয়া হবে কি হবে না এই প্রশ্নে যে লোক ভোট চায়, তাকে কি বলব?'

'আমার পরম শত্রুকেও সন্ত্রাসবাদীর হাতে তুলে দিতে রাজী নই আমি,' বলল রবিন। ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারে রানার মুখ দেখতে চেষ্টা করল সে। 'বললে প্লেন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে—ফ্লাইংক্লাবের মেম্বার ছিলে বুঝি?'

'না,' বলল রানা। 'পাকিস্তান আমলে স্যাবর জেট চালাবার স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছিলাম রিসালপুর বেসে।'

'আচ্ছা!' বিস্ময় এবং প্রশংসার সুরে বলল রবিন।

কয়েক মিনিট পর বলল রানা, 'তুমি থাকো, আমি ফিরে গিয়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করি।'

চলে গেল রানা। অন্ধকারে একা হতেই রবিনের মন জুড়ে বসল বেনেদেতা। লোপেজের পিস্তল নিয়ে কেবিনগুলো খালি কিনা দেখতে আসার সময় আর কেউ তো সাবধান হতে অনুরোধ করেনি ওকে। ছোট্ট একটা ঘটনা, এ থেকে হয়তো কিছুই প্রমাণিত হয় না, কিন্তু মেয়েটার সুন্দর, রুচিশীল, ভদ্র এবং কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আরেকটা ছোট্ট ঘটনা দৃষ্টি এড়ায়নি রবিনের। স্ট্রেচার বইছিল সে, খুব কষ্ট হচ্ছিল তার, তাও নজর এড়ায়নি বেনেদেতার। সম্ভবত সঙ্কোচবশত সরাসরি তাকে কিছু বলতে পারেনি, সোহানাকে দিয়ে বলিয়েছিল।

যথেষ্ট হয়েছে, এসব চিন্তা বের করে দাও মাথা থেকে—শাসন করল নিজেকে রবিন। কিন্তু চোখ দুটো হুহু করে জ্বালা করছে, ঝাপসা হয়ে আসছে সামনেটা। তিন বছরের ফুটফুটে একটা শিশুর নিষ্পাপ মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে, আইসক্রীমে ভেজা দুই হাত দিয়ে ওর গাল ধরে চুমু খাচ্ছে চিবুকে। উন্মাদের মত মাথাটা ঝাঁকাল রবিন। অদ্ভুত একটা জেদের সাথে পকেট থেকে ফ্লাস্কটা বের করে মুখের সামনে তুলে ধরল ও। আহ্, শান্তি!

ছেলেটার কথা মনে পড়লেই তার গোটা অস্তিত্ব জুড়ে একটা হাহাকার জেগে ওঠে, তাকে ভুলে থাকার জন্যে মদ খেয়ে নেশা করার একটা ঝোঁক মাথা চাড়া

দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে উঠল অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। রলি—দাঁতে দাঁত চাপল রবিন—বিশ্বাসঘাতিনী!

ধনী পরিবারের আলট্রা-মডার্ন টাইপের মেয়ে ছিল রলি, তার সাথে যোগ হয়েছিল অপূর্ব সৌন্দর্য। নামকরা সোসাইটি গার্ল হিসেবে তার ভক্ত ছিল অগুনতি। ভাল লাগত রলিকে, চুপিচুপি প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে—কিন্তু জানত রলিকে পাবার ভাগ্য তার হয়তো কোনদিনই হবে না। তালিকায় তার চেয়ে অনেক উপযুক্ত এবং সম্ভাবনাময় প্রার্থী ছিল। তার স্থান ছিল সম্ভবত ষোলো থেকে পঁচিশের মধ্যে কোথাও। বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে, অকস্মাৎ। রবিনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রলি, যেখানেই যাক রবিন পাশে না থাকলে চলে না। বাতাসে ভেসে তীব্র আনন্দ-ঘন দুটো মাস কেটে গেল। আরও ঘনিষ্ঠভাবে, একেবারে স্থায়ীভাবে পেতে চাইল রলি রবিনকে, কথা তুলল বিয়ের। জানাল, 'তোমার সন্তান আসছে।' সাংঘাতিক অস্থির চিত্ত রলি, আবার যদি মত বদলায়, এই ভেবে সাথে সাথে রাজী হয়ে গেল রবিন, এবং দু'দিন পরই বিয়েটা হয়ে গেল ওদের।

বিয়ের পাঁচ মাস পর ওদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। এবং সেই থেকে শুরু হলো ভয়ঙ্কর অশান্তি। বিয়ের আগে যেমন ছিল রলি, আবার সেই রকম হয়ে উঠল সে। ছেলে-বন্ধুদের নিয়েই সময় কাটে তার। সব পার্টিতে যাবেই সে, রবিনের আপত্তি গায়ে মাখে না। রাতে বাড়িও ফেরে না সে মাঝে মধ্যে। অশান্তির আরও বড় কারণ হয়ে দেখা দিল তার বেহিসেবী খরচ। রবিন যা বেতন পায় তার সবটুকু খরচ হয়ে যায় রলির নতুন নতুন পোশাক, প্রসাধনী এবং সেন্ট কিনতেই। হাত খালি রবিনের, এই অবস্থায় প্রেজেন্টেশন দাবি করে রলি, হীরের আঙটি চায়, পার্টি দেবে বলে নগদ টাকা দাবি করে। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না রবিনের। কিন্তু রলিকে এসব কথা বলা বৃথা। টাকা না পেয়ে রেগে যায় সে, যা তা বলে অপমান করে রবিনকে।

সব মুখ বুজে সহ্য করে রবিন। ছেলেটাকে নিয়ে দুঃখ ভুলতে চায় সে। অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাটার পিছনেই সবটুকু সময় কাটায় সে। বাবা এবং আড়াই বছরের ছেলের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রবিনকে দেখলে হয় একবার—নরম, কচি কচি হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দৌড়ে আসে, হেসে ওঠে খল খল করে।

ক্রমশ স্বামী এবং সন্তানের কাছ থেকে দূরে সরে গেল রলি। রবিন দেখতে পায় বিয়ের আগে রলির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রার্থী ছিল যে ধনী যুবক, সেই উইলসনের সাথে ইদানীং বেশি মাখামাখি করছে রলি। দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। জানে, বলে লাভ নেই। নিজের ভুল একদিন হয়তো বুঝতে পারবে রলি, সেদিন আবার ঘর সংসার, স্বামী সন্তানের দিকে মন দেবে⋯এই আশায় অপেক্ষা করে আছে সে।

কিন্তু ঠিক উল্টোটা ঘটল। উইলসনের সাথে এক বিছানায় আপত্তিকর ভঙ্গিতে একদিন আবিষ্কার করল রলিকে রবিন। ধরা পড়ে গিয়ে ভয় বা লজ্জা তো পেলই না, উল্টে বেপরোয়া ভঙ্গিতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল সে।

পরদিন নিজেই প্রসঙ্গটা তুলল রলি। বলল, 'আমার মত মেয়েকে সুখী করা তোমার কর্ম নয়। এ আমি জানতাম। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করেছিলাম উইলসনকে

খেপিয়ে তোলার জন্যে। আমার স্বামী হবার যোগ্যতা একমাত্র ওরই আছে। ভুল বোঝাবুঝি যা ছিল আমাদের মধ্যে, তা দূর হয়ে গেছে। তোমাকে আমি ডিভোর্স করতে যাচ্ছি, তারপর বিয়ে করছি উইলসনকে।'

চুপচাপ শুনে গেল রবিন। অনেকক্ষণ পর শুধু বলল, 'বেশ।'

'আজই আমি জিমকে নিয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রলি, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

'কি বললে?' রুখে উঠল রবিন। 'জিমকে নিয়ে যাচ্ছ মানে? অসম্ভব! আমার ছেলে আমার কাছেই থাকবে।'

'কে বলল তোমার ছেলে?' শয়তানী মাখা হাসির সাথে বলল রলি। 'চেহারার মিল দেখেও বুঝতে পারো না জিম কার ছেলে?' খিলখিল করে হেসে উঠল রলি। 'উইলসন...'

মাথাটা বন করে ঘুরে গেল রবিনের। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল ও, 'তোমার দাবি মিথ্যেও হতে পারে। তাছাড়া, মিথ্যে হোক আর সত্যি হোক, বাপের স্নেহ দিয়ে এতদিন ভালবেসেছি ওকে আমি, আমাকে ছাড়া আর কাউকে চেনেও না ও—ও আমার কাছেই থাকবে।'

'একটা কেলেঙ্কারি হোক, তাই চাও?' ক্রূর হেসে বলল রলি। 'কোর্টে গিয়ে দাবি করতে পারো জিমকে, কিন্তু বিচারক উইলসন আর জিমের চেহারা দেখে এবং আমার দাবি শুনে কি রায় দেবে মনে করো তুমি?'

জিমকে হারাতে হবে ভেবে পাগলের মত হয়ে উঠল রবিন, শেষ পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করল। কিন্তু রলি কান দিল না তার কথায়। হাত-পা ছুঁড়ে জিম 'ড্যাডি' 'ড্যাডি' করে চেঁচাচ্ছে—যেতে চায় না সে—জোর করে তাকে নিয়ে চলে গেল রলি।

পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল রবিন। হাত লেগে নোংরা হয়ে ওঠা পাসপোর্ট সাইজের ফটোটা বের করে জিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। নাহ্, ভালবাসবে না ও; দুনিয়ার কাউকে—কিছুকে না।

সকালবেলা যাত্রা শুরুর তোড়জোড় দেখে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বললেন, 'এক শর্তে আমি হাঁটব আজ। যদি আমাকে দৌড়ুতে বলা না হয়।'

কথাটা শোনা মাত্র তার সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া বাধিয়ে দিল বেনেদেতা। বলল, 'কক্ষনো না! এখনও তুমি পরোপুরি সুস্থ নও...'

'আমি বিদ্রোহ করছি!' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এসে গেল সিনর বরুগুয়িজের চেহারায়।

'কার বিরুদ্ধে?' ফিক করে হেসে উঠল বেনেদেতা।

সিনর বরগুয়িজ গম্ভীর। বললেন, 'তা প্রকাশ করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাই না।'

হেসে উঠল উপস্থিত সবাই।

চাকা-ওয়ালা স্ট্রেচারের উপর চাপানো হলো টিন-জাত খাবার, কাপড়চোপড়,

ফুয়েল, প্রেসার স্টোভ। সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে রবিন আর রানা। ওভারকোটগুলোর পকেট ফুলে আছে সবার। যার পকেটে যে ক'টা ধরেছে ভরে নিয়েছে ক্যান।

মনে মনে একটা হিসেব করে অনুমান করল রানা, গতকাল ওরা চার পাঁচ মাইলের বেশি এগোতে পারেনি। কোন কারণে যদি দেরি হয়ে না যায় এখন প্রতিদিন দশ মাইল এগোতে পারে ওরা। তার মানে রিফাইনারীতে পৌঁছুতে আরও দু'দিন লাগবে। সাথে চারদিনের খাবার আছে। সুতরাং মিস জুডি এবং সিনর বরগুয়িজের জন্যে ওদের চলার গতি যদি মন্থর হয়েও পড়ে, চিন্তার কিছু নেই তেমন।

ওদের চারদিকের পরিবেশে এক-আধটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ঘাসের খুদে একটা চাপড়া চোখে পড়ল। আর একটু পর একটা নীল বুনো ফুল। ফুলটা যখন ছিঁড়ছে বেনেদেতা, সবাই ধরে নিল মাথার চুলে পরবে বোধহয়। কিন্তু তা সে পরল না। আধঘণ্টা পর হঠাৎ রবিনের বাটনহোলে সেই ফুলটাকে আবিষ্কার করে মিস জুডিকে চাপা স্বরে গিলটি মিয়া বলল, 'কুন্ দিকের পানি কুন্ দিকে গড়ায় বলা যায় না, তবে বুজতে পারচি, ছুঁড়ির কলজেটা মচকে গ্যাচে।'

একগাল হাসলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'দু'জনকে কিন্তু মানাবে ভাল।'

ক্রমশ নিচে নামছে ওরা। শ্বাস-প্রশ্বাস আগের চেয়ে সহজ হয়ে গেছে, দ্রুত হাঁটতে পারছে সবাই। অসংখ্য বাঁকের আরেকটার সামনে চলে এসেছে ওরা। মোড় ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ল লোপেজ, হাত তুলে অনেক দূরের কিছু একটা দেখাল রানাকে। সেদিকে তাকিয়ে চিকণ সুতোর মত একটা রূপালী রেখা দেখল রানা, ঝিলিক মারছে। 'নদী না?'

'হ্যাঁ,' বলল লোপেজ। 'নদী পেরিয়ে উত্তর দিকে এগোব আমরা। ব্রিজ থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে রিফাইনারী।'

'সী-লেভেল থেকে কত ওপরে ওটা?' জানতে চাইল রবিন।

'তিন হাজার পাঁচশো মিটারের মত।'

বারো হাজার ফিট, ভাবল রবিন। এখানের চেয়ে কিছু বেশি অক্সিজেন পাওয়া যাবে ওখানে।

'আধবেলায় পাঁচ মাইলের কিছু বেশি এগিয়েছি আমরা,' একটা চুরুট ধরিয়ে বলল রানা। 'ভালই বলতে হবে।'

'খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার তোমাদের,' পিছন থেকে বলল সোহানা। 'ব্রিজ পেরিয়ে থামো কোথাও, এক ঘণ্টার মধ্যে গরম খাবার পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রবিন।

চুরুটে ঘন ঘন ক'টা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সেটা লোপেজের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতার সাথে বলল লোপেজ। চুরুটটা নিয়ে আয়েশ করে টানতে শুরু করল। চুরুটের বাক্স খালি হয়ে এসেছে, তাই একটা ধরিয়ে তিনজন ভাগাভাগি করে ধূমপান করছে। ওদিকে কোনালির টোবাকোও প্রায় শেষ, সে-ও যখন পাইপ ধরাচ্ছে জনসনকে একভাগ দিতে ভুল করছে না। মিলারকেও

অফার করা হয়েছিল পাইপ, ঘৃণা প্রকাশ করেছে সে।

'রিফাইনারীতে লোকজন থাকলেই হয় এখন,' বলল রানা।

'স্থানীয় পাহাড়ীদের দেখা হয়তো পাওয়া যাবে,' বলল লোপেজ। 'কেউ না থাকলেও চিন্তা করি না। রিফাইনারী থেকে দশ মাইল দূরেই গ্রাম আছে একটা। দরকার হলে আমরা কেউ সাহায্য আনতে যেতে পারব।'

এগোচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ওরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করল উপত্যকায়। এদিকে তুষার নেই। পাথুরে মাটির উপর ঘাসের আচ্ছাদন। রাস্তাটা মোচড় খায়নি ঘন ঘন, বাঁকের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। ছোট ছোট অনেক পুকুর পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ওরা। ঠাণ্ডার প্রকোপ কমেছে। এখন আর হাঁপাচ্ছে না রবিন। যাক, ভাবল সে, এ যাত্রা বাঁচা গেল!

একটু পরই একটানা একটা গর্জন শুনতে পেল ওরা। ওদের পিছনের চূড়া আর মাঠ থেকে দুদ্দাড় বেগে নেমে আসা বরফ গলা পানি খাদের নিচ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ভারী, ভরাট আওয়াজটা তারই। সবাই আত্মহারা হয়ে উঠল আনন্দে। একটা পাখি দেখে এতই আন্দোলিত হলেন মিস জুডি যে তাঁর দু'চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করায় তিনি বললেন, 'এ আমার আনন্দের কান্না, ভাই।'

গত দু'দিনে এই প্রথম একটা জীবিত, সচল প্রাণী দেখছে ওরা। 'আমার বয়স দশ বছর কমে গেল রে, বেনেদেতা,' সিনর বরগুয়িজকে বলতে শুনল রানা। এমন কি, এই প্রথম, খুশির ঝিলিক লক্ষ্য করল ও মিলারের কুঁতকুঁতে দুই চোখেও।

পাশে হঠাৎ বেনেদেতাকে দেখল রবিন। 'প্রেশার স্টোভটা কোথায় রেখেছ? একটু পরই দরকার হবে ওটা আমাদের।'

পিছন দিকে ইঙ্গিত করল রবিন, যেখানে কোনালি আর জনসন স্ট্রেচারটা বইছে। বলল, 'ওদেরকে বললেই খুঁজে বের করে দেবে।'

নদীর কাছে চলে এসেছে ওরা। রবিন অনুমান করল, আরেকটা বাঁক নিলেই ব্রিজটা বোধহয় দেখতে পাওয়া যাবে। 'পা চালিয়ে এসো,' চুপিচুপি বলল বেনেদেতা, 'সবার আগে নদীর কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমরা।'

দ্রুত হাঁটছে বেনেদেতা, যেন উড়ে যেতে চাইছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তার পাশে চলে এলে রবিন। মোড়টা ঘুরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রথম নজরেই চোখে পড়ল গভীর খাদের নিচে নদী, উপরের ব্রিজটা ঝুলে পড়েছে, ওপারে দাঁড়িয়ে আছে যানবাহন এবং লোকজন।

নদীর একটানা ডাক ছাপিয়ে শোনা গেল তীক্ষ্ণ, কিন্তু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। এদেরকে দেখতে পেয়ে ওপারে ওরা কেউ কেউ দৌড়াচ্ছে। একজন লোককে ছুটে একটা ট্রাকের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল রবিন। ট্রাক থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, ইতিমধ্যে গুলি করার ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলে নিয়েছে রাইফেলটাকে। লক্ষ্যস্থির করছে। কয়েকটা পিস্তলের শব্দ ঢুকল রবিনের কানে।

দু'হাত দিয়ে বেনেদেতার পিঠে ধাক্কা মারল রবিন, ঠিক তখনই গর্জে উঠল রাইফেলটা। ছিটকে পড়ে যাচ্ছে বেনেদেতা। তার ওভারকোটের পকেট থেকে

ইঁদুরের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা ক্যান, গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে। বেনেদেতাকে ধাক্কা মেরেই ডাইভ দিয়ে পড়েছে রবিন, তার কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। বেনেদেতার পাশে গিয়ে পড়ল সে। ওদের সামনে এখন পাথরের উঁচু স্তূপ। ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল রবিন। আবার শব্দ হলো রাইফেলের। গড়াচ্ছে একটা ক্যান রাস্তার উপর, হঠাৎ সেটা ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল। আবার সেটা রাস্তায় নামার আগেই টকটকে লাল তরল টমেটো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল রবিন। বুলেট ফুটো করে দিয়ে গেছে ক্যানটাকে।

চার

রাস্তার পাশে শুয়ে আছে ওরা। 'লেগেছে কোথাও?' গলাটা কেঁপে গেল রবিনের। মাথার উপর দিয়ে একের পর এক এলোপাতাড়ি ছুটে যাচ্ছে রাইফেলের বুলেট।

'না,' বলল বেনেদেতা। রবিনের দিকে তাকিয়ে অভয় দিল, 'ক্রল করে বাঁকের পিছনে ফিরে যেতে পারব আমরা।'

ক্রল করে ফেরার সময় দেখতে পাচ্ছে রবিন, রাস্তা থেকে গ্র্যানাইট পাথরের ছাল তুলে নিচ্ছে বুলেটগুলো। ওদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে রানা। পাশে লোপেজ, তার হাতে পিস্তল। বেনেদেতাকে দেখে এক পা এগোল সে, কিন্তু বাধা দিল রানা।

'থামো, ব্যস্ত হয়ো না,' বলল ও। রবিনের একটা কনুই চেপে ধরল। 'কি দেখলে ওখানে?'

কাঁপুনিটা কোনরকমে থামাতে পেরেছে রবিন। বলল, 'ভাল করে দেখার সময় পাইনি। ব্রিজটা ভেঙে গেছে বলে মনে হলো—মাঝখানটা ঝুলে পড়েছে। ওপারে কয়েকটা ট্রাক দেখেছি। সংখ্যায় ওরা অনেক···'

তীক্ষ্ণ চোখে সামনেটা জরিপ করে নিল রানা। 'রাস্তার দু'দিকেই কাভার দেবার মত প্রচুর পাথর রয়েছে, গা ঢাকা দিয়ে উঁকি মারা যেতে পারে—এসো।'

গভীর খাদের অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে খরস্রোতা নদী। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমেছে খানিকটা, তারপর হঠাৎ ঝপ্ করে খাড়া নেমে গেছে খাদটা। খাড়াভাবে যেখানে নামতে শুরু করেছে ঠিক সেইখানে রয়েছে ব্রিজটা।

নদীর ওপারে পিঁপড়ের মত চলাফেরা করছে লোকজন। বিশ-বাইশজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা। ট্রাক থেকে মোটা কাঠের প্ল্যাঙ্ক নামানো হচ্ছে। দু'জন লোক কুণ্ডলী থেকে তুলে মাপ মত দড়ি কাটতে ব্যস্ত। তিনজন লোককে দেখে মনে হচ্ছে পাহারা দেবার বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে তারা। হাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকগুলোর দিকে পিছন ফিরে, সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখছে খাদের এপারের কিনারা। তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন রাস্তার উপর কিছু দেখেছে মনে করে দুম্ করে গুলি করে বসল একটা।

'নার্ভাস ফিল করছে ওরা, তাই না?' বলল রানা। 'ভূতুড়ে ছায়াকে মানুষ বলে মনে করছে।'

আরও নিচে দৃষ্টি ফেলল রানা, খাদটাকে পরীক্ষা করছে ও। পানির উপর কোথাও একটা পাথরও মাথা তুলে নেই দেখে বোঝা যাচ্ছে নদীটা গভীর। উদ্দাম গতিতে নাচছে যেন পানি, তীরবেগে ছুটছে—এ নদীতে সাঁতরানো অসম্ভব। পানিতে নামলেই হ্যাঁচকা টান মেরে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে এক নিমেষে বহু দূর। আরও সমস্যা রয়েছে, দৃষ্টি এড়াল না রানার। খাদের খাড়া শরীর বেয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছুতে হলে দড়ি ধরে ঝুলে নামতে হবে। ওপারে পৌঁছে উঠতেও হবে সেভাবে। গুলি খাবার কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল।

সাঁতরে নদী পেরোবার সম্ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে ব্রিজের দিকে খেয়াল দিল সে। সেতুটা প্রাচীন যুগের একটা নমুনা, সন্দেহ নেই। খাদের দু'দিকের দুটো বিশাল পাথরের সাথে বাঁধা দুটো মোটা দড়ির উপর ঝুলছে সেটা। দুই সমান্তরাল দড়ির মাঝখানের ফাঁকটা আড়াআড়িভাবে দড়ির টুকরো দিয়ে ভরাট করা হয়েছে, এগুলোর উপর গায়ে গা ঠেকিয়ে ফেলা হয়েছে কাঠের মোটা প্ল্যাঙ্ক। কিন্তু ব্রিজের মাঝখানে এখন একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো প্ল্যাঙ্ক নেই সেখানে। ছিঁড়ে ঝুলে পড়া দড়িগুলো দুলছে বাতাসে। নিচে, ভাটির দিকে একটা ট্রাক নদীর কিনারায় উল্টে রয়েছে। আবার ব্রিজের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ট্রাকটা যেভাবে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে এপার থেকে ওপারে যাবার সময় পড়ে গেছে তাই না?'

'তাই,' বলল লোপেজ। 'যতদূর বুঝতে পারছি, দু'একজন লোক কেবিন-গুলোয় গিয়েছিল প্রাথমিক আয়োজন শেষ করার জন্যে—যাতে প্রধান দলটা ওখানে পৌঁছে কোনরকম অসুবিধের মধ্যে না পড়ে। আয়োজন শেষ করে আবার ফিরে আসে তারা ব্রিজ পেরোবার জন্যে—কিন্তু কেন? এর উত্তর দেয়া কঠিন। যাই হোক, ব্রিজ পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় তারা। ইতিমধ্যে ব্রিজের ও-প্রান্তে এসে পৌঁছায় প্রধান দলটা, কিন্তু ব্রিজ ভেঙে গেছে দেখে...'

'সময়টা ওরা বসে কাটায়নি,' বলল রানা। 'ট্রাক পাঠিয়ে প্ল্যাঙ্ক আনিয়েছে, শুরু করে দিয়েছে ব্রিজ মেরামতের কাজ।'

ক্রল করে দোদুল্যমান ব্রিজের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক, তাদের সামনে একটা কাঠের প্ল্যাঙ্ক, সেটাকে হাত দিয়ে ঠেলে এগিয়ে আসছে ব্রিজের ফাঁকটার কাছে।

চুপচাপ লোক দু'জনের তৎপরতা লক্ষ্য করছে ওরা তিনজন। রিস্ট ওয়াচ দেখল রানা। একটা প্ল্যাঙ্ক লাগাতে আধঘণ্টা সময় লাগল। 'আর ক'টা লাগাতে হবে?' জানতে চাইল ও।

'প্রায় ত্রিশটা,' বলল লোপেজ।

'তার মানে এপারে আসতে আরও পনেরো ঘণ্টা লাগবে ওদের,' বলল রবিন।

'তার চেয়ে বেশি,' বলল রানা। 'রাতে ওরা এই সার্কাস দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

পিস্তল বের করল লোপেজ। বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর ঠেক দিয়ে ব্রিজের

দিকে লক্ষ্য স্থির করছে। 'উঁহুঁ,' বলল রানা, 'কোন লাভ নেই। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে না।'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

'ক'টা বুলেট আছে তোমার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

'দুই ম্যাগাজিনে সাত দু'গুণে চোদ্দটা ছিল, তিনটে ছুঁড়েছি।'

'এখন একটা ছুঁড়লে দশটা থাকবে। বেশি নয়।'

কিন্তু পিস্তলটা তবু পকেটে ভরল না লোপেজ।

'কিছু যদি মনে না করো, পিছিয়ে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'তুমি গুলি করলেই আবার শুরু করবে ওরা।'

একটু একটু করে পিছিয়ে এসে চিৎ হয়ে শুলো রানা, আকাশের দিকে তাকাল। তারপর রবিনের দিকে ফিরে চোখ ইশারায় পাশে আসতে ইঙ্গিত করল তাকে। 'নিজেদের মধ্যে এবার আলোচনা হওয়া দরকার,' বলল ও। 'দুটো সম্ভাব্য রাস্তা দেখা যাচ্ছে—আত্মসমর্পণ, না হয় যুদ্ধ। তবে অন্য কোনভাবে দুটোকেই এড়িয়ে যাবার উপায় হয়তো থাকতে পারে—সাথে তোমার এয়ার চার্টটা আছে?'

পকেট থেকে চার্টটা বের করল রবিন, বলল, 'নদী পেরোবার কোন আশা নেই—এখানে অন্তত নয়।'

চার্টটা মেলে ধরল রানা। আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এই হলো নদী—এবং এখানে আমরা রয়েছি। ব্রিজটা নেই এতে। নদীর পাশে এই রেখাটার অর্থ?'

'খাদ।'

'গড!' নিরাশ সুরে বলল রানা। 'পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে শুরু হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। উজানের দিকে এগিয়ে পেরোব, সে উপায় নেই। ভাটির দিকের অবস্থা কি?'

দূরত্বের মোটামুটি একটা হিসাব কষে বলল রবিন, 'ওদিকে প্রায় আশি মাইল লম্বা খাদটা, তবে এই যে এখানে একটা ব্রিজের চিহ্ন রয়েছে—ধরো পঞ্চাশ মাইল দূরে।'

'পাহাড়ী এলাকায় পঞ্চাশ মাইল কঠিন দূরত্ব,' বলল রানা। 'সিনর বরগুয়িজ এতটা পথ পেরোতে পারবেন বলে মনে করি না। ওরা আমাদেরকে ফাঁদে আটকে রেখেছে। এখন হয় যুদ্ধ অথবা আত্মসমর্পণ।'

'একদল সন্ত্রাসবাদীর কাছে আত্মসমর্পণ? আমি অন্তত রাজী নই!'

কানের কাছে পিস্তল গর্জে উঠল, সাথে সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল—প্রতিটি শব্দ দু'বার করে শোনা যাচ্ছে পিছনের উঁচু মাটির সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসায়। কাছে কোথাও লেগে একটা বুলেট বাঁক খেয়ে রবিনের মাথার ঠিক উপর দিয়ে উড়ে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছে উঠে এল লোপেজ। 'লাগাতে পারিনি,' বলল সে। 'তবে ঘাবড়ে দিয়েছি। পানিতে একটা প্ল্যাঙ্ক ফেলে দিয়ে ব্রিজ ছেড়ে ভেগেছে ওরা।'

'ভেরি গুড,' বলল রবিন। 'এভাবে হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারব ওদেরকে...'

'কতক্ষণ?' প্রশ্ন করল রানা, 'দশটা বুলেট দিয়ে ক'দিন পারবে ওদেরকে ব্রিজ

থেকে সরিয়ে রাখতে? চলো সকলের মতামত চেয়ে দেখা যাক। তুমি এখানেই থাকো লোপেজ। তবে অন্য কোথাও থেকে নজর রাখো ওদের ওপর—এই জায়গাটা হয়তো চিনে ফেলেছে ওরা।'

রাস্তায় অপেক্ষারত দলটার কাছে ফিরে আসছে ওরা। কাছাকাছি এসে নিচু গলায় বলল রবিন, 'দেখে মনে হচ্ছে সবাই মুষড়ে পড়েছে, চাঙা করে তোলার জন্যে…'

'প্রকৃত অবস্থা জানা দরকার ওদের,' বলল রানা।

দলটার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল রানা। আকাশের দিকে মুখ তুলে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে মিলার, আপন মনে বিড় বিড় করছে সে। স্তব্ধ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস জুডি, বিস্ময়ের ধাক্কায় একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। একটা পাথরে বসে উত্তেজিতভাবে দ্রুত পা দোলাচ্ছে জনসন। দলটা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে জরুরী ভঙ্গিতে কথা বলছেন সিনর বরগুয়িজ, গালে হাত দিয়ে শুনছে বেনেদেতা। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা আর গিলটি মিয়া। প্রায় নির্বিকার দেখাচ্ছে গিলটি মিয়াকে। সোহানার দুই ভুরুর মাঝখানে চিন্তার একটা ভাঁজ পড়েছে। একেবারে প্রশান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন একজনই, সে হলো কোনালি। তামাকহীন পাইপে টান মারছে সে, অলস ভঙ্গিতে একটা সরু কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি আঁকছে মাটিতে।

সিনর বরগুয়িজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। 'আপনার কথা মত,' বলল সে, 'কি করা হবে ঠিক করতে যাচ্ছি আমরা।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন সিনর বরগুয়িজ। বললেন, 'জানতাম প্রসঙ্গটা ফিরে আসবে।'

বেনেদেতার দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, যা হবার তা তো হবেই। মন খারাপ করে না থেকে সবার জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা করো না!'

'করছি,' বলল বেনেদেতা।

ঘুরে দাঁড়াল রবিন, ফিরে আসছে রানার কাছে। রানা এদিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে সবাইকে সত্যিকার অবস্থাটা। সবশেষে বলল ও, 'এই হলো পরিস্থিতি। পিছনে দেয়াল, সামনে নদী এবং শত্রু, ডানদিকে কোন ব্রিজ নেই, বাঁ দিকে যাও বা একটা আছে সেটা পঞ্চাশ মাইল দূরে—সুতরাং থাকা না থাকা সমান কথা। অর্থাৎ ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে এবং বুদ্ধি খাটালে সব সমস্যার সমাধান হয়, এ কথাও আমাদের জানা আছে। যাই হোক, এখন দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাদেরকে, আত্মসমর্পণ, না প্রতিরোধ? আমি প্রতিরোধ করব ঠিক করেছি, আমার বিশ্বাস রবিনও তাই করবে, ঠিক কিনা, রবিন?'

'একশো বার!'

'প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করব আমি।' বলল রানা। 'তুমি কি করবে, ডক্টর জনসন?'

পা দোলানো থামিয়ে মুখ তুলল জনসন, ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে তার মুখের

চেহারা, বলল, 'যুদ্ধ আমি ভালবাসি না। আবার কেউ আমাকে অকারণে মারতে চাইলে চুপ করে থাকব, তাও নয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমরা কি ওদের বিরুদ্ধে জিততে পারব? মনে হয় না। যাই হোক, এখুনি ভোট দিচ্ছি না আমি। সংখ্যায় তোমরা যে দল ভারী হবে আমি সেই দলে আছি।'

'মিলার?'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না এর সাথে আমাদের সম্পর্কটা কোথায়?' ফেটে পড়ল মিলার। 'একজন অভিশপ্ত দেশের নিধিরাম সর্দারের জন্যে নিজের প্রাণটা বিপন্ন করতে যাব এমন বোকা আমি নই। আমার সোজা কথা, ওকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিজেদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করব।'

'মিস জুডি?'

প্রথমবার শুনতেই পেলেন না মিস জুডি। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল রানা, তারপর মৃদু স্বরে সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল তাঁকে, চাইল মতামত জানতে।

'দিন আমার শেষ হয়ে এসেছে একথা ঠিক,' চিন্তাভাবনা করে বললেন বৃদ্ধা, 'কিন্তু তাই বলে অন্যায়ভাবে কেউ আমাকে খুন করবে, তাতে আমি রাজী নই। যতক্ষণ পারি, যতটা পারি লড়ব আমি।'

'তুমি কি করবে, কোনালি?' প্রশ্ন করল রানা।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে কোনালি উঠে দাঁড়াল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো বুক ভরে দম নিচ্ছে দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দেবে বলে। 'এ ধরনের পরিস্থিতির আমি একজন বিশেষজ্ঞ,' ওভারকোট থেকে ঘাসের একটা পাতা টোকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল সে, 'ইতিহাস থেকে এমন সব অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি আমি...'

'ডক্টর ফিটফাট, উত্তরটা একটু সংক্ষেপ করলে হয় না?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোনালি। 'সিনর বরগুয়িজকে পেলে ওরা খুন করবে। তা করুক, তাতে মিলারের তেমন কিছুই এসে যায় না। কিন্তু তারপর? বুড়ো ভদ্রলোককে খুন করেই কি থামবে ওরা? না। সিনরকে যদি খুন করে, আমাদেরকেও খুন করতে বাধ্য হবে। তা নাহলে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে। ওরা তা চাইবে না। তার মানে? তার মানে সিনর বরগুয়িজের জন্যে নয়, আমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ফাইট করব।'

'তুমি কি যুদ্ধ করার পক্ষে কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বিস্মিত ভাবে বলল কোনালি। 'এতক্ষণ ধরে বকর বকর করছি, তার কিছুই কানে ঢোকেনি তোমার? অবশ্যই যুদ্ধ করব আমি।'

'গড, এরা সবাই পাগল হয়ে গেছে!' দু'হাতে মুখ ঢাকল মিলার।

'তুমি?' সোহানার দিকে তাকাল রানা।

একটু অপ্রতিভ দেখাল সোহানাকে। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে, স্বাধীনভাবে তা প্রকাশ করো।'

'আমি তোমার সাথে,' সংক্ষেপে বলল সোহানা।

'গিলটি মিয়া?'

রাগ রাগ ভাব গিলটি মিয়ার চেহারায়। ইংরেজিতে বলল সে, 'নো।' একটু থেমে বলল, 'ইয়েস।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'আমি লড়ব না, স্যার।'

'তবে কি তুমি ওদের হাতে ধরা দেবে?' অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল রানা।

'তা বলেচি আমি?' নিজের চারদিকে তাকাল সে। 'পাথর ছাড়া আর তো কিছু দেখচি না। ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে কিছু কাজ হবে? তারচে লড়াই না করে চুপচাপ মরব—নিচ্চিন্ত। একটা পেস্তল দিয়ে কিছুই হবে না। গাচও নেই যে ডাল কেটে গুলতি বানাব।'

নিজের জায়গায় বসে মাটিতে আবার কাঠি দিয়ে আঁচড় কাটছে কোনালি, গিলটি মিয়ার কথা শুনে কেন যেন চমকে উঠে ঝট্ করে তাকাল সে।

'কিভাবে লড়ব তা পরে স্থির করব আমরা,' বলল রানা।

'হাতিয়ার পেলে লড়িয়েদের সাতে আচি,' বলল গিলটি মিয়া।

'জনসন?'

'লড়ব।'

'মত বদলাবে, মিলার?' জানতে চাইল রানা।

'সত্যিই কি ওরা আমাদেরকেও খুন করবে?'

'করবে,' বলল কোনালি।

মোটা শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করছে মিলার, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'ফ্যাসাদেই পড়লাম দেখছি!'

'হ্যাঁ অথবা না?'

'অগত্যা হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে সামনে ঠেলে দেবে ওদের গুলির মুখে, তা হবে না।'

'তবু ভাল,' বলল রানা। 'খেতে বসে আমরা সিনর বরগুয়িজের সাথে আলোচনা করব কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।'

রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছে বেনেদেতা, তাকে সাহায্য করছেন সিনর বরগুয়িজ আর সোহানা। লোপেজ কি করছে দেখার জন্যে নদীর দিকে ফিরে যাচ্ছে রানা। পিছন ফিরে একবার তাকাল ও। দেখল কোনালি এখনও মাটিতে দাগ কাটছে কাঠি দিয়ে, আর বকবক করে কি যেন বোঝাচ্ছে জনসনকে। কাছে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে গিলটি মিয়া। জনসনকেও কৌতূহলী দেখাচ্ছে।

নজর রাখার জন্যে আরও ভাল একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে লোপেজ। প্রথমে তাকে দেখতেই পেল না রানা। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা বুট জুতো বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পেল ও। মাথা নিচু করে সাবধানে এগিয়ে তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'কি খবর?'

খুশি দেখাচ্ছে লোপেজকে! 'গর্ত থেকে তারপর আর মুখ বের করেনি ওরা,' বলল সে। 'পুরো এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। না লাগলেও একটা বুলেট কমপক্ষে একটি ঘন্টা অচল করে রেখেছে ওদেরকে।'

'মন্দ নয়,' বলল রানা। 'দশটা বুলেট দশ ঘণ্টা সময় নষ্ট করবে ওদের। ত্রিশটা প্ল্যাঙ্ক লাগাতে আরও পনেরো ঘণ্টা। রাতে যদি কাজ করতে না পারে—ব্রিজের এপারে আসতে পুরো দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে।'

'কিন্তু আমাদের বুলেট যখন শেষ হয়ে যাবে, ব্রিজটা যখন মেরামত হয়ে যাবে—ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না তখন। এপারে এসে ম্যাসাকার করবে ওরা। যুদ্ধ নয়, একটা হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে।'

'এর মধ্যেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে হবে,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা।

রানার আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে বিস্মিত হলো লোপেজ। 'কিন্তু কিভাবে?'

'কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে,' বলল রানা। নদীর ওপারে তাকাল ও। 'গুলি খাবার ভয় আছে জানার পর ব্রিজের দিকে পা বাড়াতে হলে সাহসী লোকের দরকার। এরা খুব সাহসী, তা আমি বিশ্বাস করি না। ভীতি থেকেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম। বলা যায় না, একটা বুলেট এক ঘণ্টার বেশি সময়ও দিতে পারে আমাদেরকে।'

'এখান থেকে নড়ছি না আমি,' বলল লোপেজ। 'আমার জন্যে কাউকে দিয়ে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়ো।'

ফিরে এসে নদীর ওপারে কি ঘটছে রবিনকে বলল রানা। গম্ভীর হলো রবিন, বলল, 'দুটো দিন—এই দু'দিনের মধ্যে আত্মরক্ষার একটা উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কি উপায়?'

'সে বিষয়েই আলোচনা করা দরকার এখন।'

খোঁচা খোঁচা, কর্কশ চেহারার ঘাসের উপর গোল হয়ে বসল ওরা সবাই। ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে খাবার পরিবেশন করছে সোহানা আর বেনেদেতা। খাওয়া শেষ হতেই শুরু করল রানা, 'এটা একটা ওয়র কাউন্সিল, সুতরাং ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করবে না কেউ, প্লীজ। এবার শুরু করা যাক, যে-কেউ যেকোন সাজেশন দিতে পারো।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়ল না, কথা বলল না। তারপর মিস জুডি বলল, 'প্রধান সমস্যা ব্রিজটার মেরামত বন্ধ করা—সে ব্যাপারে এদিক থেকে আমরা কিছু করতে পারি না? ধরো, দড়ি যদি কেটে দিই?'

'সুন্দর পরামর্শ,' বলল রবিন। 'কারও আপত্তি আছে?'

'আছে,' বলল রানা। 'এদিক থেকে ব্রিজের কাছে পৌঁছুতে হলে খোলা জায়গা দিয়ে হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। অন্তত একশো গজের মধ্যে কোথাও কোন কাভার নেই। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে শরীর। ব্রিজে পৌঁছুতে হলে রাস্তাটা ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

'রাতের অন্ধকারে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করল জনসন।

'তাই তো!' উৎসাহী হয়ে উঠল রবিন।

'ওপারে ওরা যারা রয়েছে তাদেরকে বোকা মনে করা উচিত হবে না,' বলল রানা। 'দুটো ট্রাক এবং চারটে জীপ রয়েছে ওদের, পিছনে হয়তো আরও আছে। প্রতিটি গাড়ির দুটো করে হেডলাইট আছে, ভুলে যেয়ো না। রাতে ওরা সেগুলো জ্বেলে আলো করে রাখবে ব্রিজটা।'

আবার সবাই চুপ করে গেল।

খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল কোনালি। সবাই তাকাল তার দিকে। একটু ইতস্তত করে বলল সে, 'মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে আমি একজন বিশেষজ্ঞ, তোমরা এর বেশি কিছু জানো না। আসলে আমি মধ্যযুগের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে একজন স্পেশ্যালিস্ট। বর্তমান পরিস্থিতিটাকে আমি এভাবে দেখছি: জলাধার দিয়ে ঘেরা একটা দুর্গে আটকা পড়েছি আমরা, তুলে নেয়া যায় এমন একটা সেতু রয়েছে পানির ওপর, সেতুটা এখন তোলা অবস্থায় রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের শত্রুরা সেটাকে পানির উপর ফেলতে চায়। আমাদের কাজ হলো ওদেরকে বাধা দেয়া।'

'সবাই তা জানি আমরা,' বলল রবিন। 'কিভাবে ঠেকানো যায় ওদেরকে, সেটাই হলো প্রশ্ন।'

'মধ্যযুগীয় অস্ত্রের ওপর এমনিতে খুব বেশি আস্থা নেই আমার,' বলল কোনালি। পরিষ্কার চেহারা এবং পরিচ্ছন্ন পোশাকে তাকে একজন খাঁটি প্রফেসর বলেই মনে হচ্ছে সবার, যেন ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে লেকচার দিচ্ছে, কিন্তু ভঙ্গিটা বিনীত। 'স্বীকার করি মানুষ খুন করার ব্যাপারে সে-যুগের লোকেরা আজকের মত নিপুণতা অর্জন করেনি, কিন্তু তবু, পরস্পরকে তারা খুন করতে পারত বেশ সন্তোষজনক হারেই। আমরা জানি, লোপেজের পিস্তল অত দূরের লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না। তাই এমন একটা মিসাইল টাইপের অস্ত্র দরকার আমাদের, যেটা দূরত্ব যাই হোক না কেন, লক্ষ্য ভেদে যেন অব্যর্থ হয়।'

'তাহলে এসো রবিনহুডের মত আমরা সবাই তীরন্দাজ হয়ে উঠি!' মাটিতে পা ঠুকে রাগ সামলাল মিলার।

'আরে না,' বলল কোনালি, 'তীর-ধনুক দিয়ে কাজ হবে না। একজন শিক্ষানবিসের হাতে লং বো দিয়ে কিছুই তুমি আশা করতে পারো না। ভাল তীরন্দাজ হতে হলে কমপক্ষে পাঁচ বছরের ট্রেনিং নিতে হয়। অত সময় আমরা পাব না।'

স্তব্ধ দুপুর কেঁপে উঠল পিস্তলের আওয়াজে। সাথে সাথে খাদের ওপার থেকে ভেসে এল অনেকগুলো রাইফেলের শব্দ। মাথা নিচু করে দ্রুত একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল মিলার। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর দ্বিতীয়বার গুলি করল লোপেজ। ওদের হাতে এখন আর মাত্র নয়টা বুলেট।

'মিলার বেরিয়ে এসো,' বলল রানা। 'এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাইফেলের গুলি বাঁক নেয় না। কি বলতে চাও বলো, ডক্টর ফিটফাট।'

'ক্রস বো ধরনের একটা অস্ত্রের কথা ভাবছিলাম,' বলল কোনালি, 'যে রাইফেল চালাতে জানে তার পক্ষে ক্রস বো চালানো কঠিন হবে না। ক্রস বো-র কার্যকরী রেঞ্জ একশো গজেরও বেশি।' রানার দিকে ফিরে হাসল সে। 'শুয়ে থাকা অবস্থায়ও ব্যবহার করা যায় ওটা।'

এক নিমেষে ধারণাটা ভাল লেগে গেল রানার। একশো গজ রেঞ্জ হলে ব্রিজ, ব্রিজের ওপারে রাস্তা, যেখানে ওটা উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে খাদের কিনারা ধরে এগিয়ে গেছে এবং যেখানে যানবাহনগুলো রয়েছে—সব কাভার দেয়া যাবে। 'কিন্তু

ভেদ করে যাবার শক্তি কতটুকু হবে একটা ক্রস বো-র?'

'তির্যকভাবে না লেগে যদি সোজাসুজি লাগে,' বলল কোনালি, 'একটা ঢাল ভেদ করতে পারবে অনায়াসে।'

'পেট্রল ট্যাঙ্ক?'

'অনায়াসে।'

'আমরা বোধহয় ধোকার মত আশাবাদী হয়ে উঠছি,' বলল রানা। 'যন্ত্রপাতি কোথায়? কি দিয়ে তৈরি হবে ক্রস বো?'

'আমি মেকানিক বা ইঞ্জিনিয়ার নই,' বলল কোনালি। 'তবে জনসনকে সব কথা জানিয়েছি, তার ধারণা সম্পদ আমাদের সীমিত হওয়া সত্ত্বেও একটা ক্রস বো আমরা তৈরি করতে পারব।'

সবাই তাকাল জনসনের দিকে।

'ক্যাম্পে একটা ওয়ার্কশপ আছে,' বলল জনসন। 'প্রচুর লোহা-লক্কড় পাওয়া যাবে ওখানে। ছোটখাট এবং বাতিল মনে করে মাইনাররা ফেলে রেখে গেছে ওগুলো। কিছু ফ্ল্যাট স্প্রিং, নানা সাইজের স্টীল রড, এই সব দেখেছি আমরা—তীর বানাতে লাগবে ওগুলো।'

'তীর নয়,' তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিল কোনালি, 'বোল্ট, অথবা কোয়ারেল বলতে পারো।'

'যন্ত্রপাতি কিছু আছে?' বলল রানা। 'লোহা কাটবে কি দিয়ে?'

'হ্যাক-স ব্লেড, ফাইল, হ্যান্ড-পাওয়ারড গ্রাইন্ডস্টোন মেশিন—এই সব দেখেছি,' বলল জনসন। 'মোটকথা, যা আছে তা দিয়েই কোনালির ডিজাইন অনুযায়ী একটা ক্রস বো এবং প্রচুর তীর...'

'বোল্ট,' বলল কোনালি।

'...প্রচুর বোল্ট বানাতে পারব আমি।'

'একশো গজ দূরের টার্গেটকে ভেদ করবে এমন একটা অস্ত্র এত সহজে পেয়ে যাব আমরা,' বলল রানা, 'বিশ্বাস করতে ভয় লাগছে। তুমি শিওর তো, কোনালি?'

'মোর দ্যান শিওর,' সহাস্যে বলল কোনালি। 'নিজের যুগে এই ক্রস বো হাজার হাজার লোককে খুন করেছে, আরও কয়েকজনকে খুন করতে না পারার কোন কারণ তো দেখি না। জনসন বলছে সে তৈরি করতে পারবে এবং ওর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখি আমি।' ধুলোর উপর কয়েকটা রেখা এবং দাগ দেখাল সে। 'ব্লু প্রিন্টটা এঁকে রেখেছি ওখানে।'

'বেশ,' বলল রানা। 'চেষ্টা করে দেখো। এখুনি লেগে পড়ো কাজে। দেরি না করে রওনা হয়ে যাও, সন্ধ্যার মধ্যে উঠে যেতে পারবে ক্যাম্পে। সাথে তুমিও যাও, মিলার—আরেক জোড়া হাতের সাহায্য পাবে জনসন।'

'এক মিনিট,' এই প্রথম কথা বলছেন সিনর বরগুয়িজ, 'দড়ি আর কাঠ দিয়ে তৈরি ব্রিজটা—তোমরা কেউ আগুন ব্যবহার করার কথা ভেবেছ কি?'

'ইন্টারেস্টিং আইডিয়া,' বলল রানা। 'কিন্তু আগুন ধরাবার জন্যে ব্রিজের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই লাইনে চিন্তা করো সবাই, একটা উপায় বেরিয়ে যেতে পারে। তোমরা রওনা হয়ে যাও, কোনালি।'

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে ক্যাম্পের দীর্ঘ পথে রওনা হয়ে গেল তিনজনের দলটা। সানন্দেই ওদের সাথে গেল মিলার, ব্রিজের এত কাছাকাছি থাকার কোন ইচ্ছাই ছিল না তার।

'রাতের জন্যে ক্যাম্প তৈরি করা দরকার,' বলল রানা। 'এদিকে পানি নেই, তাছাড়া শত্রুদের এত কাছে থাকা উচিত নয় আমাদের মেইন ফোর্সের।'

'আধমাইল পিছনে একটা পুকুর আছে,' বলল রবিন। 'ওখানে ক্যাম্প ফেলা যেতে পারে।'

'বেনেদেতা, সোহানাকে সাথে নিয়ে দেখো এ ব্যাপারে কি করা যায়,' বললেন সিনর বরগুয়িজ। দুই যুবতীকে চলে যেতে দেখছেন তিনি। তারপর রানার দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে বললেন, 'একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই আমরা, লোপেজেরও থাকা দরকার। চলো, ওদিকে যাই।'

সুঠামদেহী, কম কথার মানুষ লোপেজকে এবারও অত্যন্ত খুশি দেখল রানা। 'ব্রিজে এখনও ওরা আর কোন প্ল্যাঙ্ক বাঁধতে পারেনি,' রানাকে জানাল সে। 'গুলির আওয়াজ শুনে আবার ওরা ইঁদুরের মত গর্তে গিয়ে ঢুকেছে।'

সব কথা বলা হলো লোপেজকে। অবিশ্বাস ভরা সুরে সে বলল, 'ক্রস বো!'

'কতটুকু কাজ হবে সে ব্যাপারে আমারও সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু কোনালি আর জনসনের মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'কোনালি কাজের লোক,' বললেন সিনর বরগুয়িজ। 'তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা ভেবে ক্রস বো তৈরি করতে চাইছে সে। কিন্তু আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। ধরো, সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম আমরা, ধরো, ব্রিজটাকে ধ্বংস করতে পারলাম—তারপর?'

'তারপরও অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না,' বলল রানা। 'সেই ফাঁদেই আটকা পড়ে থাকছি আমরা।'

'ঠিক তাই,' বললেন বরগুয়িজ। 'ওদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হলো সময়, আমার কাছেও ঠিক তাই। আমাকে অচল করে রাখতে পারলে সব দিক থেকে জিতে যাচ্ছে ওরা।'

'রাজনৈতিক যে খেলাটা শুরু হয়েছে তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ওরা আপনাকে,' একমত হয়ে বলল রানা। 'ক্ষমতা দখল করার জন্যে আর কতদিনের প্রস্তুতি দরকার ওদের?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। বললেন, 'একমাস—অথবা দু'মাস; তার বেশি নয়। ওদের নড়াচড়া লক্ষ্য করেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠি আমি এবং ওদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়েও গিয়েছিলাম—তীরে এসেই ডুবল তরী। প্রশ্নটা সময়ের। এখনও সময় আছে, আবার সচল হতে পারলে ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাব আমি...'

'তোমার চার্টটা দেখি,' হঠাৎ বলল লোপেজ।

চার্টটা বের করে একটা পাথরের উপর মেলে দিল রবিন। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে নদীর গতিপথ লক্ষ্য করে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লোপেজ, বলল, 'এই নদী—এই খাদ—একটা ফাঁদ। পাহাড়ের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করছে আমাদেরকে।'

'ভাটির দিকে আরেকটা ব্রিজ আছে, কিন্তু সেদিকে গিয়েও কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'দূরত্ব একটা বাধা, তাছাড়া, ওখানেও গার্ড আছে ওদের, সন্দেহ নেই।'

'তাই যদি হয়,' বলল রবিন, 'ব্রিজ পেরিয়ে আমাদেরকে ধরার জন্যে এদিকে আসছে না কেন?'

'এখনও হয়তো ওরা ভাবছে এই ব্রিজটা মেরামত করা সম্ভব,' বললেন বরগুয়িজ। 'যখন মনে করবে সম্ভব নয়, তখনই ওই পথ ধরে এগোবে ওরা। এদেরকে আমি চিনি, কুঁড়ের বাদশা সবাই পাহাড়ী এলাকার আশি কিলোমিটার দূরত্ব পেরোনো সাংঘাতিক কষ্টকর ব্যাপার। সময় লাগবে অন্তত চারদিন।'

ম্যাপের উপর দিয়ে আঙুলটাকে টেনে পশ্চিম দিকে নিয়ে গেল লোপেজ। 'বাকি থাকল শুধু পাহাড়ের দিকটা।'

ঘাড় ফিরিয়ে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল রানা, চোখ ধাঁধানো সাদা তুষার মোড়া অসংখ্য চূড়া দেখা যাচ্ছে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, বলল, 'ওদিকের কথা ভেবে লাভ কি? সিনর বরগুয়িজ এবং মিস জুডির পক্ষে অ্যান্ডেজ পেরোনো অসম্ভব।'

'জানি,' বলল লোপেজ। 'ওদেরকে এখানেই থাকতে হবে। কিন্তু সাহায্যের জন্যে একজনকে অন্তত পাহাড় ডিঙাতেই হবে।'

'ভেবে দেখা যাক তা সম্ভব কিনা,' বলল রবিন। 'ডাকোটা নিয়ে আমি পোর্টা ডি লাস আগুইলাসের ভেতর দিয়ে যেতে চাইছিলাম। পশ্চিম দিকে যেতে হলে ওই গিরিপথের মুখে পৌঁছুতে হবে আগে, তার মানে প্রথমে উত্তর দিকে পঁচিশ মাইল এগোতে হবে। শুধু তাই নয়, এই খাদটাকে চক্কর দিয়ে এড়াবার জন্যে অনেক ওপরে উঠে যেতে হবে। তবে গিরিপথটা খুব বেশি উঁচু নয়, মাত্র চোদ্দ হাজার ফিট।'

চার্টে চোখ রেখে বলল রানা, 'সান্তোস উপত্যকায় পৌঁছুতে হলে মোট ত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে। সোজা রাস্তা কল্পনা করে দূরত্ব অনুমান করছি। কিন্তু যেতে হবে এঁকেবেঁকে, ধরো, পঞ্চাশ মাইল পেরোতে হবে।'

'আরেকটা পথ আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল লোপেজ। পাহাড়ের একটা দিক ইঙ্গিতে দেখাল সে 'এই রেঞ্জটা খুব বেশি উঁচু, কিন্তু চওড়ায় খুব বেশি নয়। ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে সান্তোস উপত্যকা। ম্যাপে তুমি যদি এখান থেকে সান্তোস উপত্যকার আলতিমিরোস পর্যন্ত একটা সরল রেখা টানো, দেখবে দূরত্বটা পঁচিশ কিলোমিটারের বেশি নয়।'

ঝুঁকে পড়ে দূরত্বটা মাপল রানা। 'হ্যাঁ, পনেরো মাইলের মত। কিন্তু অসংখ্য চূড়া দেখতে পাচ্ছি শুধু।'

'খনিগুলো থেকে দু'মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটা গিরিপথ আছে,' বলল লোপেজ। 'ওটার কোন নাম নেই, কারণ পথ হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করবে এমন বোকা আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। সী লেভেল থেকে পাঁচ হাজার আটশো মিটার উঁচুতে।'

'মাই গড!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'উনিশ হাজার ফিট!'

'এখানেই আমরা অক্সিজেনের অভাবে ভুগছি,' বলল রবিন, 'ওখানের অবস্থাটা তাহলে কি? অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে ওই গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সম্ভব?'

'আমি গেছি,' শান্তভাবে বলল লোপেজ। 'কিছু অতিরিক্ত সুবিধে পেয়েছিলাম সেবার আমি, এখন যা আশা করা বৃথা। আসল ব্যাপার হলো পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে থেমে থেমে এগোনো। মাউন্টেনিয়াররা এটা জানে এবং মেনে চলে। কিছু দূর উঠে কয়েকদিন সেখানে থাকে তারা, তারপর আবার খানিকটা ওঠে, কয়েকদিন থাকে, তারপর আবার—এই ভাবে। এর ফলে পরিবেশটা ধাতে সয়ে যায়, শরীরে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না।' পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল সে, একটু চিন্তা করে নিয়ে তারপর আবার বলল, 'কাল যদি ক্যাম্পে উঠে গিয়ে একটা দিন থাকি, তারপর খনি পর্যন্ত উঠে আরেকটা দিন কাটাই—এভাবে বোধহয় গিরিপথটা পেরিয়ে যেতে পারব আমি।'

'একা?' সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানা লোপেজের দিকে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

'ওর সাথে আমি যাব,' দ্রুত বলল রবিন।

'যাব বললেই হলো?' বিরক্তির সাথে রবিনের দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি একজন মাউন্টেনিয়ার?'

'তা নই···'

'আমি তাই,' বলল রানা। 'হিমালয় আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের দেশ থেকে দেখা যায়। বুঝতেই পারছ, দু'একবার অন্তত হিমালয়ের গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। লোপেজের সাথে কেউ যদি যায় তো সে আমি।'

'একা তোমার যাওয়া উচিত হবে না, লোপেজ,' সিনর বরগুয়িজ বললেন।

'বেশ,' বলল লোপেজ। রানার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে একটু হাসল সে। 'কিন্তু আগেই বলে রাখছি, ওখানে গিয়ে আমাকে দায়ী করতে পারবে না। ভাবনা চিন্তা যা করার এখানেই করে নাও। অসমসাহসী পাহাড়ীরা পর্যন্ত ও-পথ মাড়ায় না। শুধু দুর্গম বললে কিছুই বলা হয় না···'

'সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু তবু আমি যাব। এমন একটা কঠিন কাজে একা কাউকে পাঠাতে পারি না আমি।' রবিনের দিকে তাকাল ও। 'আমরা চলে গেলে তুমিই হবে গ্যারিসন কমান্ডার।'

'হ্যাঁ,' বলল লোপেজ। 'যে কোন মূল্যে ব্রিজের ওপারে ঠেকিয়ে রাখবে ওদেরকে, সেটাই তোমার একমাত্র কাজ।'

নদীর গর্জনের সাথে নতুন একটা শব্দ যোগ হলো। দ্রুত নিজের পোস্টে ফিরে গেল লোপেজ, তারপর ইঙ্গিতে কাছে ডাকল রানাকে। বলল, 'গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে ওরা। সম্ভবত চলে যাচ্ছে।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা। স্টার্ট দেয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলো, একটাও নড়ছে না।

'ব্যাপারটা কি?' অবাক হয়েছে লোপেজ।

'ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছে,' বলল রানা। 'আজ রাতে প্রচুর আলো দরকার হবে

ওদের।'

পাঁচ

পরশ পাথর খোঁজার মত মগ্ন ব্যস্ততার সাথে লোহা লক্কড় বাছাই করছে জনসন। ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে কোনালির নিভে যাওয়া পাইপ থেকে, অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে সে কেরিনটার সিলিংয়ের দিকে, বিমগুলো দেখে নতুন একটা বুদ্ধি গজাচ্ছে তার মাথায়। টুঁটি টিপে মারল সেটাকে—ভাবল, ক্রস বো-টা তৈরি হয়ে যাক আগে, তারপর ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল জনসন। তার হাতে একটা ফ্ল্যাট স্প্রিং। 'একটা অটো থেকে এসেছে এটা—বো হিসেবে চালানো যাবে?'

টেনে লম্বা করতে গিয়ে কোনালি অনুভব করল সাংঘাতিক শক্ত স্প্রিংটা। বলল, 'মধ্যযুগে এত শক্ত জিনিস ছিল না। দুর্দান্ত এক হাতিয়ার তৈরি হবে এটা দিয়ে। কিন্তু সহজে টেনে বাঁকা করতে পারা না গেলে বো-এর কোন মূল্য নেই।'

'এসো সমস্যাটা আরেকবার তলিয়ে দেখি,' বলল জনসন।

একটা এনভেলাপের গায়ে নকশাটা দ্রুত আঁকল কোনালি। 'হালকা স্পোর্টিং বো-এর জন্যে মধ্যযুগে ওদের ছিল ছাগলের পায়ের মত একটা লিভার, কিন্তু আমরা যে ধরনের হাতিয়ারের কথা ভাবছি তার জন্যে ওই লিভার যথেষ্ট শক্তিশালী হবে না। ভারী সামরিক বো-কে বাঁকা করার দুটো পদ্ধতি চালু ছিল। এক, ক্রেনকুইন—মানে এই ভঙ্গিতে,' নকশাটার একটা অংশ দেখাল সে, 'একটা র‍্যাচেট লাগানো থাকত, ফায়ারিংয়ের জন্যে নামিয়ে রাখা হত সেটা। দুই, বোতে ফিট করা একটা উইন্ডল্যাস, যেটা কয়েকটা পুলিকে ঘোরাত।'

বাঁকাচোরা স্কেচটার দিকে তাকিয়ে আছে জনসন। বলল, 'উইন্ডল্যাসের সাহায্য নেব আমরা। র‍্যাচেট তৈরি করা কঠিন। এবং দরকার হলে গ্রাইনডিং করে স্প্রিংটাকে দুর্বল করে নিতে পারব।' দরজার দিকে তাকাল সে। 'মিলার কোথায়?'

'জানি না। আগে এই কাজটা শেষ করো…'

'আগে মিলারকে ডেকে আনো তুমি,' বলল জনসন। 'ওকে আমি তীর বানাতে বসিয়ে দিই।'

'তীর নয়। বোল্ট। অথবা কোয়ারেল।'

'নাম যাই হোক…'

'যাই হোক মানে?' শান্ত কোনালি হঠাৎ চটে উঠল, 'যার যা নাম তাকে সেই নামে ডাকতে হয়, এই সাধারণ নিয়মটা জানা নেই নাকি তোমার?'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!' আত্মসমর্পণ করল জনসন। 'আমারই ভুল হয়েছে। অ্যারো নয়, বোল্ট। অথবা…কি যেন?'

'কোয়ারেল,' গম্ভীর ভাবে বলল কোনালি।

কাছাকাছি একটা কেবিনে স্টোভ জ্বেলে টমেটোর ক্যান গরম করছিল মিলার, ধমক মেরে তাকে সাথে করে নিয়ে এল ওরা। জনসনের দশ আঙুলের কেরামতি লক্ষ্য করে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হলো কোনালি। অসম্ভব সব বাতিল মেশিন আর যন্ত্রপাতি থেকে দরকারী যন্ত্রাংশ ঠিক খুঁজে বের করছে সে, এবং দ্রুত তা খুলে নিয়ে একপাশে জমা করছে। কাটাকুটির জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলো গ্রাইন্ড স্টোন মেশিনটা। ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল জনসন, উপরে তুলে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারছে না সেটাকে। কাজটা পালাক্রমে ভাগাভাগি করে নিল ওরা। কোনালি আর জনসন নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু এই দুর্ভোগের জন্যে মা বাবা তুলে গালিগালাজ করছে নিজেকে মিলার।

একটা কেবিন থেকে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং আর ফাঁপা পাইপ খুলে আনল ওরা। রিইনফোর্সিং স্টীল সাইজ করে কেটে দুই প্রান্ত ফুটো করে দিল। অক্সিজেনের অনটন এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে হাতের আঙুল, কেটে ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে।

তৈরি হাতিয়ারটা কোনালি যখন হাতে তুলল তখন ফর্সা হয়ে গেছে আকাশ। কোথেকে, কিভাবে কেটে গেছে রাতটা, বলতে পারবে না ওরা, সারারাত পাগল হয়ে কাজ করেছে। 'যেমনটি কল্পনা করেছিলাম তারচেয়ে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে,' নেড়েচেড়ে জিনিসটাকে দেখছে কোনালি। 'তবে দেখতে যাই হোক, মনে হচ্ছে কাজ হবে।' ঘুমে ভারী লাল চোখ দুটো এক হাত দিয়ে ঘষল সে। 'ওদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে আমি···ওদের হয়তো এক্ষুণি দরকার।'

ওদিকে সারারাত হেডলাইট জ্বেলে ব্রিজটাকে আলোয় ভাসিয়ে রেখেছিল শত্রুপক্ষ। ব্রিজে প্ল্যাঙ্ক নিয়ে আসার কোন চেষ্টা রাতে অবশ্য করেনি, কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই মরিয়া হয়ে উঠল তারা। বেলা একটু চড়তে রানা দেখল ব্রিজে আরও নয়টা প্ল্যাঙ্ক লাগানো হয়েছে, এদিকে লোপেজের পিস্তলে গুলি আছে আর মাত্র ছয়টা।

বেলা ন'টার মধ্যে আরও দুটো বুলেট খরচ করে ফেলল লোপেজ।

পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে মনে মনে আতঙ্ক বোধ করল রানা। ব্রিজটা মেরামত হতে যা দেরি, তারপর কি ঘটবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ও। সবার হাত খালি, আত্মরক্ষার কোন সুযোগ নেই। হত্যার নেশায় ছটফট করছে শত্রুরা, এপারে এসে যাকে সামনে পাবে কোন রকম বাছ-বিচার না করে গুলি করে বেয়োনেট চার্জ করে মেরে ফেলবে। সেই উদ্দেশ্যেই এত ব্যাপক আয়োজন নিয়েছে তারা।

একটা মাত্র উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা যেতে পারে, ভাবছে রানা। সবাই যদি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার যেদিক খুশি, তাহলে শত্রুদেরকেও তাই করতে হবে। দুর্গম এলাকা এটা, ধাওয়া করে সবাইকে ধরতে পারবে না শত্রুরা। দু'একজন হয়তো বেঁচে যাবে ওদের হাত থেকে, ভাগ্যগুণে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে এখানে কি ঘটেছে তা প্রকাশ করার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারে।

কিন্তু সমস্যার সেটা কোন সমাধান নয়। অথচ অন্য কোন উপায় মাথায় আসছে না। দুর্বল, অসহায় বোধ করছে রানা। পুকুর পাড়ের ক্যাম্প থেকে ভোর

না হতেই ব্রিজের কাছাকাছি চলে এসেছে সবাই। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে বাকি নেই কারও, সম্ভবত সেজন্যেই ব্রিজের কাছাকাছি থাকতে চাইছে ওরা। যা অবধারিত তাকে মেনে নেবার অদ্ভুত একটা প্রবণতা আছে মানব-প্রকৃতির মধ্যে, এ তারই লক্ষণ। সবাই জানে ব্রিজের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা মানে বিপদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়।

আশপাশে ঘুর ঘুর করছে সোহানা, মাঝে মধ্যে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। চোখ ইশারায় তাকে কাছে ডেকে নিল রানা। 'কেমন বুঝছ?' জানতে চাইল ও।

'আমার বড় ভয় করছে, রানা,' বড় বড় চোখের পাতা মেলে রানার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল সোহানা। 'অবশ্য তোমার ওপর ভরসা রাখি আমি...'

গম্ভীর রানা অতি দুঃখে হাসল। 'তোমাকে অভয় দিতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই সিরিয়াস, মিথ্যে আশ্বাস দেয়া চলে না। সোহানা, এখানে অথর্ব বৃদ্ধা মিস জুডি যতটুকু অসহায়, আমিও তার চেয়ে কম অসহায় নই।'

মুখটা ম্লান হয়ে গেল সোহানার।

'কারও কিছু করার নেই,' আবার বলল রানা। 'এখানে বৈরী প্রকৃতি একা নয়, একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খুনী আমাদের শত্রু—এবং আমরা নিরস্ত্র। সাহায্য পাব, সে আশাও নেই।' একটু বিরতি নিল রানা। 'এত যে কুংফু, জুডো আর কারাতে ট্রেনিং নিলাম, বুদ্ধির প্যাঁচ শিখলাম—সব বেকার, এক্কেবারে ফালতু, এখানে, এই তুষার-পর্বতের বিরুদ্ধে এক কানাকড়িও দাম নেই ওসবের।'

'তাহলে?'

'এইটুকু বলতে পারি, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সবাই মিলে চেষ্টা করব, একথা ঠিক। কিন্তু কিভাবে চেষ্টা করব তার ফল কি হবে—কিছুই এখনও জানা নেই আমার।'

এদের সবাইকে কেবিন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? ভাবছে রানা। এমন সময় রাস্তার উপর দিক থেকে কিম্ভূতকিমাকার একটা জিনিস হাতে নিয়ে নেমে আসতে দেখল ও কোনালিকে।

'এই যে এনেছি,' বলল কোনালি। 'এই নিন আপনার ক্রস বো।' এক হাত দিয়ে লাল চোখ ডলে নিল। 'ব্যক্তিগতভাবে ক্রস বো নামটা পছন্দ নয় আমার, একে আমি একটা আরবালেস্ট বলতে চাই।'

কোনালিকে দেখে ছুটে এল রবিন। 'এ কি! এত জলদি?'

কোনালির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রানা দেখল ঘুম এবং ক্লান্তির ছাপ ছাড়া চেহারায় আর কোন দাগ অথবা ময়লার চিহ্নমাত্র নেই, পোশাকও এতটুকু নোংরা হয়নি কোথাও। 'সারারাত কাজ করেছি আমরা,' সরল হাসিতে বোকা বোকা দেখাচ্ছে কোনালিকে। 'এখান থেকে রওনা হবার আগে আমার ছোট মেয়েটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কিনা...ওর কাছে ফিরে যেতে হবে...' ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল তার গলার স্বর, হাসিটা মুখ থেকে অদৃশ্য হতে গিয়েও হলো না, সেটার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠছে।

কেঁদে ফেলছে কোনালি। বুঝতে পেরে দ্রুত তার কাঁধে হাত রাখল রানা।

কোনালির মধ্যে বাঁচার আকুতি টের পেয়ে শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওর। 'নিশ্চয়ই কোনালি,' কোনালিকে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বলল রানা। 'আমরা সবাই আমাদের আপনজনের কাছে ফিরে যাব।' প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে ইঙ্গিতে ক্রস বো-টাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'এবার বলো, কিভাবে কাজ করে এটা?'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল কোনালি, পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল ক্রস বো-টাকে। হাঁটু মুড়ে সেটার পাশে বসল সে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এই মেটাল লূপটা একটা স্টিরাপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। মাটিতে নামিয়ে একটা পা রাখবে তুমি এর ওপর। তারপর তুমি এই কর্ডটা ধরে বো-স্ট্রিঙে হুকটা আটকাবে, এবং এই হাতলটা ঘোরাতে শুরু করবে। তাতে পিছিয়ে আসতে শুরু করবে বো-স্ট্রিং, যতক্ষণ সিয়ার বা গান লকের এই অংশে যুক্ত না হয়। এবার এই সরু গর্তে একটা বোল্ট ঢুকিয়ে দিলেই তুমি শূট করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলে। ট্রিগারে চাপ দাও, সিয়ার পড়ে গিয়ে রিলিজ করে দেবে বো স্ট্রিং।'

হাত দিয়ে ধরে তুলল রানা ক্রস বো-টাকে। বেশ ভারী জিনিস। একটা গাড়ির স্প্রিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বো। ছয় প্রস্থ ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে তৈরি একটা কর্ড কাজ করছে বো-স্ট্রিং হিসেবে। বো-স্ট্রিংটাকে টেনে পিছিয়ে আনার জন্যে যে কর্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও তিন প্রস্থ ইলেকট্রিক তার দিয়ে তৈরি। সীট এবং ট্রিগার কাঠ দিয়ে বানানো, বোল্ট ঢোকানো হবে ফাঁপা একটা স্টীল পাইপের গর্তে।

মনে মনে স্বীকার করল রানা, দায়ে পড়লে মানুষ বাতিল মাল মশলার সাহায্যে কি না করতে পারে! ক্রস বো-টা যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখন ফল কতটুকু দেবে সেটাই বিবেচ্য।

'স্প্রিংটাকে দুর্বল করতে অনেক সময় বেরিয়ে গেছে আমাদের,' বলল কোনালি। 'তবে এখনও ওটার শক্তি কম নয়।'

'অ্যারো তৈরি করেছ?'

মুখ বেজার করল কোনালি। 'অ্যারো নয়, রানা,' ধৈর্যের সাথে মৃদু গলায় বলল সে। 'বোল্ট। অথবা কোয়ারেল।'

'দুঃখিত, কোনালি।'

'ধরো,' একটা বোল্ট বাড়িয়ে দিল কোনালি রানার দিকে। 'বারোটা তৈরি করেছি আমরা।'

বোল্টটা মরচে ধরা স্টীলের গোল একটা টুকরো মাত্র, ডায়ামিটার এক ইঞ্চির আটভাগের তিন ভাগ, লম্বায় পনেরো ইঞ্চি। গুঁড়ো দুধের ক্যান কেটে তা দিয়ে মোড়া হয়েছে একটা প্রান্ত, অপর প্রান্তটা চেঁছে সূচাল করা হয়েছে বেশ খানিকটা। জিনিসটার ওজন অনুভব করে বলল রানা, 'এটা সাথে সাথে কোন মানুষকে খুন যদি নাও করে, ব্লাড-পয়জনিংয়ে নির্ঘাত মারা যাবে সে। রেঞ্জ যতটুকু আশা করা গিয়েছিল তা কি পাওয়া যাবে?'

'তার চেয়ে একটু বেশি রেঞ্জ এটার,' বলল কোনালি। 'মধ্যযুগে এত ভারী স্টীল ব্যবহার করা হত না বটে, কিন্তু আমাদের ধনুকটা হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী।

পরীক্ষা করে দেখলেই তো পারো।'

'তাই হোক!' উৎসাহী হয়ে উঠল রবিন।

স্টিরাপে পা রেখে উইন্ডল্যাস হ্যান্ডেলটা ঘোরাতে শুরু করল রানা। প্রচুর জোর লাগছে গায়ের, যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বো-টা। জায়গা মত একটা বোল্ট ঢুকিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় ছুঁড়ব বলো।'

'মাটির ওই ঢিবি লক্ষ্য করে ছোঁড়ো।'

প্রায় ষাট গজ দূরে ঢিবিটা। ক্রস বো তুলছে রানা, দ্রুত বাধা দিল ওকে কোনালি, 'শুয়ে চেষ্টা করো, অ্যাকশনের সময় যেভাবে ব্যবহার করব আমরা। ট্র্যাজেকটরিটা একেবারে নিচু, সুতরাং সাইটে চোখ রাখতে কোন অসুবিধে নেই। তার আর লোহার শিক দিয়ে একটা সাইটও তৈরি করেছি, ফিট করা হয়নি। এখন তার দরকার নেই।'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কর্কশ কাঠের বাঁটটা কাঁধে ঠেকিয়ে নিল রানা। নাক বরাবর সোজা তাকাল মাটির উঁচু ঢিবিটার দিকে, পরমুহূর্তে ট্রিগারে চাপ দিল। স্ট্রিং রিলিজ হয়ে যেতেই জোরে ধাক্কা মারল ক্রস বো-টা কাঁধে।

ছোট ঢিবিটার একেবারে ডান দিক ঘেঁষে খানিকটা ধুলো উড়তে দেখা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে কাঁধটা ডলছে রানা।

হাসতে চেষ্টা করছে কোনালি, উত্তেজনায় ঠোঁটের দুই প্রান্ত একটু একটু কাঁপছে তার। বলল, 'চলো, উদ্ধার করে নিয়ে আসি বোল্টটা।'

কিন্তু ঢিবির কাছে এসে বোল্টটাকে খুঁজেই পেল না ওরা। 'গেল কোথায়?' বলল রবিন। 'পরিষ্কার ধুলো উড়তে দেখেছি আমি এখানে।'

দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কোনালির। সগর্বে হাসছে এখন সে। 'বলিনি আমি, হাতিয়ারটা সাংঘাতিক শক্তিশালী? ওই যে তোমাদের বোল্ট।' আঙুল দিয়ে দেখাল সে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অবাক হলো রানা, সেই সাথে একটু পুলকও অনুভব করল। বোল্টটা যতটুকু লম্বা তার চেয়ে একটু বেশি ঢুকে গেছে মাটির ভিতর। আশায় ভরে উঠল রানার বুক। আগের মত অসহায় বোধ করছে না। রাইফেল এবং পিস্তলের বিরুদ্ধে লড়ার মত যাই হোক কিছু একটা তবু তো রয়েছে এখন ওদের হাতে।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। 'ওদেরকে ডাকো, কুইক,' রবিনকে বলল ও। 'টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করুক সবাই। দেখা যাক সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট কার হয়।' কোনালির দিকে তাকাল ও। মাটি খুঁড়ে বোল্টটাকে বের করার চেষ্টা করছে সে। 'শরীর খারাপ করবে তোমার—যাও, নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'অ্যাকশনে এর রেজাল্ট না দেখেই? তাছাড়া, ত্রুটি দেখা দিলে কিছু এদিক ওদিক করতে হতে পারে, তাই না? ঘুম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। কেবিন ক্যাম্পে আরেকটা ক্রস বো তৈরি করছে জনসন। আর মিলারকে বোল্ট বানাতে বসিয়ে রেখে এসেছি। এই যা, সাইট ফিক্স করার কথা ভুলেই গেছি...'

মিস জুডি, সিনর বরগুয়িজ এবং লোপেজ ছাড়া বাকি সবাই প্রতিযোগিতায় অংশ

গ্রহণ করল। তৃতীয় স্থান দখল করল রবিন, রানা হলো দ্বিতীয়, এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে প্রথম হলো গিলটি মিয়া। বো-এর ধাক্কা খেয়ে প্রতিবার 'মরে গেচি' বলে চেঁচিয়ে উঠলেও, দশবারের মধ্যে আটবারই তার বোল্ট গিয়ে আঘাত করল একটা বারো ইঞ্চি বৃত্তের ভিতর।

'কাঁদের হাড় মট্ করে যদি মটকে যায়,' জানতে চাইল সে, 'মানুস বাঁচে?'

'তা বাঁচে,' বলল বেনেদেতা। 'কিন্তু তুমি আমাদের দলীয় হিরো, তোমাকে আমরা আহত হবার ঝুঁকি নিতে দিতে পারি না। দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে গিলটি মিয়ার জন্যে একটা শোল্ডার প্যাড তৈরি করে ফেলল বেনেদেতা। সিনর বরগুয়িজ নেতাসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে হুকুম করলেন, 'সিনর গিলটি মিয়ার জন্যে সুপ তৈরি করো। এখন থেকে তার জন্যে স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।'

সবাই তাকে এমন খাতির করছে, রীতিমত লজ্জায় পড়ে গেল গিলটি মিয়া। কেউ পিঠ চাপড়ে দিলেই লাজুক ভঙ্গিতে মুখ টিপে হাসছে সে।

'আরও চারটে প্ল্যাঙ্ক লাগিয়েছে ওরা,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে বুলেট আছে আর মাত্র চারটে। তোমার ওপরই এখন যা ভরসা। তুমি তৈরি?'

'ইয়েস, স্যার।'

'এসো আমার সাথে,' বলল রানা। 'ব্রিজটা দেখো, রেঞ্জটা বুঝে নাও—দরকার মনে করলে ওই সমান রেঞ্জে আরও ক'বার প্র্যাকটিস করে হাতটা পাকিয়ে নাও।'

শুয়ে নজর রেখেছে ব্রিজের উপর লোপেজ, সেখানে গিলটি মিয়াকে নিয়ে এল রানা। বলল, 'গিলটি মিয়া এখান থেকে ক্রস বো ছুঁড়বে।'

মুখ তুলে সকৌতুকে ক্রস বো-টা দেখল লোপেজ। 'কি হলো রেজাল্ট?'

'ভাল,' বলল রানা।

'ফলাফল একনও হোইনি,' লোপেজকে বলল গিলটি মিয়া। 'হতে যাচ্চে। তবে পেস্তলটা ধরে রেকেচ খামাকাই, ওটা তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও দিকি।' ক্রস বো-টাকে দেখাল সে। 'এটার কাচে ওটা নস্যি!'

চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে আছে লোপেজ।

ব্রিজের দিকে তাকাল গিলটি মিয়া। এইমাত্র আরও একটা প্ল্যাঙ্ক লাগিয়ে দুজন লোক পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্রিজের মাঝখানে ফাঁকটা অনেক ছোট দেখাচ্ছে এখন। আরও কয়েকটা প্ল্যাঙ্ক লাগানো হলেই লাফ দিয়ে টপকানো যাবে সেটা। 'এরচে একটু কম রেঞ্জে মকশো করেচি, স্যার,' রানাকে বলল সে। 'তবে, নতুন করে অভ্যেস না করলেও চলবে।'

সরে গিয়ে গিলটি মিয়াকে জায়গা করে দিল লোপেজ। বো-টা কক্ করে গিলটি মিয়াকে দিল রানা। বলল, 'একটু দূরে সরে যাচ্ছি আমি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, এরপর যখন প্ল্যাঙ্ক নিয়ে আবার ব্রিজে আসবে ওরা, কাছের লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বে তীর।'

'উঁহুঁ,' বলল গিলটি মিয়া। 'শুনলে কোনালি রাগ করবে, স্যার। তীর নয়। বোল্টু। কোরাল বললেও ক্ষতি নেই।' জায়গা মত একটা বোল্ট ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ

হয়ে শুয়ে পড়ল সে, সাইটের উপর দিয়ে তাকাল ব্রিজের দিকে।

খাদের কিনারা ঘেঁষে একটু দূরে সরে গেল রানা। পিছন ফিরে দেখল খানিক দূরে কথা বলছে রবিন কোনালির সাথে, কোনালি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো বন্ধ।

বিশ মিনিট কেটে গেল। কেউ নড়ছে না। এখনও ব্রিজে আসছে না কেউ।

'শালার পিঁপড়ের চোদ্দগোষ্টি উদ্ধার করি।' গিলটি মিয়ার অস্পষ্ট গলা শুনতে পাচ্ছে রানা। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি মারতেই এবার আগের সেই লোক দুজনকে দেখতে পেল ও, একটা প্ল্যাঙ্ক নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসেছে ব্রিজে, ফাঁকটার দিকে এগোচ্ছে। লোপেজের গুলি একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারেনি, তবু কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না ওরা। ফাঁকটার কাছে এসে হাঁটু ভাঁজ করে বসল লোক দু'জন, ব্যস্ত হাতে বাঁধতে শুরু করল প্ল্যাঙ্কটাকে মূল দড়ি দুটোর সাথে।

হঠাৎ অনুভব করল রানা, অস্বাভাবিক দেরি করছে গিলটি মিয়া। হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। কাছের লোকটা ওর মতই একটা লেদার জ্যাকেট পরে রয়েছে। একটু পর পরই মুখ তুলে সতর্ক দৃষ্টিতে খাদের এদিকের কিনারা দেখে নিচ্ছে সে—চোখের পাতা জোড়া উঠছে নামছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল ওর। গিলটি মিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না ও, ভাবছে, করছে কি সে....

ছিলার টংকার কানে ঢোকেনি, কিন্তু লোকটার জ্যাকেট থেকে সামান্য একটু ধুলো উড়তে দেখল রানা। ধুলোটা সরে যেতেই লোকটার পিঠে, দুই শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝখানে প্রায় সবটা গাঁথা অবস্থায় বোল্টটাকে দেখতে পেল ও। নদীর হাহাকারকে ছাপিয়ে অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ কানে ঢুকল, কিসের আক্ষেপে যেন উন্মাদের মত এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে লোকটা। পিঠটা বাঁকা হয়ে গেল তার, হাত দুটো মাথার উপর উঠে গিয়ে শূন্যে কি যেন ধরতে চাইছে, এবার কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, ঢলে পড়ে গেল ব্রিজের কিনারা থেকে। জড়াজড়ি করে থাকা হাত-পা সহ শরীরটা ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে। দ্রুতগতিতে ধাবমান নদীর পানি যেন টগবগ করে ফুটছে, এতটুকু শব্দ হলো না, তাতে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

দ্বিতীয় লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বোকার মত তাকিয়ে আছে সে নদীর দিকে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। বিস্ফারিত চোখে পিছন দিকে তাকাচ্ছে আর ছুটছে, তার পায়ের নিচে দুলছে ব্রিজটা, শেষ মাথায় পৌঁছে কয়েকজনের একটা দলের সামনে থামল সে। নিজের পিঠ দেখিয়ে দ্রুত কি যেন বলছে তাদেরকে, হাঁপাচ্ছে। আরেকজন লোক অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক।

পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছুটে গিলটি মিয়ার কাছে চলে এল রানা। কাঠ হয়ে শুয়ে আছে গিলটি মিয়া। চোখ দুটো চেপে বন্ধ করে রেখেছে।

'দারুণ!' গিলটি মিয়ার পাশে শুয়ে পড়ে বলল রানা। 'এতটা আমি আশা করিনি। ওরা জানতেই পারেনি ঠিক কি ঘটেছে। কোনালি, তুমি একটা প্রতিভা!'

কিন্তু কোনালি তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

চোখ মেলল গিলটি মিয়া, প্রশ্ন করল, 'লোকটা আমার বোল্টে মরেচে, ঠিক জানেন?'

'বলো কি! পরিষ্কার দেখেছি...'

'দেকেচেন? সত্যি?' স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল গিলটি মিয়ার চেহারায়। শিশুর মত সরল হাসল সে। 'তাহালে আর সন্দেহ করার কিচু নেই, চোক বুজে মেরেচিলুম কিনা।'

ছয়

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসছে খাদের ওপার থেকে। তবে দুপুর পর্যন্ত ওদিক থেকে ব্রিজের ধারেকাছে ঘেঁষল না কেউ। লোপেজ সহ সবাইকে নিরাপদ জায়গায় পিছিয়ে এনেছে রানা। সোহানার কাছ থেকে ছোট একটা আয়না চেয়ে নিয়ে পাথরের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে সেটার কাছ থেকে পেরিসকোপের সুবিধে পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ও। এখন আর উঁকি মারার ঝুঁকি নেই, সম্পূর্ণ গা ঢাকা দিয়ে আয়নায় চোখ রেখেই দেখা যাচ্ছে শত্রুদের তৎপরতা।

গুনে দেখেছে রানা, সংখ্যায় ওরা পঁচিশজন। এদিক সেদিক দু'চারজন আরও থাকতে পারে। নীল আর সবুজ রঙের ছাপ মারা ইউনিফর্ম পরা একজন বিশালদেহী লোককে দেখা গেছে দু'একবার, সেই বোধহয় সন্ত্রাসবাদীদের লীডার। মুখভর্তি দাড়ি লোকটার, গোঁফের দুই প্রান্ত দাড়ির সাথে গিয়ে মিশেছে।

প্রথমে রবিনকে আয়নার উপর চোখ রাখার দায়িত্ব দিল রানা। লীডার লোকটার চেহারা আর ইউনিফর্মের বর্ণনা দিয়ে বলল, 'ক্রস বো-র সাহায্যে ওর ওপর একটা চান্স নিতে পারলে ভাল হয়। লীডার মারা গেলে বাকি সবাই হয়তো সুড় সুড় করে সরে পড়বে।'

রানার আশা দেখে নিঃশব্দে হাসল রবিন।

ক্যাম্পে ফিরে এল রানা। পুকুর পাড় থেকে তুলে এনে এখানে নতুন ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে জায়গাটা, চারদিকে উঁচু নিচু পাথর আর খানাখন্দে ভর্তি। পাশেই একটা বেশ লম্বা গুহা। শত্রুপক্ষ যদি ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে, গা ঢাকা দিয়ে এই জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলা সহজ হবে।

খাদের এপার থেকে শত্রুপক্ষের যানবাহনের দূরত্ব গভীর মনোযোগের সাথে কল্পনায় মেপে নিয়েছে রানা, একশো আশি গজের বেশি হবে না। এই সমান দূরত্বে সবাইকে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে বলল ও। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল সোহানাকে। বলল, 'লোপেজের সাথে আমি রওনা হবার আগে পর্যন্ত তুমি আমার সেক্রেটারি। কাগজ কলম আছে সাথে?'

হেসে ঘাড় কাত করল সোহানা। এক এক করে বারোটা কাজের কথা বলল রানা, সব লিখে নিল সোহানা।

'মাথার ভেতর হাজারটা চিন্তা গিজগিজ করছে,' বলল রানা। 'কখন কোন্‌টা ভুলে যাই ঠিক নেই। আমি চলে যাবার পর বিপদ দেখা দিলে রবিনকে কাজগুলোর কথা জানাবে তুমি। এখন জানিয়ে দিয়ে চিন্তায় ফেলতে চাই না ওকে।'

সিনর বরগুয়িজকেও একটা কাজ দিল রানা। তাঁকে ছয়টা বোল্ট আর ছেঁড়া খানিকটা কম্বল দিয়ে বলল, 'প্রতিটি বোল্ট ছোট ছোট কম্বলের টুকরো দিয়ে মুড়ে বেঁধে ফেলুন।'

কম্বল মোড়া বোল্ট ছুঁড়ে দেখা গেল লক্ষ্যভেদ করতে তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না। এবার প্যারাফিন দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে একটা বোল্ট ছুঁড়ল রানা, ছোঁড়ার আগে তাতে আগুন ধরিয়ে নিল। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছুবার আগেই নিভে গেল আগুনটা।

তৃতীয়বার আগুনটাকে সময় দিল রানা, যাতে কম্বলটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার সুযোগ পায়। আঁচ লেগে চোখ মুখ ঝলসে যাবার অবস্থা হলো ওর। কিন্তু ফলাফল দেখে মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল। পর পর তিনটে বোল্ট টার্গেটে গিয়ে লাগল, তিনটেই পাশাপাশি জ্বলছে দাউ দাউ করে।

'রাতের বেলা এ-কাজ করা বিপজ্জনক,' গিলটি মিয়াকে বলল রানা। 'বোল্ট ছোঁড়ার আগেই আগুন দেখতে পাবে ওরা, গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবে বো-ম্যানকে।'

শেষ বিকেলের দিকে আবার ব্রিজের দিকে পা বাড়াল শত্রুপক্ষ, কিন্তু লোপেজ গুলি করতে ছুটে পালিয়ে গেল তারা। সন্ধ্যার আগে আরেকটা গুলি খরচ করল লোপেজ।

'আর নয়,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'শেষ বুলেট দুটো রেখে দাও।'

সূর্য ডোবার আগে আরও তিনটে প্ল্যাঙ্ক যোগ হলো ব্রিজে। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে ব্রিজটাকে ওরা আলোকিত করে রাখল রাতে, কিন্তু সাহস করে প্ল্যাঙ্ক লাগাতে এল না।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হলো রানা।

পাহারায় রয়েছে কোনালি। আয়নার নিচে মাটিতে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে আছে সে। পেন্সিল দিয়ে একটা কাগজে কি যেন আঁকতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর পর চোখ তুলে তাকাচ্ছে আয়নার দিকে। ক্রল করে রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে বলল, 'সব শান্ত। এইমাত্র হেডলাইট অফ করে দিয়েছে ওরা।'

কোনালির হাতের কাগজটার দিকে তাকাল রানা। 'কি ওটা?' স্কেচটা দেখে বলল ও। 'দাঁড়িপাল্লা নাকি?'

হকচকিয়ে গেল কোনালি, পরমুহূর্তে খুশি দেখাল তাকে। 'চিনতে ভুল করেনি!'

স্কেচটার ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না রানা। ক্রল করে আরও একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল ব্রিজের দিকে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক ব্রিজের ফাঁকটা দেখে। শেষ পর্যন্ত হয়তো গিরিপথ পেরোবার দরকার হবে না, ভাবছে ও, এখানে দাঁড়িয়েই লড়তে হবে এবং মরতে হবে। অনুমান করল, বিকেলের মধ্যেই ফাঁকটা কমে এত ছোট হয়ে যাবে যে লাফ

দিয়ে টপকে আসা যাবে।

ব্যস্ততা অনুভব করে ক্যাম্পে ফিরে এলো রানা। যা করার দ্রুত করতে হবে। রওনা হবার আগে শত্রুপক্ষের বড় ধরনের একটা ক্ষতি করে দিয়ে যেতে চাইছে ও, যাতে মনোবল ভেঙে যায় ওদের, ব্রিজ মেরামত আরও পিছিয়ে যায়।

কেবিন ক্যাম্প থেকে নেমে এসেছে জনসন, সাথে আরেকটা ক্রস বো তৈরি করে নিয়ে এসেছে সে। প্রথমটা এরই মধ্যে একজনকে খুন করেছে শুনে মুখের চেহারা বেশ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। ভীতু লোক, খুন-জখমের কথা শুনলেই মুখ শুকিয়ে যায়।

'ব্রেকফাস্ট সেরে শত্রুদেরকে একটা চমক দেব আমরা,' রবিনকে বলল রানা। গিলটি মিয়াকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল, 'গতকাল যে রেঞ্জে প্র্যাকটিস করেছ সেই রেঞ্জে আবার শুরু করো।'

আধ ঘণ্টা পর ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছে ওরা, জনসন ব্রিজের কাছ থেকে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ব্রিজ মেরামত শুরু করেছে আবার ওরা। কোনালি জানতে চাইছে গুলি করবে কিনা।'

'না,' বলল রানা। তাকাল লোপেজের দিকে। 'তুমি যাও। গুলি করার জন্যে ভাল একটা জায়গা বেছে পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করো আমার জন্যে। সাবধান, আমি না বললে গুলি করো না।'

দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে গেল লোপেজ।

সবাইকে ডাকল রানা। বলল, 'গিলটি মিয়া কোথায়?'

'আচি,' পাশের গুহা থেকে জবাব দিল গিলটি মিয়া।

'এদিকে এসো।'

বেরিয়ে এসে সবার সাথে দাঁড়াল গিলটি মিয়া।

চোখা একটা পাথর দিয়ে ধুলোর উপর সমান্তরাল দুটো সরল রেখা টানল রানা। 'এটা খাদ,' বলল ও। 'ব্রিজটা এখানে। এই হলো রাস্তা। রাস্তাটা ব্রিজের ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁছেচে, তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে খাদের ওদিকের কিনারা ধরে নদীর সাথে সমান্তরালভাবে চলে গেছে।' ধুলোয় আঁকা স্কেচটার উপর ছোট্ট একটা পাথর রাখল ও। 'ব্রিজের পাশেই এখানে এটা একটা জীপ, এটার পিছনে আরেকটা জীপ। দুটোই ব্রিজের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় জীপটার পিছনে সাত টনী একটা ট্রাক রয়েছে, দুই থেকে আড়াই টন টিম্বার রয়েছে এতে।' স্কেচের উপর আরেকটু বড় একটা পাথর রাখল রানা। 'ট্রাকের পিছনে জীপ রয়েছে আরও একটা। এরপর অন্যান্য যানবাহন আছে, কিন্তু সেগুলোকে আমাদের বিবেচনার মধ্যে না রাখলেও চলবে এখন।'

নড়েচড়ে একটু পিছিয়ে বসল রানা। 'এবার খাদের এদিকে মনোযোগ দাও। এই হলো ব্রিজ, উজান দিকে এখানে থাকবে লোপেজ। ব্রিজের ওপর শত্রুদের লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়বে সে—সম্ভবত লাগবে না, কিন্তু লাগুক বা না লাগুক তাতে কিছু এসে যায় না। গুলির শব্দে ভয় পাবে শত্রুরা, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিতে পারবে না—সেটাই আমি চাই।

'গিলটি মিয়া থাকবে ভাটির দিকে, এখানে, ট্রাকটার সরাসরি উল্টোদিকে। ওর

আর ট্রাকটার মধ্যবর্তী দূরত্ব একশো আশি গজ। গতকাল এই দূরত্বে টার্গেট প্র্যাকটিস করে হাত পাকিয়েছে সে। গুলির শব্দ শোনা মাত্র একটা বোল্ট ছুঁড়বে সে, ফুটো করে দেবে ট্রাকের পেট্রল ট্যাঙ্ক।'

মুখ তুলে রবিনের দিকে তাকাল রানা। 'গিলটি মিয়ার ঠিক পিছনে থাকবে তুমি। বোল্ট ছুঁড়েই ক্রস বো-টা তোমাকে দেবে গিলটি মিয়া এবং জানাবে ট্যাঙ্ক ফুটো করতে পেরেছে কিনা। যদি না পারে, হাতল ঘুরিয়ে ছিলা টানবে তুমি, বোল্ট ঢোকাবে, তারপর ক্রস বো-টা ওর হাতে ফিরিয়ে দেবে আবার বোল্ট ছোঁড়ার জন্যে। আর যদি প্রথমবারই সফল হয় সে, ছিলা টেনে ক্রস বো-টা নিয়ে দৌড়ে চলে আসবে সোহানার কাছে। ক্রস বো-টা ওকে তুমি আনলোডেড অবস্থায় দেবে।'

স্কেচের উপর ছোট্ট আরেকটা পাথর বসাল রানা। 'এখানে থাকব আমি, আমার পিছনে থাকবে সোহানা। লোডেড এবং ছিলা টানা অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রস বো-টা নিয়ে তৈরি থাকবে ও।' মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'আমি সিগন্যাল দিলেই প্যারাফিনে ভেজানো কম্বল মোড়া বোল্টে আগুন ধরিয়ে ক্রস বো-টা আমার হাতে তুলে দেবে তুমি। ট্রাক লক্ষ্য করে বোল্টটা ছুঁড়ব আমি। গতকাল ঠিক এইভাবে রিহার্সেল দিয়েছি আমরা, সুতরাং কারও কাছ থেকে কোন ত্রুটি আশা করি না আমি। তবু কারও যদি বুঝতে অসুবিধে হয়, প্রশ্ন করে পরিষ্কার হয়ে নিতে পারো।'

উঠে দাঁড়াল রানা, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

'আমি কি করব?' জানতে চাইল জনসন।

'এই অপারেশনের সাথে সরাসরি যারা জড়িত নয় তারা মাথা নিচু করে পিছন দিকে থাকবে,' বলল রানা। 'তবে তৈরি থাকতে হবে সবাইকে। বো যদি বিগড়ে যায়, সাহায্য দরকার হতে পারে। আর কোন প্রশ্ন?'

নেই।

রবিনকে নিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে রানা। রবিন বলল, 'প্ল্যানটা চমৎকার। কিন্তু তোমার ভূমিকাটা বিপজ্জনক। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ। তুমি বোল্ট ছোঁড়ার আগেই ওপার থেকে আগুন দেখতে পাবে ওরা, গুলি করবে...'

'ঝুঁকি ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না,' বলল রানা। 'এটাকে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু ভাবলে ভুল হবে, রবিন। আমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে লড়ছি, ঝুঁকি তো নিতেই হবে। সবাই আমরা বেঁচে থাকব এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।'

আগের মত এবারও খুব সুবিধের একটা জায়গা বেছে শত্রুদের উপর নজর রাখছে লোপেজ।

'প্ল্যাঙ্কটা কতক্ষণ ধরে লাগাচ্ছে ওরা?' ব্রিজের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রানা।

'মিনিট পাঁচেক,' পিস্তল তুলল লোপেজ, গুলি করার জন্যে মরে যাচ্ছে।

'উঁহুঁ,' বলল রানা, 'এখন নয়। এরপর আবার যখন প্ল্যাঙ্ক নিয়ে ব্রিজে আসবে ওরা, পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গুলি কোরো একটা। ব্যস, তোমার কাজ এইটুকু।'

ইউনিফর্ম পরা বিশালদেহী লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা, কোমরে পিস্তল

রয়েছে একটা। হাঁটাহাঁটি করছে সে। হাত নেড়ে, গলা চড়িয়ে হুকুম করছে—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবাই তার কথায়। লীডার, সন্দেহ নেই। শত্রুরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লক্ষ করছে রানা। সাহস ক্রমশ বাড়ছে ওদের। তার কারণ ব্রিজের ওপরে এখন পর্যন্ত গুলি খায়নি কেউ।

ক্রল করে পিছিয়ে এল রানা খানিকটা, তারপর উঠে দাঁড়াল। সবাই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে আরেকবার বুঝিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পজিশন নিতে বলল ও।

কম্বল মোড়া বোল্ট প্যারাফিন দিয়ে ভেজাবার সময় সোহানা জানাল, 'এইটুকুই ছিল প্যারাফিন। এরপর রান্না করব কি দিয়ে?'

সাত গজ পিছন থেকে কোনালি বলল, 'কেবিন ক্যাম্পে চল্লিশ গ্যালনের দুটো ড্রাম আছে।'

নিজের পজিশনের দিকে এগোচ্ছিল রবিন, কথাটা তার কানে যেতেই থমকে গেল সে, 'তাই নাকি? চল্লিশ গ্যালনের দুই ড্রাম প্যারাফিন?' কাজে লাগবে···ভাবতে ভাবতে নিজের জায়গায় চলে গেল সে।

ব্রিজে দু'জন লোককে উঠতে দেখছে রানা। ক্রল করে নয়, এবার ওরা প্ল্যাঙ্ক নিয়ে হেঁটে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে সোহানার চোখে চোখ রাখল ও। 'পাঁচ মিনিট।'

ক্লিক করে শব্দ হলো, সিগারেট লাইটারটা পরীক্ষা করে নিল সোহানা।

ব্রিজের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। এক, দুই করে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। শার্টে ঘষে হাতের তালুর ঘাম মুছে নিল ও। এই সময় দু'চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল ওর। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এসে ট্রাকটার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে একজন লোক—ঠিক পেট্রল ট্যাঙ্কটাকে আড়াল করে।

'সর, সরে যা,' বিড় বিড় করে বলল রানা। গিলটি মিয়া ঘাবড়ে না যায়, ভাবল ও। লোপেজকে সব কথা না জানিয়ে ভুল করেছে সে, বুঝতে পারছে এখন। লোকটা বাধার সৃষ্টি করছে তা বোঝার কথা নয় তার, নির্দিষ্ট পাঁচ মিনিট পর ঠিকই গুলি করবে সে।

রাগের মাথায় অভিশাপ দিচ্ছে লোকটাকে রানা। কেলে ভূতের মত দেখতে লোকটা, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দিয়াশলাই জ্বালছে।

টাস করে গুলি হলো। সিগারেটের ডগায় আগুন ছোঁয়াতে গিয়ে থমকে স্থির হয়ে গেল লোকটা। তিন সেকেন্ড পর লাফ দিয়ে ট্রাকের আড়ালে গা ঢাকা দিল সে।

পেট্রল ট্যাঙ্কটা দেখতে পাচ্ছে এখন রানা। টং করে অস্পষ্ট একটা শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে এল। হঠাৎ ট্রাকের পাশে গাঢ় একটা ছায়া মত দেখতে পাচ্ছে রানা। একটু যেন দুলেও উঠল ট্রাকটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরাল রানা। রাস্তায় কিসের ছায়া ওটা? ভাবছে ও। গড়িয়ে ট্রাকের নিচে চলে যাচ্ছে ওটা কি পেট্রল, নাকি সবটুকুই ওর কল্পনা?

টাস টাস অবিরাম শব্দ হচ্ছে পিস্তলের, তার সাথে রাইফেলের গর্জন শোনা

যাচ্ছে দু'এক সেকেন্ড পর পর। সেদিকে কান নেই রানার। ট্রাকের আড়াল থেকে এক পা এক পা করে বেরিয়ে এল সেই কেলে ভূতটা, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খাদের এপারে তাকাচ্ছে বারবার, নাক টেনে বাতাস থেকে গন্ধ নিচ্ছে। হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে ট্রাকের নিচেটা দেখল। পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত খাড়া হয়ে গেল সে, চিৎকার করছে, আর পাগলের মত হাতছানি দিচ্ছে।

আপন মনে হাসল রানা। পেট্রল, সন্দেহ নেই। ঘাড় ফিরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল ও, বলল, 'জ্বালো।'

সাথে সাথে ক্রস বো-তে ঢোকানো বোল্টে আগুন ধরাল সোহানা। দশ সেকেন্ড সময় দিল আগুনটাকে ভাল করে ধরার জন্যে, তারপর ক্রস বো-টা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ক্রস বো-টাকে দু'হাত দিয়ে ধরে সামনে আনল রানা, আগুনের আঁচ লেগে কপালে ঝুলে পড়া এক গোছা চুলের ডগা পুড়ে গেল ওর। গরম লাগছে, তাই মুখটাকে সরিয়ে আনল একটু। ট্রাকের দিকে তাকাতেই দেখল কেলে ভূতটার পাশে আরেকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে, ঝুঁকে পড়ে দেখছে ট্রাকের নিচেটা। জ্বলন্ত বোল্টের আগুনের ভিতর দিয়ে সাইটে চোখ রাখল রানা। তারপর আস্তে করে চাপ দিল ট্রিগারে।

কাঁধে জোর ধাক্কা মারল বাঁটটা, গ্রাহ্য না করে একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো রানা, সোহানার বাড়ানো দুই হাতে তুলে দিল ক্রস বো-টাকে। ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে ওর ট্রাকের মাথার অনেক উপর দিয়ে উড়ে চলে গেছে জ্বলন্ত বোল্টটা।

নতুন ক্রস বো-টা পরখ করে দেখা হয়নি, বুঝতে পেরে তেতো হয়ে গেল রানার মন। সোহানার হাত থেকে প্রথম বো-টা নিল এবার। অসতর্ক হাতের আঙুলে আগুনের ছোঁয়া লাগল, বিকৃত হয়ে উঠল মুখটা। লক্ষ্য স্থির করার সময় চোখের ভুরু পিট পিট শব্দে পুড়ছে শুনতে পেল ও। বো স্ট্রিং রিলিজ হয়ে যেতেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল কাঁধে। এবারও ব্যর্থ হলো ও। ডানদিক ঘেঁষে রাস্তার উপর পড়ল বোল্টটা, পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে একরাশ খুদে বর্শার মত আগুনের ফুলকি সৃষ্টি করল।

ট্রাকের পাশে দাঁড়ানো লোক দু'জন ঘুরে দাঁড়িয়েছে খাদের দিকে। এদিকে হাত তুলে গলা ফাটাচ্ছে তারা। সোহানার হাত থেকে দ্বিতীয় বো-টা নিয়ে আবার লক্ষ্য স্থির করছে রানা। এটার প্রবণতা উপর দিকে উঠে যাওয়া, তাই খাদের ঠোঁটে লক্ষ্যস্থির করল ও। ট্রিগারে চাপ দিতে যাবে, একটা বুলেট ওর মাথার আধহাত উপরে এসে লাগল। চুলের নিচে কপালের চামড়া সামান্য একটু কেটে বেরিয়ে গেল একটা গ্র্যানাইটের টুকরো। চোখ বুজে গেল আপনাআপনি, এদিকে চাপ দিয়ে ফেলেছে ট্রিগারে ও।

সাথে সাথে চোখ খুলল রানা। আগুনের একটা সরল রেখা খাদের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে। লোক দু'জনের মাঝখান দিয়ে সোজা ট্রাকের নিচে গিয়ে ঢুকল সেটা।

দুপ্ করে ভরাট একটা আওয়াজ হলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা, দ্রুত ঢেকে ফেলছে ট্রাকটাকে। কেলে ভূতটাকে পড়ে যেতে

দেখল রানা। পরমুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়াল সে। কাপড়ে আগুন ধরে গেছে তার। এতদূর থেকেও তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার স্পষ্ট ভেসে আসছে, অন্ধের মত ছুটছে সে। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পায়নি রানা। ঘাড় ফিরিয়ে সোহানার হাত থেকে প্রথম বো-টা নিচ্ছে সে।

কিন্তু আরেকটা বোল্ট ছোঁড়ার সুযোগ হলো না রানার। একটা জীপের দিকে লক্ষ্যস্থির করার জন্যে সাইটে চোখ রেখেছে, এখনও হাত দেয়নি ট্রিগারে, আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ওকে ক্রস বো-টা। ধাক্কা খেয়ে শরীরটা ঘুরে যাচ্ছে রানার, দেখতে পাচ্ছে তির্যকভাবে উঠে যাচ্ছে একটা ফায়ার বোল্ট আকাশের দিকে। পরমুহূর্তে একটা পাথরে বাড়ি খেল মাথাটা।

তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

চোখ মেলে রানা দেখল সোহানার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে সোহানাকে, তার মাথা ধুয়ে দিচ্ছে। সোহানার পাশে উবু হয়ে বসে ঝুঁকে পড়েছেন রানার দিকে মিস জুডি, চোখেমুখে গভীর উদ্বেগ। রানাকে চোখ মেলতে দেখে হাসলেন তিনি, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আর কোন ভয় নেই।' পিছনে দাঁড়িয়ে হাতে একটা ক্রস বো নিয়ে জনসনের সাথে কথা বলছে রবিন, ওদের পিছনের আকাশে প্রকাণ্ড কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার। 'কিসে ধাক্কা খেয়েছি···?'

'চুপ,' দ্রুত বলল সোহানা। 'নড়ো না।'

দুর্বল হেসে মাথাটা একটু তুলল রানা। 'এই রবিন, শুনে যাও।'

দৌড়ে এল রবিন, তার সাথে আরও সবাই। 'কেমন বোধ করছ, রানা?' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল রবিন। তার পাশে লোপেজ। অপর পাশে জনসন।

'দেকি, দেকি,' ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে গিলটি মিয়া, হাতে খানিকটা তুলো আর ব্যান্ডেজ। তার পিছনে বেনেদেতা, হাতে অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট, তাতে গরম স্টু, ধোঁয়া আর গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সোহানার আপত্তি কানে না তুলে উঠে বসল রানা, রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছিল, বলো তো?'

হাতের ক্রস বো-টা দেখিয়ে বলল রবিন, 'রাইফেলের একটা বুলেট এটায় এসে লাগে, তাতে ভেঙে যায় স্টিরাপটা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ তুমি, রানা। বুলেটটা যদি লাগত, সাথে সাথে মারা যেতে। পাথরের সাথে ঠুকে গিয়েছিল মাথাটা, তাতেই তুমি জ্ঞান হারাও।'

'এবার বলো, কাজ কতটুকু হয়েছে?'

প্রশ্নটা করতে যা দেরি, একসাথে কথা বলে উঠল সবাই।

'কারও কথাই বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'একজন বলো।'

'এক নম্বর খবর,' বলল রবিন, 'লোপেজ এবার ব্রিজের একজন লোককে গুলি লাগাতে পেরেছে— একেবারে বুক ফুঁড়ে দিয়েছে বুলেট।'

হাসি চেপে লোপেজ বলল, 'কিন্তু গুলি করেছিলাম বুক লক্ষ্য করে নয়, মাথা লক্ষ্য করে,' একটু বিরতি নিল সে, তারপর বলল, 'তাও দ্বিতীয় লোকটার।'

না হেসে পারল না কেউ।

'ট্রাকের কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা। 'আগুন ধরেছে, এইটুকু দেখেছিলাম আমি।'

'ট্রাকটা গেছে। এখনও জ্বলছে সেটা। শুধু তাই নয়, ওপাশের পেট্রল ট্যাঙ্কটা ফেটে যাবার সময় পাশের জীপটাতেও আগুন ধরে গেছে। পিঁপড়ের মত ছুটোছুটি করছে এখনও ওরা। ট্রাকের পাশে দাঁড়ানো দু'জন লোকই আগুনে পুড়ে মারা গেছে।'

'ট্রাকের সব টিম্বারও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,' বলল জনসন।

'একটা ট্রাক, একটা জীপ হারিয়েছে ওরা,' বলল রবিন, 'আরেকটা জীপের আশা ছেড়ে দিয়েছে। ট্রাকটা জ্বলছে, তাই ব্রিজের পাশ থেকে সেটাকে ওরা পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। বাকি সব যানবাহন আধ মাইল পিছিয়ে নিয়ে গেছে ওরা, রাস্তাটা খাদের পাশ থেকে সরে গিয়ে বাঁক নিয়েছে যেখানে। সেই থেকে একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়ছে, বোঝা যাচ্ছে গোলাবারুদের কোন অভাব নেই ওদের।'

'আমাদের মধ্যে আহত হয়েছে কেউ?'

'শুধু তুমি।'

নিজের মাথায় হাত দিল রানা, একটা পাশ ফুলে সুপুরি হয়ে আছে, অনুভব করল ও। 'শুধু ফুলে গেছে,' সোহানাকে বলল ও, 'রক্ত বেরোয়নি—ব্যান্ডেজের দরকার নেই, কি বলো?'

'তা নেই,' বলল সোহানা। 'কিন্তু মাথায় এই চোট নিয়ে পাহাড়ে ওঠা চলবে না তোমার। হয় তোমার বদলে অন্য কেউ যাবে, না হয় দু'দিন পর রওনা হবে তুমি।'

কোনটাই সম্ভব নয়, জানে রানা। পাহাড়ে চড়ার মত কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার সামর্থ্য লোপেজ আর তার ছাড়া কারও নেই এখানে। লোপেজের সাথে তাকেই যেতে হবে। এবং রওনা হতে হবে আজই। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না। কিন্তু এসব কথা বলে সোহানাকে এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন করে তুলতে চায় না ও। দ্বিমত প্রকাশ করলে হয়তো চটিয়েও দেয়া হবে। তার ফল ভাল হবে না। এমন ভাব করল রানা যেন তার কথা মতই সব হবে।

'গিরিপথ পেরোবার সত্যি কোন দরকার আছে কিনা তাও আমাদেরকে নতুন করে ভেবে দেখতে হবে,' বলল জনসন। 'আজ তিনজন খুন হয়েছে শত্রুরা। আগুনে পুড়ে আহত হয়েছে কমপক্ষে আরও তিনজন। ট্রাকের ওপর কাঠ যা ছিল সব শেষ। ওরা যদি লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় একটুও অবাক হব না আমি।'

'এখন ওরা কি করবে সেটা দেখার বিষয় বটে,' বলল রবিন।

'উচিত শিক্ষা হয়েছে...'

'আজকে ফজরের নামাজের সময় মোনাজাতে বসে ওদের তিনজন লোককে চেয়েছিলুম,' গভীর অনুশোচনার সুরে বলল গিলটি মিয়া। 'দোয়া কবুল হবে জানলে সবগুলোকে...'

এই প্রথম কথা বললেন সিনর বরগুয়িজ, 'সিনর রানা, তোমার বুদ্ধি আর তৎপরতার প্রশংসা করি। কোন সন্দেহ নেই ওদের মধ্যে তুমি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে

পেরেছ।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'সবাই একটু ভুল ধারণা পোষণ করছেন। যা করতে পেরেছি তার ফলে শুধু কিছু সময় লাভ হয়েছে আমাদের, তার বেশি কিছু নয়। এর মধ্যে কল্পনাবিলাসের কিছুই নেই। বিপদটা যেমন ছিল, ভয়াবহ চেহারা নিয়ে এখনও তেমনি রয়েছে। আমার ধারণা, ওরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েনি, ওদেরকে বরং আমরা খোঁচা মেরে আরও খেপিয়ে তুলেছি। এবার মরিয়া হয়ে উঠবে ওরা।' রবিনের দিকে তাকাল ও। 'পাহারায় একজনকে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে পুকুর পাড়ে এসো। কথা আছে।'

সবাই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বোকার মত চেয়ে আছে রানার গমন পথের দিকে।

জনসনকে পাহারায় রেখে সবাইকে নিয়ে চলে এল রবিন পুকুর পাড়ে। দেখল গা ঘেঁষে বসে বোঝাবার ভঙ্গিতে কি যেন বলল রানা সোহানাকে, সায় দিয়ে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে একটু সরে বসল সোহানা।

মুখ তুলে লোপেজের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'তুমি বলেছ একটা দিন কেবিন ক্যাম্পে, আর একটা দিন মাইনে কাটাতে হবে আমাদেরকে। এই দুটো দিন নষ্ট না করলেই কি নয়?'

'নষ্ট?' বলল লোপেজ। 'পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্যে এই দুটো দিন বিরতি নেয়া একান্ত প্রয়োজন। কোথাও না থেমে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে মারা গেছে বহু লোক, সে ঝুঁকি যদি নিতে চাও, আলাদা কথা।'

'পাহাড় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তুমি, তোমার কথার ওপর কথা বলা সাজে না আমার,' বলল রানা। 'গিরিপথ পেরিয়ে ওপারে যেতে ক'দিন লাগবে?'

'দু'দিন,' বলল লোপেজ। হঠাৎ গম্ভীর হলো সে। তারপর আবার বলল, 'যদি দু'দিনের বেশি সময় নিই আমরা, কোনদিন পৌছতে পারব না।'

'মানে?'

'ওখানে যা ঘটছে,' পেশীবহুল একটা হাত তুষার মোড়া পর্বতশৃঙ্গগুলোর দিকে তুলল লোপেজ, 'কোন মানুষ তার সাথে বড়জোর দু'দিন যুঝতে পারে, তার বেশি নয়।'

'চারদিন গেল,' বলল রানা। 'আমরা বিপদে পড়েছি একথা বোঝাতে ধরো আরেক দিন লাগবে, আরও একটা দিন ধরো সাহায্য নিয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে। তার মানে,' রবিনের দিকে তাকাল রানা, 'ছয়দিন বা তারও বেশি ব্রিজের ওপারে ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওদেরকে তোমার। পারবে?'

'পারতেই হবে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল রবিন। 'একটা দিন ইতিমধ্যেই লাভ করেছি আমরা। সব কাঠ পুড়ে গেছে ওদের, কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল পিছিয়ে গিয়ে আবার তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে ওদেরকে। ট্রাকও হয়তো যোগাড় করতে হবে একটা। প্রচুর সময় লাগবে এসবে।'

'কিন্তু ছয়টা দিন ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখা সহজ নয়,' চিন্তিতভাবে বলল রানা।

'আমার ওপর আস্থা রাখো,' বলল রবিন। 'সবাই মিলে ওদেরকে আমরা

ঠিকই দমিয়ে রাখব। গিলটি মিয়া রয়েছে আমাদের দলে, ও একাই একশো। রয়েছে সোহানা, আমাকে ইতিমধ্যেই কিছু আইডিয়া ধার দিয়েছে ও। কোনালির মত প্রতিভাকে পাচ্ছি আমরা, পাচ্ছি জনসনের মত যাদুকরকে। না, রানা—আমাদেরকে তুমি ছোট করে দেখো না। আমি ভাবছি তোমাদের কথা...'

'আমিও সে কথা ভাবছি,' বললেন মিস জুডি। 'জেনারেল মোয়াজার সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে?'

'কোথায়, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে,' বললেন সিনর বরগুয়িজ, 'তা ওদেরকে বলে দেব আমি। লোপেজ মোটামুটি জানে সব। তোমাদেরকে আলটিমিরোস পর্যন্ত নাও যেতে হতে পারে।' লোপেজের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর বললেন, 'আমি এয়ারফিল্ডের কথা বলতে চাইছি।'

'বুঝেছি,' বলল লোপেজ। ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল তার মধ্যে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে।'

'এয়ারফিল্ডের ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'আলটিমিরোসের এদিকের পাহাড়ে একটা হাই-লেভেল এয়ারফিল্ড আছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'এটা একটা সামরিক ঘাঁটি, ফাইটার স্কোয়াড্রনগুলো পালাক্রমে ব্যবহার করে। সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার ফাইটার এয়ারক্র্যাফটের চারটে স্কোয়াড্রন আছে—এইটথ, টেনথ, ফোরটিনথ এবং টোয়েনটি-ফার্স্ট স্কোয়াড্রন।' দম নেবার জন্যে একটু থামলেন সিনর বরগুয়িজ। 'সন্ত্রাসবাদীদের মত আমরাও সশস্ত্রবাহিনীতে আমাদের নিজস্ব লোক রেখেছি। ফোরটিনথ স্কোয়াড্রনটা আমাদের। এইটথ স্কোয়াড্রনে সন্ত্রাসবাদীদের লোকই বেশি। বাকি দুটোয় এখনও মোয়াজার প্রভাব খাটছে।'

'এয়ারফিল্ডে গিয়ে ফোরটিনথ স্কোয়াড্রনকে নাও পেতে পারি,' বলল রানা। 'যাই হোক, কার সাথে যোগাযোগ করব আমরা?'

'ফোরটিনথ স্কোয়াড্রনের কমান্ডান্টের সাথে। কর্নেল কডরিগুয়েজ আমার একজন পুরানো এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু! সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'যদি পাই তাকে,' বলল রানা, 'তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, আমাদের ব্যাপারটা মিটল।' কোনালির দিকে তাকাল ও। 'এই যে, ডক্টর ফিটফাট, তোমার মধ্যযুগের ভাঁড়ারে আর কোন যাদু ই-চেরাগ আছে নাকি?'

খালি পাইপটা একমনে টানছে কোনালি। ঘড় ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে শুধু, ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই। কি যেন চিন্তা করছিল সে, রানার কথা শুনে ঘাড় ফেরাল, মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে বলল, 'আছে মানে? একশোবার আছে!' চোখ ইশারায় খাদের দিকটা দেখাল সে। 'টিম্বার যোগাড় করে এবার ওরা আরও সাবধানে, আঁটঘাট বেঁধে ব্রিজ মেরামত করার চেষ্টা চালাবে। আমাদের ক্রস বো-র বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই এখন, আমাদের একটা ট্রেঞ্চ মর্টার দরকার।'

'কি দরকার?' চোখ কপালে উঠে গেল রানার।

ঘন ঘন পাইপ টেনে ঘড় ঘড় শব্দ বের করল কোনালি। নির্লিপ্ত ভাবে বলল, 'ট্রেঞ্চ মর্টার।'

'ডক্টর ফিটফাট, তোমার মাথার ঠিক আছে তো?'

প্রশ্নটাকে গুরুত্বই দিল না কোনালি। বলল, 'জনসনের সাথে কথা হয়েছে, বলেছে, তৈরি করতে পারবে সে। আমরা কয়েকজন সাহায্য করব তাকে।'

'ট্রেঞ্চ মর্টার...বিস্ফোরক পাবে কোথায়?' বিদ্রূপের সুরে বলল রানা। 'দিয়াশলাইয়ের কাঠি থেকে নেবে নাকি?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, রানা,' নিরীহদর্শন প্রফেসর শান্তভাবে বলল, 'আধুনিক ট্রেঞ্চ মর্টারের মধ্যযুগীয় বিকল্পের কথা বলছি আমি। আমাদের এমন একটা মেশিন দরকার যেটা মিসাইল ছুঁড়তে পারে। মেশিন থেকে বেরিয়ে খুব উঁচু দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাবে মিসাইলটা, আকাশ থেকে পড়বে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ বেড়ার ওপারে। এই ধারণার সাথে পাগলামির কোনও সম্পর্ক নেই। আধুনিক যুদ্ধ-শিল্পের এটা কোন নতুন কৌশল নয়, এই কৌশলের জন্ম হয়েছে মধ্যযুগে। আসলে যুদ্ধের সমস্ত কৌশলই তাদের জানা ছিল।'

হাতের খালি পাইপটার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে কোনালি। আবার বলল, 'সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে মধ্যযুগের হাতিয়ারগুলো আজকের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। ওনাজার এই পরিস্থিতিতে কোন কাজে লাগবে না। ম্যানগোনেল এবং ব্যালিস্টার কথাও ভেবেছি আমি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি আসলে আমাদের একটা ট্রিবুসেট দরকার। ব্যালিস্টার মতই এটা একটা সামরিক অস্ত্র—আধুনিক ট্রেঞ্চ মর্টারের মধ্যযুগীয় নাম—ট্রিবুসেট। এর শক্তির উৎস গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ। খুবই চমৎকার একটা হাতিয়ার। শত্রুদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হবে। চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেয়া এই হাতিয়ারের একটা অন্যতম প্রবণতা।'

ক্রস বো-র সাফল্যের কথা ভেবে কোনালিকে পাগল ঠাউরানো থেকে বিরত রাখল রানা নিজেকে। যদিও লোকটাকে সৃষ্টিছাড়া পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবা খুবই মুশকিল। বলল, 'তোমার এই ট্রেঞ্চ মর্টার কি ধরনের মিসাইল ছুঁড়বে?'

'পাথরের কথা ভাবছি আমি,' খালি পাইপটা আবার টানতে শুরু করল কোনালি, অত্যন্ত বিরক্তিকর শব্দ বেরুচ্ছে সেটা থেকে। রানার ভুরু কোঁচকানো দেখে তাড়াতাড়ি মুখ থেকে নামাল সেটাকে। তারপর আবার বলল, 'অতি সাধারণ যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে হাতিয়ারটা তৈরি করব আমরা। মধ্যযুগের চেয়ে আমাদের এটা অনেক উন্নতমানের হবে, কারণ আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ওদের চেয়ে বেশি। জনসনের বিশ্বাস এই হাতিয়ারের সাহায্যে একটা বিশ পাউন্ড ওজনের পাথরকে দুশো গজ দূরে ছুঁড়ে দেয়া যাবে অনায়াসে।'

হৈ হৈ করে উঠল সবাই। উৎসাহে বাহবা দিচ্ছে কেউ, আবার অবিশ্বাসে মাথা নাড়তেও দেখা গেল দু'একজনকে।

'বাজি মেরে দিয়েচি!' রানার পিছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মিস জুডি আর তার নিত্যসঙ্গী গিলটি মিয়া। কোনালি থামতেই রানাকে লুকিয়ে মিস জুডির কোমর ধরে একপাক নেচে নিল গিলটি মিয়া।

'যদি চাই,' বলল কোনালি, 'ব্রিজটার এখানে সেখানে আরও কয়েটা ফাঁক তৈরি করতে পারব আমরা।'

'তৈরি করতে কি রকম সময় লাগবে?' আগের চেয়ে নরম হয়ে এসেছে রানার স্বর।

'বারো ঘণ্টার বেশি নয়,' বলে মুখে আবার পাইপ তুলে বিশ্রী শব্দ ছাড়তে শুরু বরল কোনালি।

পকেটে হাত ভরে চুরুটের বাক্সটা বের করল রানা, শেষ ক'টা চুরুট থেকে একটা কোনালিকে দিয়ে বলল, 'পাইপটা রেখে দিয়ে এটা টানো, এটা তোমার প্রাপ্য।'

খুশি হয়ে হাসল কোনালি। চুরুট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'ধূমপানের সময় বুদ্ধি খুলে যায় আমার।' হঠাৎ কি মনে করে গম্ভীর হলো সে। বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমি, আমাদের মধ্যে একজন চোর লুকিয়ে আছে।'

'চোর?'

'হ্যাঁ,' বলল কোনালি। 'কেবিন ক্যাম্পে ঘটেছে ব্যাপারটা। কে কি মনে করবে ভেবে কথাটা আমি প্রকাশ করিনি। আমার একটা পাইপ আর এক কৌটো তামাক চুরি হয়েছে।'

'চোর কে তা আমি অনুমান করতে পারছি,' বলল রবিন। 'হাতেনাতে ধরতে পারলে আমি তার বারোটা বাজাব।'

'আমার সব চুরুট দিয়ে দেব তোমাকে, তুমি যদি অ্যাটম বোমার মধ্যযুগীয় সংস্করণ আবিষ্কার করতে পারো, ডক্টর ফিটফাট,' বলল রানা।

'ওতে গানপাউডার লাগে,' চিন্তিত এবং গম্ভীর হয়ে উঠে বলল কোনালি। 'আমি মনে করি এই মুহূর্তে সেটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে।'

'ট্রিবুসেট তৈরি করতে ক'জনের সাহায্য লাগবে?'

'হাতের কাজে আমি তেমন ভাল নই,' ধোঁয়ার আড়াল থেকে বলল কোনালি। 'আমার সব আঙুলই বুড়ো আঙুল। শত্রুদের ওপর নজর রাখার জন্যে আমি আর রবিন থাকছি, তোমরা জনসনকে নিয়ে কেবিন ক্যাম্পে চলে যাও। কিভাবে কি করতে হবে সব জানা আছে জনসনের, আমাকে ওর দরকার নেই।'

লোপেজের দিকে তাকাল রানা।

'একদিন তো এমনিতেও কেবিন ক্যাম্পে থাকতে হবে আমাদেরকে,' বলল লোপেজ। 'সময়টা মেশিন তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে।'

পুকুর পাড় থেকে উঠে দাঁড়াল রানা, রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমরা চলে যাবার পর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুমি নিচ্ছ। যা ভাল বুঝবে করবে। দরকার হলে পরামর্শ চাইবে সোহানার, এ-ধরনের সংকটের ব্যাপারে ও একজন বিশেষজ্ঞ।'

প্রশংসার সুরে বলল রবিন, 'সে আমি আগেই টের পেয়েছি। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পরামর্শ ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি আমি। কিন্তু ভয় পাচ্ছি মিলারকে। তোমরা নেই দেখে ও হয়তো বাড়াবাড়ি শুরু করবে।'

একটু চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'যথাসম্ভব সাবধান থাকবে ওর ব্যাপারে। নিরাপত্তার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিলে সবার সম্মতি নিয়ে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তুমি ওর ব্যাপারে।'

হঠাৎ মৃদু কণ্ঠে সিনর বরগুয়িজ বললেন, 'সেই প্রশ্নটা আবার আমি করতে চাই। আমাকে পাবার বিনিময়ে সন্ত্রাসবাদীরা যদি সিনর রবিনের সাথে একটা আপোষে আসতে চায়, তখন কি হবে?'

'এ-ধরনের কোন প্রস্তাব যদি দেয় ওরা,' রবিনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিচ্ছে রানা, 'ধরে নেবে প্রস্তাবটার মধ্যে ভাঁওতা আছে। ওদের চারজন লোককে খতম করেছি আমরা, এই অবস্থায় আপোষ ওরা করতেই পারে না।' সিনর বরগুয়িজের দিকে তাকাল ও। 'সুতরাং, চিন্তা করার কিছু নেই আপনার।' রবিনের দিকে আবার তাকাল ও। 'সম্ভাব্য যে-কোন পরিস্থিতিতে কখন কি করতে হবে না হবে সব আমি বুঝিয়ে বলে দিয়েছি সোহানাকে, সময় এবং প্রয়োজন মত জানতে পারবে ওর কাছ থেকে।' একে একে সবার দিকে তাকাল এবার রানা। 'আমরা রওনা হবার আগে কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

কেউ কিছু বলল না।

কেবিন ক্যাম্পে উঠতে কষ্ট হচ্ছে রানার। মাথায় যেখানে আঘাত লেগেছে সেখানে অসহ্য ব্যথা। অক্সিজেনের অভাবে ওরই বেশি অসুবিধে হচ্ছে, সারাক্ষণ হাঁপাচ্ছে ও। অপেক্ষাকৃত কম হাঁপাচ্ছে লোপেজ। জনসন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে। পনেরো মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। 'সিনর জনসনকে দেখে প্রমাণ পাচ্ছি অ্যাকলিম্যাটাইজেশনের গুণ,' বলল লোপেজ। 'কেবিন ক্যাম্পে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছে ও, নতুন আবহাওয়া সয়ে গেছে ওর, তাই আমাদের মত ভুগতে হচ্ছে না ওকে।'

সায় দিয়ে বলল জনসন, 'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, নিচে ব্রিজের দিকে নেমে যাবার সময় মনে হয় সী-লেভেলে নেমে যাচ্ছি, অথচ ব্রিজটা সী-লেভেল থেকে বারো হাজার ফিট ওপরে রয়েছে।'

'ক্যাম্পটা কত উঁচুতে?' জানতে চাইল রানা।

'সাড়ে চোদ্দ হাজার ফিট,' বলল লোপেজ। 'মাইনটা আরও আড়াই হাজার ফিট ওপরে।'

তুষার ঢাকা চূড়াগুলোর দিকে তাকাল রানা। একটা ঢোক গিলে বলল, 'আর গিরিপথটা উনিশ হাজার ফিট ওপরে। বেহেশতের একেবারে কাছাকাছি।'

ঠোঁটের একদিকের কোণ বেঁকে গেল লোপেজের। 'বেহেশত নয়, সিনর রানা—ওটা একটা ঠাণ্ডা দোজখ।'

ক্যাম্পে পৌঁছে চেঁচামেচি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না মিলারের। খোঁজাখুঁজি করতে শেষ পর্যন্ত একটা কেবিনে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে, পাশেই পড়ে আছে খালি একটা মদের বোতল, চকলেটের খালি দুটো বাক্স, টোবাকো পাইপ, তামাকের কৌটো।

'কোন একটা ঘরে মদ আছে,' জনসনকে বলল রানা। 'হয় সেটায় তালা মেরে দাও, না হয় ভেঙে ফেলো সব বোতল।'

কেবিনের শেলফে ছোট একটা লেদার ব্যাগ দেখে আগ্রহের সাথে সেটা হাতে নিল লোপেজ। 'পেয়েছি,' বলল সে। ব্যাগ থেকে কয়েকটা ম্লান সবুজ রঙের

শুকনো পাতা বের করল সে।

'কি ওগুলো?'

'কোকা পাতা। পাহাড় টপকাবার সময় খুব উপকার দেবে।'

'কোকা?'

'এর আরেক নাম অ্যান্ডেজের অভিশাপ,' বলল লোপেজ। 'এ থেকেই কোকেন হয়। সাংঘাতিক নেশার জিনিস, এর খপ্পরে পড়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার ভবিষ্যৎ। সিনর বরগুয়িজ ক্ষমতায় এলে কোকার চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন।'

'কিন্তু কোকা পাতা দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে?'

'এ-ধরনের আরেকটা ব্যাগে সাদা পাউডার পাও কিনা খুঁজে দেখো,' বলল লোপেজ। শেলফের এটা সেটা নাড়ছে সে। 'গরীব, ধনী—সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার সবাই কোকা চিবায়। যে-কোন খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে সস্তা কিনা।'

'নিশ্চয়ই খাবারের বিকল্প নয় জিনিসটা?'

'এটা অ্যানাসথেটিক হিসেবে কাজ করে,' বলল লোপেজ। 'পেটের ভেতর দিকের দেয়ালের গা সম্পূর্ণ অসাড় করে ফেলে, যার ফলে খিদে বলে কোন অনুভবের অস্তিত্বই থাকে না। ক্ষুধার্ত মানুষ করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই, তাই না? সর্বহারারা পেটের জ্বালা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে এটা খায়। কোকা নারকোটিকও বটে, ধনীরা খায় নেশা করার জন্যে।'

সাদা পাউডার ভর্তি একটা ব্যাগ পেয়ে লোপেজকে দেখাল রানা। 'এটা খুঁজছ তুমি?'

রানার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ভিতরটা দেখল লোপেজ। 'হ্যাঁ। এটা লাইম। কোকেন একটা অ্যালকালয়েড, তাই এর একটা বেস দরকার।'

একটা পিরিচে কোকা পাতা নিয়ে চামচের উল্টোপিঠ দিয়ে গুঁড়ো করতে শুরু করল লোপেজ। মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে শুকনো খড়খড়ে পাতাগুলো। একেবারে পাউডার বানিয়ে ছাড়ল সেগুলোকে লোপেজ। তারপর মেশাল লাইম। দুটো জিনিসকে মিশিয়ে এক করে ফেলল সে, খালি একটা ক্যানে সবগুলো ঢেলে এবার পানি মেশাল, চামচ দিয়ে নাড়তে শুরু করল যতক্ষণ না হালকা সবুজ রঙের মণ্ডের মত দেখতে হলো জিনিসটা। বাইরে গিয়ে দুটো পাথর নিয়ে এল সে। একটা পিঁড়ির মত সমতল, মসৃণ, আরেকটা বেলনার মত লম্বা এবং গোল। রুটি বেলার মত সবুজ মণ্ডটা বেলতে শুরু করল সে, তারপর ছোট ছোট চারকোনা করে কেটে নিল পকেট-নাইফ দিয়ে। বলল, 'বাকি থাকল শুধু রোদে ফেলে শুকিয়ে নেয়া। পাহাড়ে চড়তে খুব কাজ দেবে। সহনক্ষমতা বাড়াতে এর তুলনা হয় না। সেন্ট্রাল কর্ডিলেরার যে-কোন গ্রামে যাও তুমি, দেখবে বুড়িরা বসে বসে এই বিস্কিট তৈরি করছে।'

ওয়র্কশপ থেকে ফিরে এল জনসন। 'লোহা লক্কড় যা আছে তা দিয়ে অনায়াসে একটা ট্রিবুসেট তৈরি করা সম্ভব।'

'কিন্তু কাজ শুরু করার আগে ভরপেট খেতে চাই আমি,' বলল রানা।

স্টুর ক্যান খুলে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করল জনসন। খেতে বসে বলল

রানা, 'এবার, বলো দেখি—ট্রিবুসেট জিনিসটা আসলে কি?'

উৎসাহের সাথে টাক নাড়ল জনসন, পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে বলল, 'কিস্যু না, জিনিসটা লিভারের একটা অ্যাপ্লিকেশন মাত্র। সি-স, বাচ্চাদের খেলার জিনিস, দেখেছ তো? একটা লম্বা কাঠের এ প্রান্তে একজন, ও-প্রান্তে আরেকজন বসে থাকে—কাঠের মাঝখানটা ঠেকে থেকে মাটি থেকে বেশ একটু উঁচু কোন পাথর বা অন্য কিছুর সাথে। পালাক্রমে কাঠের দুই প্রান্ত ওঠানামা করে। ট্রিবুসেট ওই সি-স-র মতই একটা ব্যাপার। এইরকম, এঁকে দেখাচ্ছি,' নরম পাইন কাঠের টেবিলের উপর দ্রুত স্কেচ আঁকতে শুরু করল জনসন। 'এখানে এটা পিভট। একটা বাহু, ধরো, অপরটার চেয়ে চারগুণ লম্বা। ছোট বাহুতে, মনে করো পাঁচশো পাউন্ড ওজন চাপালে, এবার অপর প্রান্তে রাখো তোমার মিসাইলটা—বিশ পাউন্ড ওজনের একটা পাথর।'

হিসাব কষতে শুরু করল জনসন, সেই সাথে থেমে থেমে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে, 'মধ্যযুগের ওরা ঠেকে শিখে, অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করত—এনার্জি সম্পর্কে আমাদের মত নিখুঁত জ্ঞান তাদের ছিল না। পাঁচশো পাউন্ড ওজন ঝপ করে, ধরো, দশ ফিট নিচে পড়বে। এই ওজনটাকে টেনে নামাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কি রকম সময় লাগবে বলে মনে করো? সবুর, এর মধ্যে ভগ্নাংশ পরিমাণ সময় নষ্ট হবে পিভটের খাতে। এরপরও, মাত্র আধ সেকেন্ড লাগবে পড়তে। তার মানে? আধ সেকেন্ডে পাঁচ হাজার ফুট-পাউন্ড, এক মিনিটে ছয় লাখ ফুট-পাউন্ড—তার মানে দীর্ঘ বাহুর শেষ প্রান্তের বিশ পাউন্ড ওজনের পাথরটাতে তক্ষুণি আঠারো হর্স-পাওয়ারের প্রচণ্ড টান পড়বে।'

অবাক হয়ে শুনছে ওরা।

'পাথরটার গতিবেগ কি হবে জানো? দাঁড়াও, বলছি। দুটো বাহুর একটা আরেকটার চেয়ে চারগুণ বড়, তাহলে…' থেমে গিয়ে টেবিলে টোকা মারছে জনসন, তারপর নিঃশব্দে হেসে বলল, 'এটাকে মাজল ভেলোসিটি বলতে পারো, যদিও মেশিনটার কোন মাজল নেই। প্রতি সেকেন্ডে এর মাজল ভেলোসিটি হবে আশি ফিট।'

'রেঞ্জ কম বেশি করার উপায় থাকবে?'

'অবশ্যই,' বলল জনসন। 'হালকা পাথর যতদূর যাবে ভারী পাথর ততদূর যাবে না। দূরত্ব কমাতে চাইলে ভারী পাথর ব্যবহার করবে তুমি। পাথর বাছাই এবং কেটে-ঘষে সাইজ মত করে নেবার একটা কাজও রয়েছে আমাদের ঘাড়ে।'

'মেশিনটা তৈরি করার মত প্রয়োজনীয় মালমশলা আছে বলছ?'

'আছে। ভাঙা একটা ট্রাকের ব্যাক অ্যাক্সেল হবে পিভট। একটা কেবিনের কড়িকাঠ দিয়ে বানাব দুটো বাহু। লম্বা বাহুটার শেষ প্রান্তে থাকবে মিসাইল রাখার জন্যে একটা বালতি, সেটা ভাল করে বেঁধে নিলেই হবে। গোটা মেশিনটার জন্যে একটা মঞ্চ দরকার হবে, সে-ব্যাপারে পরে চিন্তা করলেও চলবে।'

স্কেচটার দিকে চোখ রেখে বলল রানা, 'বেশ বড় এবং ভারী হতে যাচ্ছে জিনিসটা। নামিয়ে ব্রিজের কাছে নিয়ে যাবার কি উপায়?'

'কেন, তৈরি করার পর মেশিনটার সব পার্টস খুলে ফেলব। সবগুলো

অ্যাক্সেলটার ওপর চাপিয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নামিয়ে ফেলব।'

'চমৎকার!'

'আমার কোন বাহাদুরি নেই এর মধ্যে,' টাকে হাত বুলিয়ে বলল জনসন। 'সব কৃতিত্ব কোনালির। মানুষ খুন করার আশ্চর্য একটা প্রবণতা রয়েছে ওর মধ্যে।' হাসছে সে। 'মানুষ মারার আরও কত রকমের কৌশলই যে জানা আছে ওর, শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। আচ্ছা, গ্রীক ফায়ারের নাম শুনেছ কখনও?'

'আবছাভাবে।'

'কোনালি বলতে চায় এই গ্রীক ফায়ার আর আধুনিক নাপাম বোমা প্রায় একই জিনিস। প্রাচীন নৌ-যোদ্ধারা নাকি তাদের যুদ্ধ-জাহাজের বো-তে আগুন নিক্ষেপক মেশিন বসিয়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে এই নাপাম বোমা ছুঁড়ত। এ লাইনে চিন্তা করে তেমন সুবিধে করতে পারিনি আমরা।' স্কেচটার দিকে আরেকবার তাকাল জনসন। মাথার টাকটা চুলকে নিয়ে আবার বলল, 'কোনালি কি বলেছে জানো? আমাদের এই মেশিনটা নাকি সে-যুগের তুলনায় কিছুই নয়। শহর ঘিরে ফেলে পাঁচিলের ওপারে মরা ঘোড়া ছুঁড়ত তারা, যাতে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয়। একটা ঘোড়ার কত ওজন হতে পারে?'

'মধ্যযুগের ঘোড়াগুলো বোধহয় খুব ছোটখাট হত,' চোখ মটকে বলল লোপেজ।

'সশস্ত্র একজন লোককে বইতে পারে এমন একটা ঘোড়া কতই বা হালকা হতে পারে?' বলল জনসন। 'চলো এবার, কাজে হাত লাগানো যাক। আবার আমি সারারাত জাগতে পারব না।'

খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের। উঠে দাঁড়াল লোপেজ, মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছে মিলার, এখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। বিরূপ দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাল সে। মুচকি একটু দুষ্ট হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢেলে কাজ শুরু করা যেতে পারে।'

সাত

রানা আর লোপেজ চলে যাবার পর বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল রবিন। তাকে অভয় এবং উৎসাহ দেবার জন্যে কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে কাজে নেমে পড়ল সোহানা।

পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা, খাদের ওপারে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ করছে। দেখা না গেলেও, আগুন এখনও নেভেনি, কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ মোচড় খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। ব্রিজের পাশে দাঁড়ানো জীপটাকে ইচ্ছে করলেই ধ্বংস করে ফেলা যায়, ক্রস বো এবং গিলটি মিয়া যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এ-কাজে কোন সমস্যাই নেই—কিন্তু শত্রুদের সামান্য একটা ক্ষতি করে নিজেদের শক্তি এবং সম্পদ অপচয় করা উচিত হবে না.

আলোচনা করে স্থির করল ওরা।

এর আগে খাদের কিনারা ধরে ভাটির দিকে আধমাইল গিয়ে ওপারে যেখানে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা ঠিক তার উল্টোদিকে বসে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ করে এসেছে ওরা। সোহানার ধারণা প্রতিপক্ষ বোকা হয়ে গেছে একটি মাত্র কারণে, তা হলো আক্রমণটা ছিল অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত এবং এর ধরনটা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত—একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ওরা। সোহানার এই বক্তব্য সমর্থন করে রবিন বলেছে, ব্রিজ মেরামত করার জন্যে এবার ওরা আঁটঘাট বেঁধে এগোবে।

ব্রিজের কাছের লোকগুলো এখন সাংঘাতিক সতর্ক এবং সাবধান। অন্যমনস্কভাবে একবার মাথা তুলে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে রবিন। সোহানা তার ঘাড় ধরে নিচের দিকে না টানলে কি হত ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে বারবার। মাথাটা পাথরের ইঞ্চি পাঁচেক উপরে উঠেছিল, অমনি পাথরটার সমতল গা চেঁছে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। সোহানা যদি সময় মত ওর ঘাড়ে হাত না দিত, ঠিক দুই সারি দাঁতের মধ্যে দিয়ে মুখের ভেতর ঢুকে যেত বুলেটটা।

বেনেদেতার সঙ্গ এড়িয়ে চলছে রবিন, ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়ায়নি সোহানার। ওদিকে কঠিন একটা ব্যারাম বাধিয়ে বসেছে বেনেদেতা তার বুকে। রবিনের সাথে চোখাচোখি হলেই মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে তার, লাল হয়ে উঠছে, দৃষ্টি এড়ায়নি সোহানার। রবিন সম্পর্কে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে মেয়েটা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার সুযোগ নেই বেচারীর। এক অর্থে, এটাকেও একটা সমস্যা বলে মনে করছে সোহানা। যখনই হোক, এর একটা সমাধান করে দেবার ইচ্ছে রাখে সে।

ব্রিজের মাঝখানে বারো ফিট ফাঁকটার দিকে চোখ রেখে হঠাৎ মনে হলো সোহানার, আগুনের সাহায্যেই সম্ভবত ব্রিজটাকে পুড়িয়ে দেয়ার একটা আয়োজন করা যেতে পারে।

'ক্যাম্পে দুই ড্রাম প্যারাফিন আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'চল্লিশ গ্যালনের দুটো ড্রাম। আমিও ভাবছি, অন্তত একটা ড্রাম যদি নিয়ে আসা যায় কেবিন ক্যাম্প থেকে, ব্রিজটাকে পোড়াবার একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'কিভাবে?' একশো গজ দূরের ব্রিজটার দিকে চোখ রেখে বলল সোহানা। 'আগুন ধরিয়ে ড্রামটাকে গড়িয়ে দিতে চাও?'

'ঠিক মত গড়িয়ে দিলে ব্রিজে গিয়ে উঠতেও পারে,' বলল রবিন।

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বলল সোহানা। 'ড্রামটা তাহলে নামিয়ে আনতে হয়। পারবে?'

'আমি যাব?'

'কোনালির দ্বারা এ-কাজ হবে না,' বলল সোহানা। 'বেনেদেতাকে এমনিতেই যেতে হচ্ছে কেবিন ক্যাম্পে, ওকে নিয়ে তুমিই যাও।'

'বেনেদেতাকে যেতে হচ্ছে কেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের।

'এক স্টু আর কত খাওয়া যায়,' বলল সোহানা। 'ওখানে গিয়ে নতুন কিছু থাকলে নিয়ে আসুক বেনেদেতা।'

'সেজন্যে ওকে কেন যেতে হবে, আমিই পারব।'

'বাজে বকো না,' মৃদু ধমক মারল সোহানা। 'এসব মেয়েদের ব্যাপার, তুমি কি বুঝবে? কি রাঁধতে হবে না হবে বেনেদেতাই ভাল বুঝবে, ওরই যাওয়া দরকার।'

তর্ক করে লাভ নেই বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল রবিন।

পাহাড়ে চড়তে কষ্ট হচ্ছে রবিনেরও। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে হাত ধরে টেনে তাকে দাঁড় করাল বেনেদেতা, বলল, 'রসো, একটু জিরিয়ে নিই।'

উঁচু একটা পাথরে বসে পড়তে যাচ্ছিল রবিন, তাকে বাধা দিল বেনেদেতা। হাত তুলে আরও বড় এবং সমতল একটা পাথর দেখাল সে। দু'জন এগিয়ে গেল সেদিকে। 'শুয়ে পড়ো,' বলল বেনেদেতা। 'হাঁপিয়ে গেছ তুমি।'

আঘাতটা পৌরুষে লাগল রবিনের। সন্দেহ হলো, বেনেদেতা কি ওকে ব্যঙ্গ করছে? বেনেদেতার কাছ থেকে বেশ একটু দূরে সরে গেল সে, শুলো তো না-ই, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ ধাঁধানো সাদা মুকুট পরা শৃঙ্গগুলোর দিক থেকে চোখ নামিয়ে রবিনের দিকে তাকাল বেনেদেতা, এবং রবিনকে ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে দুম করে প্রশ্ন করে বসল, 'কি তোমার দুঃখ, রবিন?'

বিহ্বল হয়ে পড়লেও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল রবিন, গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি যা তা বকছ।'

'তবে কি আমার বোঝার ভুল? উঁহুঁ, আমি সাধারণত ভুল করি না। কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে তোমার মধ্যে, রবিন। যতোই শান্ত আর নির্বিরোধী থাকার ভান করো, ভেতরটা তোমার জ্বলে যাচ্ছে—আমার ভয় হয়, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটবে তোমার মধ্যে।' আরও কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল বেনেদেতা। একটু পর আবার বলল, 'বুঝতে পারছি, অনধিকার চর্চা হয়ে গেল। কিছু মনে কোরো না।'

'তোমাকে আমি ঘৃণা করি! সব মেয়েকে আমি ঘৃণা করি!' চিৎকার করে কথাগুলো বলতে ইচ্ছা হলেও বলতে পারল না রবিন। তিক্ত একটু হাসল সে, বলল, 'কেউ যদি কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, আমার কি করার আছে। এবার আমরা উঠব কি?'

হুলটা গায়ে মাখল না বেনেদেতা। হাসি মুখেই বলল, 'আমার বক্তব্য আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারি।'

'তাই নাকি!' আরও তিক্ত শোনাল রবিনের কণ্ঠস্বর।

'নিজের ওপর মায়া-মমতা নেই তোমার,' বলল বেনেদেতা। 'মিলার ছাড়া আর সবাই দাড়ি কামাচ্ছে, কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। মিলারের সাথে শেভিং কিট নেই, কিন্তু তোমার ব্রীফকেসে আছে। এই ক'দিনেই আমরা সবাই পরস্পরের সম্পর্কে মোটামুটি সব কথাই জানি, কিন্তু একমাত্র তোমার সম্পর্কে কেউ আমরা কিছু জানিনি—অত্যন্ত সাবধানে নিজের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছ তুমি।' মুখের চেহারা একটু বিরূপ হয়ে উঠল বেনেদেতার। 'আরও শুনবে? লুকিয়ে মদ খাও তুমি। আরও···থাক, খামোকা আঘাত বা লজ্জা দিতে চাই না তোমাকে। বন্ধু

হিসেবে শুধু এটুকু বলতে দাও, নিজেকে এভাবে ধ্বংস হতে দিও না।'

আরও? দ্রুত ভাবছে রবিন। আরও কি জানে বেনেদেতা?

'উপদেশ দেবার জন্যে ধন্যবাদ,' গম্ভীরভাবে বলল রবিন। 'তা অনেক কিছুই তো বললে, বাকি যা জানো, সেগুলোও বলো—শুনতে ভালই লাগছে।'

লোকটা ভাঙবে, তবু নত হবে না, বুঝতে পেরে রাগ হলো বেনেদেতার। মুখটা লাল হয়ে উঠল তার। ভাবল, এ লোককে আঘাত করেই যদি ফেরানো যায়। বলল, 'একজন পুরুষ মানুষের জন্যে সে বড় লজ্জার কথা। ঘুমের মধ্যে তুমি কাঁদো।' ঠোঁট বেঁকে গেল বেনেদেতার, প্রতিশোধটা পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে এক সেকেন্ড পর বলল, 'এবার আমরা উঠব কি?'

বাকি রাস্তায় ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না।

কেবিনগুলোর মাঝখানে সমতল জায়গাটায় কাজের ধুম পড়ে গেছে। লোহার উপর হাতুড়ি পেটার দমাদম আওয়াজ হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা আকার এবং চেহারা নিয়ে গড়ে উঠছে ট্রিবুসেট। রবিন এবং বেনেদেতাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখতেই পেল না ওরা কেউ। হাতুড়ি নামিয়ে কপালের ঘাম মোছার জন্যে থামল রানা, ওদেরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠে বলল, 'আরে! এখানে কি করছ তোমরা? কিছু ঘটেছে, রবিন?'

'সব ঠিক আছে,' অভয় দিয়ে বলল রবিন। 'প্যারাফিন আর খাবারের ক্যান নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে সোহানা।'

'এসে পড়েছ যখন, বিশ্রাম নিয়ে আমাদেরকে একটু সাহায্য করো,' বলল লোপেজ। 'মিলারের সাহায্য পাচ্ছি না আমরা, মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে সে।'

'ঠিক আছে,' বলে ওভারকোট খোলার জন্যে একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল রবিন।

'আমার কাজগুলো আমি সেরে নিই,' বলে বেনেদেতাও আরেকটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

ছোট্ট একটা আয়না সামনে রেখে একমনে দাড়ি কামাচ্ছে মিলার, রবিনকে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। লোপেজ বলল মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে মিলার, অথচ দিব্যি সুস্থ দেখাচ্ছে তাকে—একটু অবাক হলো রবিন। বলল, 'ওরা ওখানে হিমশিম খাচ্ছে আর তুমি এখানে⋯দাড়ি কামাবার আর সময় পেলে না?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, নাক গলিয়ো না,' বলল মিলার। 'ওদিকে ওরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে কেটে পড়ছে, সে-খবর রাখো?'

'মানে?'

'ঘুমাইনি আমি, ওদের সব কথা শুনে ফেলেছি,' লাল চোখ দুটো রবিনের দিকে তুলল মিলার। 'পাহাড় টপকে আলটিমিরোসে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। কাজটা অবশ্য বুদ্ধিমানের মতই করছে। ব্রিজের ওপারে ওদেরকে তো আর চিরকাল আটকে রাখা যাবে না। তাই প্রাণ নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করাই ভাল। তুমিও যাচ্ছ, তাই না?'

রবিন ওভারকোটটা খুলে ভাঁজ করছে। 'সাহায্য আনতে যাচ্ছে ওরা,' বলল সে, 'ব্রিজের ওপারে ওদেরকে শেষপর্যন্ত আটকে রাখা যাবে না, একথা ঠিক। এবং

একবার ব্রিজ পেরিয়ে এপারে যদি আসতে পারে ওরা, আমরা সবাই মারা যাব, তাতেও কোন ভুল নেই। কিন্তু এই বিপদের চেয়ে অনেক বড় বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ওরা গিরিপথে। ওটা পেরোনো এককথায় অসম্ভব, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে যাচ্ছে রানা আর লোপেজ।'

'এসব কথা ওরা বুঝি তোমাকে বলেছে? আর তুমিও তা বিশ্বাস করেছ? বোকা কি আর গাছে ধরে!' ফোলা মুখে দৃঢ়তা ফুটে উঠল মিলারের। 'এসব ছেলেভুলানো কথায় আমি ভুলছি না। কেউ যদি না যেতে চায়, আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওদের সাথে আমিও যাচ্ছি। আমি একজন আমেরিকান মিলিওনিয়ার, সন্ত্রাসবাদীদের গুলি খেয়ে মরার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।'

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মিলারের দিকে রবিন। লোকটা বদ্ধ পাগল নাকি, ভাবছে সে। একটা পাহাড়ের চূড়াও পেরোতে পারবে না এই লোক, সে-শক্তি, সহনশীলতা, সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ এবং পরিশ্রম প্রবণতার ছিটেফোঁটাও নেই এর মধ্যে।

এর সাথে তর্ক করা বোকামি ভেবে শেলফে ওভারকোটটা রেখে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল রবিন।

আধঘণ্টা পর ক্লিনশেভ মিলার পাইপ টানতে টানতে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়াল। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল সে। 'তাড়াতাড়ি শেষ করো হাতের কাজ, যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততই ভাল।'

লোহার একটা লম্বা রড মাটি থেকে তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল লোপেজ, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার, ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে মিলারের দিকে। লম্বা চুলগুলো ঘামে ভেজা কপাল থেকে একহাত দিয়ে সরাল সে, বলল, 'তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ না, মিলার।'

'এ ব্যাপারে তুমি কথা বলার কে? আমার পা আছে, আমি যাব—কেউ বাধা দিলে দেখে নেব তাকে আমি।'

দ্রুত লোপেজের দিকে তাকাল রানা। দেখল, রড ধরা হাতের পেশী সামান্য শক্ত হয়ে উঠল তার। 'মিলার,' বলল রানা, 'ভেবেচিন্তে কথা বলো। লোপেজ ঠিক বলছে—পাহাড় টপকানো তোমার কাজ নয়।'

'এখান থেকে আলটিমিরোস মাত্র পনেরো মাইল,' জেদের সুরে বলল মিলার। 'তোমরা যদি পারো, আমিও পারব। মোট কথা, আমাকে ফেলে রেখে কেটে পড়তে পারছে না কেউ এখান থেকে, আমি যাব।' বলে সে দাঁড়াল না, ঘুরে চলে গেল কেবিনের ভিতর।

'অসম্ভব,' রডটা রানার হাতে দিয়ে বলল লোপেজ। 'এ লোকের শারীরিক অবস্থা পাহাড় টপকাবার উপযোগী নয়। ও আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেবে, এবং দেরি হলে আমরা কেউ পাহাড়ের ওপারে যেতে পারব না।'

চিন্তিতভাবে বলল রানা, 'আমি অন্য কথা ভাবছি। এখানে রবিনের ঘাড়ে ওকে গছিয়ে যাওয়াও কি উচিত হবে আমাদের? একের পর এক বিপদ সৃষ্টি করবে লোকটা। তারচেয়ে বোধহয় ওকে নিয়ে যাওয়াই ভাল, রবিন অন্তত বাঁচে।'

লোপেজ চুপ করে থাকল। গম্ভীর।

'চিন্তার কি আছে,' ঠাট্টাচ্ছলে বলল রানা, 'যদি বিপদ হয়ে দেখা দেয়, ঠেলে নিচে ফেলে দিলেই ঝামেলা চুকে যাবে।'

নিচে ফেলে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার উদ্যোগটা যে অপরপক্ষ থেকেও আসতে পারে, সে-কথা এই মুহূর্তে একবারও ভাবল না রানা।

'তুমি যখন বলছ, ঠিক আছে,' বলল লোপেজ। বোঝা গেল সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে।

রবিন এবং বেনেদেতাকে দেরি করিয়ে দেয়া উচিত হবে না, তাই ট্রিবুসেটের কাজ ফেলে ওদের সমস্যার দিকে খেয়াল দিল রানা। অভাব দেখা দিল দড়ির। যতটুকু পাওয়া গেল, এখানে সেখানে ক্ষয়ে-পচে গেছে—সেটুকুও হাত ছাড়া করার উপায় নেই, কেননা পাহাড় টপকাতে দরকার হবে ওদের। ট্রিবুসেটের জন্যে খানিকটা দড়ি জনসনেরও লাগবে। প্রচুর ইলেকট্রিক তার অবশ্য রয়েছে, অগত্যা সেটা দিয়েই প্যারাফিনের ড্রামটাকে বাঁধার কাজ সারতে হলো। একগাদা টুকিটাকি জিনিসপত্র বাছাই করে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে বেনেদেতা, কিভাবে এগুলোকে নিচে নামানো যায় ভেবেই পাচ্ছে না সে। 'দাঁড়াও,' বলল রানা, 'দেখি কি করা যায়।'

কাঠ জোড়া লাগিয়ে বড় আকারের একটা ট্রে-র মত তৈরি করে ফেলল রানা। তাতে চাপানো হলো বেনেদেতার সব জিনিস। ট্রের একদিকে তার বাঁধা হলো, সেটা ধরে টেনে নিয়ে যাবে বেনেদেতা।

দু'একটা কথা বলে রানা এবং লোপেজের কাছ থেকে বিদায় নিল রবিন এবং বেনেদেতা। মিলারের সাথে কথা বলার ঝুঁকি নিল না রবিন। ফস্ করে যা তা কিছু একটা বলে বসবে, ভাবল সে, দরকার কি! কিন্তু বেনেদেতা যখন রানাকে অভিযোগের সুরে বলল, 'ক'দিন থেকেই আমার আয়নাটা পাচ্ছিলাম না। এখন দেখছি সেটা মিলারের কাছে রয়েছে।' শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল রবিনের।

'মিলার!' গলা চড়িয়ে ডাকল সে।

পাইপ টানতে টানতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল মিলার। একেবারে ফুলবাবু সেজে আছে সে। বলল, 'এমন দাপটের সাথে ডাকা হচ্ছে কেন?'

'বেনেদেতার আয়না চুরি করেছ তুমি,' বলল রবিন। 'ফিরিয়ে দাও ওকে।'

'ও, এই কথা,' হালকাভাবে বলল মিলার। 'এখানে ওর আয়নার কি দরকার? আমি ভদ্র পরিবেশে ফিরে যাচ্ছি, দাড়ি কামাবার জন্যে ওটা আমার লাগবে।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সে। সেটায় হাত ভরে বের করল বিশ ডলারের এক তাড়া নোট। 'নগদ, নাকি ট্রাভেলার্স চেক দেব? কত দাম ওই আয়নার? কিন্তু টাকা নিয়েই বা করবে কি ও? এখান থেকে কাউকে তোমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে না।'

অসীম ধৈর্যের সাথে রবিন বলল, 'ওটা বেনেদেতা বিক্রি করবে না। ওর আয়না ওকে তুমি ফিরিয়ে দাও। তোমার মুখের পাইপটাও ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

'কেন?' চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল মিলারের।

'পাইপটা কোনালির, ওর ব্যাগ থেকে তুমি চুরি করেছ।'

'কত দাম একটা পাইপের?'

উত্তর না দিয়ে এক পা এক পা করে মিলারের দিকে এগোচ্ছে রবিন, বলল, 'তোমার নিজের শেভিং কিট নেই, দাড়ি কামালে কিভাবে?'

'ওটা আমার,' বলল জনসন। 'খুঁজে পাচ্ছিলাম না...'

'এগুলো সব আমার দরকার,' নির্বিকারভাবে বলল মিলার। 'হিসেব করে বলো মোট কত দাম হয়, তার দ্বিগুণ দিয়ে দেব আমি।'

কেবিন থেকে সব শুনছে লোপেজ, আর থাকতে না পেরে দ্রুত বেরিয়ে এল সে। ঠিক মিলারের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'অ্যাই।'

মিলারের কাছে পৌঁছতে এখনও দেরি আছে রবিনের।

'তুমি আবার কি বলতে চাও?' বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল মিলার।

লোপেজের মুষ্টিবদ্ধ হাতটা বিদ্যুৎবেগে উঠছে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারল রানা, নিষেধ করার সময় পেরিয়ে গেছে। 'আস্তে,' দ্রুত চেঁচিয়ে উঠল ও। জানে, লোপেজের জোরাল ঘুষি সহ্য করতে পারবে না মিলার, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

থ্যাচ্ করে শব্দ হলো একটা। পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মিলার তিন হাত দূরে।

'আস্তেই মেরেছি,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকল লোপেজ।

শক্ত পাথুরে মাটি থেকে মাথা তুলে থোঃ করে থুথু ফেলল মিলার। লাল রক্তের সাথে ধবধবে সাদা একটা দাঁত বেরিয়ে এল মুখের ভিতর থেকে। চেহারা বিকৃত হয়ে উঠেছে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'এর প্রতিশোধ কিভাবে নিতে হয় জানা আছে আমার,' অঁক করে বিদঘুটে একটা শব্দ করল সে, ঠোঁটের কিনারা গড়িয়ে আরেকটা দাঁত খসে পড়ল নিচের দিকে। 'শালাকে আমি যদি খুন না করেছি তো আমার নাম...'

কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল লোপেজ আবার। তাকে দেখে ভয় পেল মিলার, চুপ করে গেল। কিন্তু ওর দু'চোখের দৃষ্টিতে বিষ।

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে লোপেজ মিলারের দিকে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছে রানা, মিলার যদি আর একটা টুঁ-শব্দ করে, লোপেজ তাকে অত্যন্ত শান্তভাবে খুন করবে।

মিলারের কাঁপুনি দেখে কাঁধ ঝাঁকাল লোপেজ, তাচ্ছিল্যের সাথে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে।

রাস্তা ধরে পাহাড় থেকে নামছে, কিন্তু তবু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। কাঠের ট্রেটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে বেনেদেতা; কিন্তু হাজার বার থামতে হচ্ছে তাকে বিশ্রাম নেবার জন্যে, আরও বেশি বার রবিনকে সাহায্য করার জন্যে। ড্রামটাকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে রবিন। প্রায় চারশো পাউন্ডের মত ওজন, এবং রবিনের মনে হচ্ছে দুষ্ট প্রকৃতির নিজস্ব একটা মন আছে ওটার। তার ধরে সেটাকে যেদিক ইচ্ছা টেনে নামানো যাচ্ছে না। একবার থামলে শত টানাটানি করলেও তাকে একচুল নড়ানো দায়। ওদিকে একবার যদি গড়াতে শুরু করে, থামানো মুশকিল। তাও যদি

রবিন যেদিকে চায় সেদিকে নামত! লাফ দিয়ে কয়েকবার উঠে গেল রাস্তা থেকে, আছাড় খেয়ে পড়ল গর্তের ভিতর। আবার তাকে টেনে তোলা মানে আধঘণ্টার ধাক্কা।

ওদিকে দু'জনের মধ্যে কথা নেই। রবিন বিপাকে পড়লে দাঁড়িয়ে থাকছে অসহায়ভাবে, তখন নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করছে বেনেদেতা—এই পর্যন্ত। কেউ কারও দিকে সরাসরি তাকাচ্ছেও না, কথাও বলছে না।

আর যখন পারছে না রবিন, পরাজয় স্বীকার করতে যাচ্ছে, ঠিক তখন ওরা পৌঁছুল উপত্যকায়। খানিকটা ঘাস দেখে তার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'ট্রামটাকে আমি সন্ধ্যার আগেই ব্রিজের কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

রবিনকে অনুকরণ করে আকাশের দিকে তাকাল বেনেদেতা, দেখল অ্যান্ডেজের পুব দিকের ঢালগুলো এরই মধ্যে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, বলল, 'এ-কথা আমাকে শোনাবার কি মানে!'

পুরোপুরি সন্ধ্যা হতে বড়জোর আর-একঘণ্টা বাকি আছে, অনুমান করল রবিন। 'খবর পেলে কোনালি সাহায্য করতে আসত,' চোখ বুজে বলল সে।

পনেরো হাত দূরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে বেনেদেতা। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘামে লেপ্টে থাকা চুলগুলোকে ঘাড় আর পিঠ থেকে সরাচ্ছে সে, বলল, 'খবর পেলে তো সোহানাও আমাকে সাহায্য করতে আসত।'

কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না এখনও।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল রবিন। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত, বুঝতে পেরে অস্থিরতা অনুভব করছে সে। বলল, 'একজনের যাওয়া দরকার।'

'আমিও তাই মনে করি,' বলল, কিন্তু নড়ল না বেনেদেতা।

শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে স্বীকার করল রবিন, 'দম ফুরিয়ে গেছে আমার...'

'আমিও হাঁপিয়ে গেছি,' জানিয়ে দিল বেনেদেতা।

এরপর রবিন আর কথা বাড়াল না। বেনেদেতার তরফ থেকেও আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

'ঠিক আছে,' প্রায় দুই মিনিট পর বলল রবিন, 'ঝগড়া না করে এসো আপোষ করে ফেলি। রাজী?'

সাড়া নেই বেনেদেতার।

'কি, রাজী?' চোখ খুলে বেনেদেতার দিকে তাকাল রবিন—আরে, গেল কোথায়! ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা তার। যেখানে বসে ছিল সেখানে নেই বেনেদেতা, অথচ ট্রেটা পড়ে রয়েছে সেই একই জায়গায়। এদিকে পাহাড়ী জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়, কথাটা মনে হতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বেনেদেতার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল উপত্যকার একটা পুকুরের পাড় ঘেঁষে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বেনেদেতা।

নিজেকে নিয়ে বেশ একটু দুর্ভাবনায় পড়ে গেল রবিন। বেনেদেতা তার জায়াগায় নেই দেখে বুকের ভিতরটা অমন ছ্যাঁৎ করে উঠল কেন তার? কেন ওকে একটা হাহাকার গ্রাস করতে যাচ্ছিল?

বেনেদেতার কাছ থেকে খবর পেয়ে রবিনকে সাহায্য করতে এল কোনালি।

'পাহারায় কে এখন?' জানতে চাইল রবিন।

'সোহানা,' বলল কোনালি। 'এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।'

দু'জন মিলে ড্রামটাকে ব্রিজের কাছে নিয়ে যেতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। গিলটি মিয়াকে পাহারায় রেখে দ্রুত ওদের কাছে চলে এল সোহানা, ভাটির দিকে হাত তুলে বলল, 'ওদিক থেকে একটা অটো ইঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছি। এইমাত্র হেডলাইট জ্বেলে আলো ফেলেছে ওরা ব্রিজের ওপর। গিলটি মিয়াকে বললে জীপের আলো দুটো নিভিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দুটো বোল্ট খরচ হয়ে যাবে ভেবে...'

'প্রতিটি হেডলাইটের দু'পাশে পাথরের স্তূপ তৈরি করেছে ওরা,' বলল কোনালি। 'কাঁচ দুটোর সামনে মোটা তারের জাল দিয়ে রেখেছে।'

'বোল্ট অপচয় করা চলবে না,' বলল রবিন। 'আর মাত্র পাঁচটা তৈরি করেছে মিলার।'

ক্রল করে এগিয়ে গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে আলোকিত ব্রিজটাকে দেখল রবিন। ব্রিজ পর্যন্ত ঢালু, উঁচু-নিচু রাস্তাটা আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সন্দেহ নেই কয়েক জোড়া রাইফেলধারী একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাস্তাটার উপর। ওখানে বেরুলে আর ফিরতে হবে না।

পিছিয়ে এসে আবছা আলোয় পড়ে থাকা ড্রামটার দিকে তাকাল রবিন। পাহাড়ী রাস্তায় গড়ান খেয়ে সর্বাঙ্গে টোল পড়ে গেছে ওটার, আবার যদি ঠেলা মেরে গড়িয়ে দেয়া হয়, দিকভ্রান্ত হবার যথেষ্ট ভয় আছে। তবু, চেষ্টা করে দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়। গিলটি মিয়াকে ডেকে নিল ও। বলল, 'আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে চাই ব্রিজটাকে। সিনর রানার প্ল্যানটাই অনুকরণ করতে যাচ্ছি আমরা। আমাদের লক্ষ্য ব্রিজের এদিকের কিনারা। কোনালি যদি ঠিকমত ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিতে পারে ড্রামটাকে, এবং আমাদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, ব্রিজের গোড়ায় গিয়ে থামবে ওটা। ক্রস বো নিয়ে অপেক্ষা করবে গিলটি মিয়া, ড্রামটা থামলেই বোল্ট ছুঁড়ে ফুটো করবে ও। ওটা ফুটো হয়েছে দেখা মাত্র একটা ফায়ার বোল্ট সহ দ্বিতীয় ক্রস বো-টা তুলে দেবে আমার হাতে সোহানা। ড্রামটা যদি ঠিক জায়গায় গিয়ে থাকে, ফুটো করা এবং আগুন ধরানো কোন সমস্যাই নয়।'

'তোমাকে সবচেয়ে সাবধানে থাকতে হবে,' রবিনকে বলল সোহানা। 'অন্ধকারে ফায়ার বোল্ট ছুঁড়তে গেলেই আগুন দেখে গুলি করবে ওরা।'

কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে রবিন। একটু পর বলল, 'ইঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেছে, আর কোন আলো ওরা ব্রিজে ফেলার আগেই কাজটা শেষ করতে চাই আমি। জীপ বা ট্রাক, যাই হোক না কেন ওটা, ব্রিজের কাছে নিয়ে এসে পজিশন মত দাঁড় করাতে ব্যস্ত থাকবে যখন ওরা, ঠিক সেই সময় শুরু করব আমরা। আমি তোমাকে সিগন্যাল দেব, কোনালি।'

'ঠিক আছে।'

নিরাপদ একটা জায়গা বেছে বের করল কোনালি, ড্রামটাকে সেখানে নিয়ে আসতে তাকে সাহায্য করল রবিন। গিলটি মিয়া আর সোহানা ক্রস-বো নিয়ে যার

য্যার পজিশনে চলে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাছেপিঠে কোথাও সে দেখতে পেল না মিস জুডি এবং বেনেদেতাকে। ক্রল করে সোহানাকে পাশ কাটিয়ে নিজের পজিশনে থামল সে।

আবার শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ, কিন্তু ভাটির দিকের রাস্তায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রবিন। বুঝল, খুব ধীর গতিতে এবং হেডলাইট অফ রেখে আসছে গাড়িটা।

হঠাৎ একেবারে ব্রিজের কাছে জ্বলে উঠল দুটো হেডলাইট। একটা জীপ। পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া ট্রাকটার পাশে সেটা চলে আসতেই সিগন্যাল দিল সে কোনালিকে, 'নাউ!'

পাথরের উপর ড্রাম গড়াবার আওয়াজ পাচ্ছে রবিন, চোখের কোণ দিয়ে লাল একটা শিখা দেখতে পাচ্ছে সে, প্যারাফিনে ভেজানো কম্বল মোড়া বোল্টে আগুন ধরাচ্ছে সোহানা।

রবিনের বাঁ দিকে দেখা গেল ড্রামটাকে, ছোট ছোট লাফ দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে রাস্তার উপর দিয়ে। বড় একটা পাথরে ধাক্কা খেল সেটা, ঘুরে গিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল রবিন। রাস্তার কিনারার দিকে এগোচ্ছে ড্রামটা, উঁচু পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে এবার সেটা থেমে যাবে। এত আয়োজন, সব নিষ্ফল!

ড্রামটাকে দিকভ্রান্ত হতে দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠল গিলটি মিয়ার বুক। হাড্ডিসার চারহাত-পা নিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

হাত দিয়ে চোখ দুটো ঘষে নিয়ে আবার ভাল করে তাকাল রবিন। মনে মনে হায় হায় করছে সে। তির্যক ভাবে এখনও নেমে যাচ্ছে ড্রামটা, আর খোলা রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেটার পিছু পিছু বাতাসে যেন উড়ে চলেছে গিলটি মিয়া।

দুই হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'গেট ব্যাক! ফর গডস সেক, গেট ব্যাক—ইউ ব্লাডি ফুল!'

থামল না গিলটি মিয়া, ফিরে এল না। ড্রাম আর তার মাঝখানের দূরত্ব কমে এসেছে। এখনও গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে না সে—ব্যাপারটা অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে রবিনের। লাফ দিয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে যাচ্ছে গিলটি মিয়া, বাতাসে মস্ত ডানার মত পত পত করছে তার দু'পাশে ওভারকোটটা, ড্রামটাকে সে যেন ধাওয়া করে চলেছে কি যেন এক প্রচণ্ড আক্রোশের বশে।

এই বিপদে আমরা সবাই বেঁচে থাকব তা আশা করা বোকামি হবে, রানার এই কথাটা মনে পড়ে গেল রবিনের। দেখতে পাচ্ছে সে, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে গিলটি মিয়া, ধরতে চাইছে ড্রামটাকে। ধরল, এই ধরল···ধরে ফেলেছে! সোজা করেই ব্রিজের দিকে আরেকটা ধাক্কা দিল সে ড্রামটাকে।

প্রাণপণে ছুটে ফিরে আসছে গিলটি মিয়া, তার দুই পায়ের দু'পাশে এবং মধ্যবর্তী ফাঁকে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে, তার সাথে সাথে এগিয়ে আসছে ধুলোর একটা মেঘ। টং করে ধাতব একটা শব্দ হলো। চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল রবিন রূপালী ঝর্ণার মত আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে তরল প্যারাফিন—বুলেট লেগে ফুটো হয়ে গেছে ড্রামটা। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে শত্রুরা, ঠিক বুঝতে পারছে না

কোন্টা বেশি বিপদ, ড্রামটা নাকি গিলটি মিয়া। এই সুযোগটা পেয়েই নিরাপদে আড়ালে ফিরে আসতে পারল গিলটি মিয়া। শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে সে। ক্রস বো-টা টেনে নিল সামনে।

'দরকার নেই,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তোমার কাজ ওরাই করে দিয়েছে।'

ব্রিজের দিকে গড়িয়ে চলেছে ড্রামটা, কিন্তু একের পর এক বুলেটের ধাক্কায় গতি মন্থর হয়ে গেছে ওটার। আরও অনেক ফুটো থেকে উপর দিকে উঠছে প্যারাফিন। দূর থেকে দেখা না গেলেও, বুঝতে পারছে রবিন, ওদিকের রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, সেজন্যেই ব্রিজের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল ড্রামটা।

কপাল মন্দ, ভাবতে ভাবতে ছোঁ মেরে ক্রস বো-টা সোহানার হাত থেকে নিল রবিন। আগুনের শিখা ওর দৃষ্টি পথকে ঢেকে দিতে চাইছে। ধীরে সুস্থে লক্ষ্যস্থির করছে ও। খাদের অপর পাড় থেকে আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কাছাকাছি একটা পাথরে ঘষা খেয়ে দিক বদল করল একটা বুলেট, রবিনের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল।

আস্তে করে ট্রিগারে চাপ দিল রবিন। ফায়ার বোল্টটা বেরিয়ে যেতেই আগুনের আঁচ থেকে বাঁচল মুখটা। মাথাটা পাথরের আড়ালে টেনে নিল রবিন, এক মুহূর্ত পর ওর মাথার পাশে পাথরে এসে লাগল একটা বুলেট। ক্রস বো-টা রি-লোডিংয়ের জন্যে ফিরিয়ে দিচ্ছে রবিন সোহানাকে।

দপ করে শব্দ হলো একটা, নিমেষে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল লালচে আলোয়। ড্রামের চারদিকের প্যারাফিনে আগুন ধরে গেছে। ক্রল করে আরেক জায়গায় সরে গিয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে উঁকি দিল রবিন।

ড্রামের চারধারে ছুটোছুটি, নাচানাচি করছে আগুন। সবেগে বেরিয়ে আসা প্যারাফিনের ধারাগুলো জ্বলছে। দর্শনীয় দৃশ্য, ভাবল রবিন। কিন্তু ব্রিজের কাছ থেকে ড্রামটা বেশ একটু দূরে, এখন শুধুমাত্র ড্রামটা যদি ফেটে গিয়ে ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ে, তবেই—কিন্তু সে আশা কম।

মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। তেমন কিছু ঘটল না। এক সময় নিভে গেল আগুন।

ক্রল করে পিছিয়ে এল রবিন।

'যাকে বলে রামধাক্কা, তা ঠিক দিতে পারিনি আমি, স্বীকার করচি,' গালে হাত দিয়ে একটা পাথরের উপর বসে আছে গিলটি মিয়া।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'বেঁচে গেছ ভাগ্যের জোরে। এমন পাগলামি কেউ করে নাকি!'

দাঁত বের করে হাসল গিলটি মিয়া। 'ওরা আমার কিচু করতে পারবে না জানতুম কিনা।'

'জানতে, না?' কড়া ধমক মারার পূর্ব-লক্ষণ প্রকাশ পেল সোহানার গলার স্বরে।

মুহূর্তে বোবা হয়ে গেল গিলটি মিয়া, মাথা নিচু করে ফেলল।

'যাই হোক,' খানিকপর বলল সোহানা, 'ওদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি ভয়-ডর কিছু নেই আমাদের, এবং এখনও আমরা যুদ্ধ করছি। ব্রিজের এপারে এলে

আগুনে পুড়ে মরতে হবে, এ ভয় ওদের মনে না জেগেই পারে না।'

'যা হবার হয়েছে,' পিছন থেকে ভেসে এল বেনেদেতার কণ্ঠস্বর। 'খাবার তৈরি, তোমরা সবাই খেতে এসো।'

মাথা নিচু করে ব্রিজের দিকে পিঠ ফেরাল রবিন। ভাবছে প্লেন দুর্ঘটনার পর এটা তৃতীয় রাত্রি—এবং আরও ছয়টা রাত্রি কাটাতে হবে।

আট

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ভোরের আলো।

যাত্রা শুরু করার আগে খেতে বসেছে ওরা। 'গত রাতে মনে হলো রাইফেলের শব্দ শুনেছি আমি,' বলল রানা। 'সূর্য ডোবার ঠিক পরপরই।'

রানার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিল লোপেজ, 'শত্রুদের গায়ে নিশ্চয়ই আগুন ছুঁড়েছে রবিন। এত তাড়াতাড়ি ব্রিজ মেরামত করে এপারে চলে আসতে পারে না ওরা।'

চুপচাপ খাওয়া শেষ করে উঠল মিলার। আয়েশ করে আগুন ধরাল পাইপে।

প্রায় সারারাত জেগে সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছে জনসন, ঠিক হলো ঘুম ভাঙিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেবার কোন দরকার নেই। শেষবার পরীক্ষা করে নিচ্ছে ওদের বোঝাগুলো রানা। অভিযানের জন্যে যা যা দরকার তার প্রায় কিছুই নেই—নেই বিশেষ ধরনের খাবার, লাইট-ওয়েট নাইলনের দড়ি, তাঁবু, উইন্ডপ্রুফ কাপড়চোপড়, ক্লাইমবিং বুট, আইস-অ্যাক্স, পিটন। বিছানার চাদর দিয়ে তৈরি হয়েছে ওদের পোঁটলা। ঝাঁটার হাতলে ভোঁতামুখো একটা লোহার লম্বা টুকরো ঢুকিয়ে ওদেরকে যেটা দিয়েছে জনসন সেটাকে আইস-অ্যাক্সের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। গিঁট সর্বস্ব পচা দড়ি যা ছিল সবটুকু সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মাইনারদের ফেলে যাওয়া শক্ত চামড়ার ভারী জুতোগুলোই ওদের ক্লাইমবিং বুট হিসেবে কাজ করবে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে পায়ে বাঁধার জন্যে পট্টি তৈরি করেছে লোপেজ। কেবিনের দেয়াল থেকে বহু কষ্টে টানাটানি করে অস্বাভাবিক লম্বা পেরেক বের করেছে জনসন, সেগুলো পিটন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। দেখেই গম্ভীর মুখ শুকিয়ে গেছে লোপেজের, বলেছে, 'বড় নরম এই লোহা,...উপায় কি, এ দিয়েই কাজ চালাতে হবে।'

কেবিন থেকে বেরুবার সময় শুনতে পেল ওরা, বোঝাটা বেশি ভারী হয়েছে বলে নিজের কপালকে খিস্তি করছে জোসেফ মিলার। জোরে বলার সাহস নেই, তাই বিড় বিড় করছে, 'কেউ যদি আমার বোঝাটা বইত, বিশ ডলারের নোট দিয়ে দু'পকেট ভরে দিতাম তার...' শুনতে পেলেও কান দিল না লোপেজ কথাটায়।

মাইনে পৌঁছুতে অনেক সময় লেগে গেল। হার্টবিট বেড়ে গেছে রানার, বুকের দেয়ালে হৃৎপিণ্ডটা যেন বাড়ি খাচ্ছে অবিরত।

দুপুরবেলা পৌঁছল ওরা এয়ার-স্ট্রিপে। একটা ঝিমুনি ভাব অনুভব করছে রানা,

বমি পাচ্ছে—এই অবস্থায় প্রথম যে কেবিনটা সামনে পড়ল সেটায় ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। তার পাশে ধপ করে বসল লোপেজ, কাঁধ থেকে পোঁটলার স্ট্র্যাপটা নামাবে, সে ইচ্ছা বা শক্তি কোনটাই অবশিষ্ট নেই। পিছিয়ে পড়েছে অনেক আগেই মিলার। তার অনুরোধ উপেক্ষা করে যথাসম্ভব দ্রুত উঠে এসেছে ওরা, সময় নষ্ট হবে ভেবে চলার গতি মন্থর করেনি। একটু একটু করে পিছিয়ে পড়েছে মিলার, তারপর দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেছে একসময়।

আধঘণ্টা পর পোঁটলার স্ট্র্যাপে অসাড় আঙুল রেখে বলল লোপেজ, 'প্যারাফিন বের করো, আগুন চাই আমাদের।'

ডাকোটা থেকে পাওয়া সেই ছোট কুঠারটা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল লোপেজ। একটু পরই কাঠ কাটার আওয়াজ পেল রানা। পোঁটলা থেকে প্যারাফিনের বোতলটা বের করল ও। কাঠ নিয়ে ফিরে এল লোপেজ। সেগুলো দিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করল রানা। প্যারাফিন ঢেলে আগুন জ্বালল তাতে।

'এবার খেয়ে নেব আমরা।'

'কিন্তু খিদে নেই আমার,' বলল রানা।

'জানি,' বলল লোপেজ, 'আমারও নেই। সরোচে-এর একটা লক্ষণ এটাও। কিন্তু না খেলে নিঃশেষ হয়ে যাবে সব শক্তি। আগামীকাল উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা থাকবে না।'

হাত-পায়ে জোর পাচ্ছে না রানা। অদ্ভুত একটা আচ্ছন্নতা অনুভব করছে। একটু শব্দ হলেই অশান্তি লাগছে ওর। বুঝতে পারছে, সরোচে আক্রান্ত হয়েছে ওর মনটাও। পরিষ্কার ভাবতে পারছে না কিছু, চিন্তাগুলোকে লাইনবন্দী রাখতে পারছে না। কেবিনের একধারে চুপচাপ বসে শক্ত দড়ির মত মাংস চিবাচ্ছে। 'প্লেন থেকে যখন বেরুলাম তখন তো এমন অসুস্থ লাগেনি!' বলল ও।

'অক্সিজেন ছিল তখন আমাদের,' বলল লোপেজ। 'তাছাড়া তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নেমে গিয়েছিলাম আমরা।'

থপ্ থপ্ শব্দ শুনল ওরা। কিন্তু দরজার দিকে তাকাবার ধৈর্য নেই ওদের। টলতে টলতে কেবিনে ঢুকল মিলার। হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল সে, তারপর স্থির হয়ে গেল।

আধঘণ্টা পর নড়ে উঠল মিলার। এখনও মাংস চিবাচ্ছে রানা আর লোপেজ। মাথা তুলে ওদেরকে দেখল মিলার। 'আমাকে এভাবে একা ফেলে... ঠিক আছে, এখন আমি কিচ্ছু বলব না। সময় আসুক।'

'হ্যাঁ,' বলল লোপেজ, 'সময় আসুক, তখন টের পাবে আমাদেরকে ছাড়া তোমার উদ্ধার নেই।' একটা প্লেটে কিছুটা মাংস দিয়ে সেটা ঠেলে দিল সে মিলারের দিকে। 'দয়া করে এটা খেয়ে নিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করো আপাতত।'

'খিদে নেই,' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল মিলার।

'খিদে না থাকলেও খেতে হবে,' বলল লোপেজ। 'কথাটা তোমার স্বার্থে নয়, আমাদের স্বার্থে বলছি। তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে আমাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করবে।'

'বললাম তো, খিদে নেই আমার!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল মিলার।

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল লোপেজ, রানাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, বলল, 'এখন থেকে খুব কম খাওয়া-দাওয়া করব আমরা—শরীরের সঞ্চয় ভেঙে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। সুস্থ সবল একজন লোকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু যে লোকের শরীরে পানি আর চর্বি ছাড়া কিছু নেই, টিকবে কিনা জানি না।'

এয়ার-স্ট্রিপ ধরে ধীর পায়ে এগোচ্ছে ওরা। ল্যান্ড করার জন্যে ছোট বলে মনে হয়েছিল ওটাকে রবিনের, অথচ রানার মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছে সে, তবু যেন আরও কত মাইল হাঁটতে হবে। চেতনা শক্তি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে ওর। যান্ত্রিক মানুষের মত এক পা ফেলছে সামনে, তারপর নিজে থেকেই আরেকটা পা এগিয়ে যাচ্ছে। হিমেল বাতাস ছুরি চালাচ্ছে গলার ভিতর। দম ফুরিয়ে আসছে বলে লোপেজের নিষেধ সত্ত্বেও জোরে জোরে শ্বাস টেনে ভরিয়ে নিতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে বুকটাকে।

এয়ার-স্ট্রিপ ছেড়ে পাহাড়ের একটা পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে নামছে এখন ওরা। অনেকটা ঘুর পথ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছুল বিধ্বস্ত ডাকোটার কাছে। তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে প্লেনটা। এয়ার সার্চ যদি হয়ে থাকে বা হয়, উপর থেকে কারও চোখে পড়বে না ডাকোটা। তুষার সরিয়ে প্লেনের ভিতরে ঢুকল ওরা। লাগেজ র‍্যাকে হুকসহ কিছু স্ট্র্যাপ, তিনটে সুটকেস আর ককপিটে দু'জোড়া দস্তানা পাওয়া গেল। প্যাসেঞ্জার কেবিনে ঢুকে সীটের পাশে হুমড়ি খেয়ে একজনকে বসে থাকতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। আবছা আলোয় ভাল করে তাকাল ও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে বুড়ো হফের লাশ, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া হাড় আর থেঁতলানো মাংস যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি আছে। চোখ সরিয়ে এদিক ওদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ও। কাজে লাগতে পারে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মুখ তুলে তাকাল ও, লোপেজের হাতে ফার্স্ট এইড বক্সটা রয়েছে।

'অ্যাসপিরিন ছাড়া কিছু নেই,' বলল লোপেজ। মরফিনের অ্যাম্পুলগুলো ভেঙে গেছে সব। বাক্সটা থেকে অ্যাসপিরিনের শিশিটা বের করে পকেটে রাখল। 'এসো,' কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল সে।

শেষবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ককপিটে চলে এল রানা। ফিউজিলাজের গায়ের গর্তটা দিয়ে ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে লোপেজ। হঠাৎ মেঝেতে পড়ে থাকা একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি আটকে গেল রানার। মাই গড, ভাবল ও, বেনোর পিস্তলটার কথা মনেই ছিল না কারও। রবিন ওটা পেলে কাজে লাগাতে পারত, কিন্তু তার কাছে পৌঁছে দেয়া এখন আর সম্ভব নয়। একটু ইতস্তত করে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল পিস্তলটা, কি যেন ভাবল একটু, তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সেটা।

কেবিনে ফিরে এল ওরা। বিশ্রাম না নিয়ে তখুনি মাইনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল লোপেজ। কাজে লাগতে পারে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখবে ও।

একধারে বসে ঝিমুচ্ছে মিলার। খায়নি সে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রানার দিকে।

ফিরে এসে বলল লোপেজ, 'রবিনের জন্যে একটা টানেল দেখে এসেছি। শত্রুরা ব্রিজ মেরামত করে ফেললে ওকে এখানে আসতেই হবে। এই ক্যাম্পে ডিফেন্সের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমি যে টানেলটা দেখে এসেছি সেখানে

আশ্রয় নিতে পারবে ও। আরগুলোর মত সোজা পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে যায়নি এটা। মুখ থেকে পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। বুলেটের ঝাঁকের বিরুদ্ধে একটা প্রোটেকশন পাবে ও।'

তক্ষুণি উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, দেখে আসি।'

কেবিনগুলোর পিছন দিক দিয়ে পথ দেখিয়ে পাহাড়ের পাঁচিলের সামনে নিয়ে এল রানাকে লোপেজ। পাঁচিলের ভিতর ঢুকে গেছে ছয়টা টানেল। হাত তুলে একটা দেখাল লোপেজ, 'ওটা।'

ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে পাথুরে মাটি, দশ ফিটের সামান্য কিছু উপরে টানেলের মুখটা, খুব বেশি চওড়া নয়। এগিয়ে গেল রানা, প্রবেশ মুখ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল টানেলের ভিতরে। যত এগোচ্ছে, কমে আসছে আলো। একটু পর অন্ধকার দেখছে সামনে রানা। অন্ধের মত হাতড়ে পাশের দেয়াল ছুঁলো ও। ঠিক বলেছে লোপেজ, বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে টানেল। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল গুহার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আর এগোল না ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসতে শুরু করল। একটু পর গুহামুখে দিনের উজ্জ্বল আলোয় লোপেজের কাঠামোটা দেখতে পেল ও।

'মন্দ নয়,' টানেল থেকে বেরিয়ে এসে বলল ও। 'রবিন যখন এখানে আসবে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকবে সে, মুখের কাছে আমরা যদি একটা পাঁচিল তুলে রেখে যাই, কেমন হয়? প্রচুর পাথর রয়েছে এদিকে।'

'চমৎকার হয়,' সাথে সাথে সায় দিল লোপেজ। 'দাঁড়াও, মিলারকে ডেকে আনছি।'

কিন্তু কথাটা শুনেই খেঁকিয়ে উঠল মিলার, 'আমাকে একা থাকতে দাও। আমি লেবার নাকি যে পাথর বইব?'

জুতোর ডগা দিয়ে মিলারের পাঁজরে খোঁচা মারল লোপেজ। বলল, 'তুমি চাও ওই জায়গায় কষে একটা লাথি মারি?'

লোপেজকে বাধা দেবার জন্যে কেবিনে রানা নেই লক্ষ্য করে অগত্যা উঠল মিলার, বেরিয়ে এল বাইরে।

পাথর বয়ে নিয়ে এল ওরা টানেলের মুখে, আর রানা অসীম ধৈর্যের সাথে পাথরের উপর পাথর বসিয়ে দাঁড় করাতে শুরু করল একটা পাঁচিল। কঠিন পরিশ্রমের কাজ। ওদের পরিশ্রম আর কষ্ট শতগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড শীত আর অক্সিজেনের অনটন। অবশ, অসাড় দুটো হাত দিয়ে পাথর ধরছে রানা—দৃষ্টিই সাহায্য করছে ওকে, স্পর্শ দিয়ে পাথরের আকার বা ওজন অনুভব করতে পারছে না।

বুক সমান উঁচু হলো পাঁচিলটা। 'এতেই হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোপেজ। 'চলো, কেবিনে ফিরে যাই এবার।'

কেবিনে ফিরে স্টু তৈরি করল রানা। একেবারেই খিদে নেই, কিন্তু জোর করে যতটা পারল গলা দিয়ে নামিয়ে দিল ওরা। এবারও মুখে কিছু তুলল না মিলার। অবজ্ঞা প্রকাশ করল রানা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করায়। টের পেল রানা, ওদের দু'জনকে নিজের চেয়ে অনেক নিচুস্তরের মানুষ বলে ধরে নিয়েছে মিলার।

পরদিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, তেমন ক্লান্তি অনুভব করল না রানা, শ্বাস-প্রশ্বাসও আগের চেয়ে বেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আরেকটা দিন যদি কাটানো যেত এখানে, আরও ভাল হত, ভাবল ও, কিন্তু তা সম্ভব নয়। সময়েরই সবচেয়ে অভাব এখন ওদের। অস্পষ্ট আলোয় লোপেজকে দেখতে পাচ্ছে ও। ফালি করে ছেঁড়া চাদরের টুকরো দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধছে সে। নিঃশব্দে সে-ও তাই করতে শুরু করল। কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছে না দু'জনের কারও। পায়ে পট্টি বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে গিয়ে মিলারের পাঁজরে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল একটা।

'একা থাকতে দাও আমাকে,' নিস্তেজ গলায় বলল মিলার।

'লোপেজকে ডেকে দেব?'

সাথে সাথে কাজ হলো। উঠে বসল মিলার।

এগিয়ে এসে দরজার সামনে লোপেজের পাশে দাঁড়াল রানা।

একদৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে লোপেজ। হঠাৎ বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।' কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে সন্দেহের সুর টের পেল রানা। কেমন যেন দমে গেল ওর মনটা।

স্বচ্ছ স্ফটিকের মত দেখাচ্ছে সকালটাকে, গাঢ় আকাশের গায়ে শৃঙ্গগুলো ঝকমক করছে উঠতি সূর্যের আলো মেখে। 'কি ব্যাপার, লোপেজ?'

'খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে, এই যা,' এবারও সন্দেহের ছোঁয়া তার গলায়। 'সম্ভবত খুব বেশি স্বচ্ছ...'

'কোন্ দিকে যাব আমরা?'

একটা পর্বত শৃঙ্গ দেখাল লোপেজ। 'গিরিপথটা ওর পিছনে। শৃঙ্গের ভিতর ঘুরে যাব আমরা, তারপর গিরিপথের ওপর দিয়ে উল্টোদিকে। বিপদ যা এদিকেই, ওদিকটা কিছু না।'

ভোরের পরিষ্কার বাতাসে পাহাড়টা এত কাছে লাগছে, একদমে দৌড়ে গিয়ে ছুঁতে পারবে বলে মনে হলো রানার। 'দেখে তো ভয় লাগছে না,' বলল ও।

নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লোপেজ। 'দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারোনি এমন সব বিপদ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে ওখানে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'এসো, খেয়ে নিই।'

একই জেদ মিলারের, খাবে না সে। কিন্তু এবার লোপেজ ছাড়ল না তাকে। 'খেতে হবে। নিজের হাতে না খেলে আঙুল দিয়ে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দেব।'

কয়েক সেকেন্ড হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর নড়েচড়ে উঠল মিলার। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'খাব, তবে...'

'চোপ!' গর্জে উঠল লোপেজ। 'কোন তবে টবে শুনব না। আর একটাও কথা নয়।'

অতিকষ্টে খাওয়া শেষ করল মিলার।

'তোমার বুটের কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'বোধহয় ঠিক আছে।'

'বোধ হয়? ভাল করে দেখে নিয়ে বলো।'

বুট জোড়ার দিকে তাকাল একবার মিলার। 'ঠিকই আছে।'

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল রানা লোপেজকে। স্ট্র্যাপটা বেঁধে নিল কাঁধের সাথে। পোঁটলা হিসেবে যে চাদরটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা এখন সুটকেসের গায়ে প্যাড হিসেবে কাজ করছে। লোপেজ এবং মিলারও পোঁটলার বদলে ডাকোটা থেকে পাওয়া সুটকেস বইছে।

ডাকোটা থেকে পাওয়া ছোট কুঠারটা বেল্টে আটকে নিয়েছে রানা। আইস-অ্যাক্সটা নিয়েছে লোপেজ। ওরা কেবিন থেকে বেরুতে যাবে, ঠক করে কি যেন পড়ল মেঝেতে, দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে।

দ্রুত কি যেন একটা কুড়িয়ে নিয়ে পিছন দিকে লুকিয়ে ফেলল মিলার।

'দেখে ফেলেছি,' বলল লোপেজ। 'ওটা রবিনের ফ্লাস্ক। আশ্চর্য! আশ্চর্য স্বার্থপর লোক তুমি, মিলার! অত্যন্ত নীচ!' রানার দিকে তাকাল সে। 'রানা, এ লোককে আমরা সাথে নিতে পারি না। একে বিশ্বাস করা যায় না।'

'প্লীজ,' মিনতির সুরে বলল মিলার, 'তোমরা আমাকে ফেলে যেয়ো না। বিশ্বাস করো, ফ্লাস্কটা আমি চুরি করিনি, এটা রবিন আমাকে দিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা,' বলল লোপেজ। আবার তাকাল রানার দিকে। 'আমি বলে দিচ্ছি, এ লোক পর্বতে আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সাবধান হবার এখনও সময় আছে।'

'রবিনের ঘাড়ে এমনিতেই চরম বিপদ,' বলল রানা। 'তার ওপর এই আপদকে রেখে যাওয়া উচিত হবে বলে মনে করো তুমি? রেখে গেলে ওদেরও সবার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেটা চাও?'

কথা বলল না লোপেজ। রাগের সাথে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'লোপেজের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ, মিলার?' জানতে চাইল রানা।

'দেখে নেব ওকে আমি!' উত্তর দিল মিলার। 'সময় আসুক, তোমাকেও ছাড়ব না!'

'বুঝলাম। কপালে খারাবি আছে তোমার। যাও, বেরোও এখন কেবিন থেকে, কুইক!'

মিলার বেরিয়ে যেতে রবিনকে উদ্দেশ্য করে একটা কাগজে খস খস করে দু'লাইন লিখল রানা, টানেলটা খুঁজে পেতে যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার।

অভিযানের প্রথম দিকটা তেমন কষ্টকর মনে হলো না। রাস্তা ছেড়ে এসেছে ওরা, পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে, চলার গতিও খুব একটা মন্থর নয়। সবার আগে লোপেজ, মাঝখানে মিলার, পিছনে রানা। মিলার পিছিয়ে পড়লে তাকে গুঁতো মেরে সামনে বাড়াবার জন্যে এই ব্যবস্থা। কিন্তু তার দরকার পড়ছে না, ওদের তালে তাল রেখে বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে সে।

প্রথম দিকে অগভীর এবং ঝুরঝুরে বরফ পেল ওরা, শুকনো পাউডারের মত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পরে বরফের গভীরতা বাড়ল, উপরের স্তরটা কংক্রিটের মত শক্ত। দাঁড়িয়ে পড়ল লোপেজ, বলল, 'দড়ি ব্যবহার করতে হবে।'

গিঁটসর্বস্ব, পচা দড়ি বের করল ওরা। দু'হাত দিয়ে টেনে প্রতিটি গিঁট পরীক্ষা করল লোপেজ। পরস্পরের সাথে দড়ি দিয়ে নিজেদেরকে বেঁধে নিল ওরা। সেই একই লাইনে থাকল তিনজন, আবার উঠতে শুরু করল। সামনে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে বরফ মোড়া পাহাড়ের শরীর, যত উপরেই দৃষ্টি যাক, শেষ নেই তার—শেষ মাথাটা বিলীন হয়ে গেছে একেবারে আকাশের গায়ে।

ওঠার গতি একটু একটু করে মন্থর হয়ে আসছে। আইস-অ্যাক্স দিয়ে বরফ খুঁড়ছে লোপেজ। গর্তে পা রেখে আরেকটা গর্ত তৈরি করছে, তারপর আরেকটা—প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে এভাবে এগোতে। লোপেজের তৈরি করা গর্তে পা রেখে সহজেই উঠে যেতে পারছে মিলার এবং রানা। সহজ কাজটা হঠাৎ কঠিন হয়ে দেখা দিল। ঢালটা এদিকে প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেছে উপর দিকে। অনেকক্ষণ নিচের দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল, রানা, তারপর যখন তাকাল, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা ওর। চোখ ধাঁধানো সাদা বরফ ছাড়া নিচের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়ছে না ওর, তারপর অনেক নিচে কালো শক্ত পাথরের বিস্তীর্ণ বিস্তার, অসংখ্য কুৎসিত দর্শন কুমীর গায়ে গা ঠেকিয়ে নিঃসাড় শুয়ে আছে যেন। এখন যদি ওদের কেউ একজন পা পিছলে পড়ে যায়, কি হবে? ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা। ওই একজনই বাকি দু'জনকে হেঁচকা টানে খসিয়ে নেবে পাহাড়ের গা থেকে, দড়ি বাঁধা তিনটে মানুষ ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে যাবে এক হাজার ফিট নিচে।

মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তাটাকে দূর করে দিল রানা। তেমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যেই তো এই দড়ির ব্যবস্থা। পা কারও পিছলে গেলেও তার পতন রোধ করা যাবে।

উপর থেকে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কড় কড় কড়াৎ করে বিকট একটা আওয়াজ এল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল মিলার। দাঁড়িয়ে পড়েছে লোপেজ।

'কি ব্যাপার?' ঢোক গিলে জানতে চাইল রানা যদিও অনুমান করতে পারছে রহস্যটা।

'তুষার-ধস,' বলে আবার উঠতে শুরু করল লোপেজ।

'কোন ভয় নেই তো?' কাঁদ কাঁদ গলায় জানতে চাইল মিলার। 'এদিকে যদি নেমে আসে...'

উপর থেকে ধমক মারল লোপেজ। 'যদি আসে পাঁচ সেকেন্ড সময় পাবে টের পাবার পর। কিছুই করার থাকবে না তোমার। কান্নাকাটি না করে যা করছ করতে থাকো।'

অনেকক্ষণ থেকে হাঁপাচ্ছে রানা। সেই আচ্ছন্ন ভাবটা আবার গ্রাস করেছে ওকে আজ। চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। কি সব ভাবছে, তারপর মনে হচ্ছে, আরে, এসব যা-তা, কি ছাই ভাবছি আমি! একসময় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল সে, ভাবল, কি আশ্চর্য, কখন থেকে যেন কিছুই ভাবছি না—মাথাটা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল না কি!

কিন্তু চিন্তায় ছেদ, যতি বা বিরতি যাই পড়ুক, পা দুটো তার কাজ ঠিকই করে যাচ্ছে—যান্ত্রিক নিয়মে একটার সামনে পড়ছে একটা। বিস্ময়ে আরেকবার অভিভূত

হয়ে পড়ল রানা—নিজের শরীর থেকে কখন এবং কি ভাবে যেন আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ল ও, তারপর অনেকটা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে নিজেকে পরিষ্কার। বিশাল সাদা বরফের গায়ে কালো একটা বিন্দু—যেন ধবধবে সাদা চাদরে পিঁপড়ে হাঁটছে একটা।

সংবিৎ ফিরল রানার মিলারের সাথে ধাক্কা খেয়ে। লোপেজের তৈরি করা গর্তে হাত ঢুকিয়ে শুয়ে আছে সে, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। তাকে দেখতে পায়নি রানা।

'অ্যাই!' মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করছে রানা। 'ওঠো! ওঠো বলছি...'

'লোপেজ...লোপেজ দাঁড়িয়ে পড়েছে!'

উপর দিকে তাকাল রানা, দেখতে পাচ্ছে না কিছু, প্রখর আলোয় সব কিছু ঝাপসা সাদা আলোর অসংখ্য খুদে বর্শা নাচছে চোখের সামনে, তার মাঝখান দিয়ে অস্পষ্ট একটা কাঠামো নেমে আসছে ওর দিকে। শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে গেল ভয়ের একটা স্রোত। কি হলো চোখে? ভাবছে ও। অন্ধ হয়ে যাচ্ছে নাকি সে? 'দুঃখিত,' বলল লোপেজ, রানার অজান্তে একেবারে ওর সামনে নেমে এসেছে সে। 'বোকামি হয়ে গেছে আমার। মনেই ছিল না কথাটা।'

'আমার চোখ!' চেষ্টা করেও আতঙ্কটা চেপে রাখতে পারল না রানা। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি লোপেজ।'

'রিল্যাক্স,' বলল লোপেজ। 'চোখ বুজে ফেলো। বিশ্রাম দাও ও দুটোকে।' চোখ বুজে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল রানা বরফের উপর। চোখ দুটো কর কর করছে, পাতার নিচে যেন বালির কণা রয়েছে। বন্ধ চোখ থেকে নাকের দুই পাশ বেয়ে নামছে পানি। আইস গ্লেয়ারে আক্রান্ত হয়েছে ও, বুঝতে পারছে, কিন্তু এই বিপদ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই ওর। সেজন্যেই ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে। দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পাবে তো সে?

'ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিয়ে বলল লোপেজ। 'কয়েক মিনিট শুধু বন্ধ করে রাখো চোখ দুটোকে।'

চোখ বন্ধ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে পেশীগুলো। বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও, কার উপর তা নিজেও জানে না। সারা শরীর জুড়ে শুধু ক্লান্তি অনুভব করছে, জীবনে বোধ হয় এত ক্লান্ত কখনও হয়নি ও। 'কতটা এলাম, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল লোপেজকে।

'খুব বেশি দূর নয়।'

'বাজে ক'টা?'

একটু পর বলল লোপেজ, 'ন'টা।'

অবাক হয়ে গেল রানা, ওর মনে হচ্ছে সারাটা দিন ধরে হেঁটেছে আজ ও। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গেছে শরীর।

'তোমার চোখে একটা জিনিস ঘষে দিচ্ছি,' বলল লোপেজ।

চোখের পাতায় হিমশীতল আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছে রানা। নরম কি যেন ঘষছে লোপেজ ওর চোখে। 'কি এটা, লোপেজ?'

'কাঠ কয়লা,' বলল লোপেজ। 'আইস গ্লেয়ারের প্রভাব দূর করতে সাহায্য করবে। এস্কিমোদের কৌশল।'

কয়েক মিনিট পর সাহস করে চোখ মেলল রানা। স্বস্তির পরশ অনুভব করল সর্বশরীরে, এখনও স্বাভাবিক নয় দৃষ্টিশক্তি, কিন্তু মোটামুটি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছে। লোপেজের দিকে তাকাল ও, কাঠ-কয়লার গুঁড়ো দিয়ে মিলারের চোখ ম্যাসেজ করছে সে। এখনও ব্যথা করছে চোখ দুটো ওর। কুঁচকে আছে চারপাশের চামড়া। বুঝল, পাহাড় অভিযাত্রীরা এই আইস গ্লেয়ারের কবল থেকে মুক্ত থাকার জন্যেই গাঢ় রঙের চশমা ব্যবহার করে।

উঠে দাঁড়াল লোপেজ, রানার দিকে ঘুরল। তার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল রানা। চোখে কাঠ কয়লা মেখে ভূত সেজে আছে লোপেজ। 'তোমাকেও খুব ভাল দেখাচ্ছে না, রানা,' বলল সে।

স্ট্র্যাপ খুলে সুটকেসটা নামাল লোপেজ। প্যাড হিসেবে যে চাদরটাকে সুটকেসের পাশে ব্যবহার করছিল এতক্ষণ সেটাকে ছিঁড়তে শুরু করল ও। বলল, 'তোমার চাদরটাও বের করো, রানা। মাথায় ওটা পাগড়ীর মত করে বেঁধে নিলে চোখ দুটো খানিকটা রক্ষা পাবে।'

মিলারের মাথাতেও পাগড়ী বেঁধে দিল লোপেজ।

'ওঠো এবার,' মিলারের পাঁজরে আঙুলের খোঁচা দিয়ে সিধে হলো রানা, পিছন দিকে তাকাল। এখনও কেবিনগুলো দেখতে পাচ্ছে ও, আন্দাজ করল খুব বেশি হলে পাঁচশো ফিট উপরে উঠেছে ওরা, কিন্তু দূরত্বের হিসেবে আরও অনেক বেশি চলে এসেছে। পাশ কাটিয়ে এগোল মিলার, তাকে অনুসরণ করল ও।

দুপুর বেলা পর্বতের কাঁধটাকে ঘুরে এসে যেখানে থামল সেখান থেকে গিরিপথের দিকে যাবার পথটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেখার উৎসাহ নেই, হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল রানা। নাক আর মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে, যেন ফোঁপাচ্ছে সে। আর মিলার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান শুয়ে পড়ল, মাথায় লাঠির ঘা বসিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে লোপেজ, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে গিরিপথটার দিকে, চোখের চারপাশের চামড়া কুঁচকে রয়েছে তার। 'যতদূর মনে পড়ছে,' বলল সে, 'এই রকমই দেখেছিলাম। একটুও বদলায়নি।' একটু থেমে আবার সে বলল, 'এখানে বিশ্রাম নেব আমরা।'

মিলারকে এড়িয়ে রানার পাশে গিয়ে থামল সে। 'তুমি ঠিক আছ, রানা?'

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে বলল রানা, 'একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'রান্নার আয়োজন করছি আমি,' বলল লোপেজ। 'জোর করেই পেটে কিছু ঢোকাতে হবে।'

'অসম্ভব, লোপেজ।' আঁতকে উঠল রানা। 'আমাকে কিছু মুখে দিতে বলো না, প্লীজ।'

'আগে দেখোই না কি এটা আমার হাতে,' সুটকেস থেকে ফ্রুটের একটা ক্যান বের করে দেখাল লোপেজ। 'মধুর মত মিষ্টি, আমাদের এনার্জি বাড়াতে সাহায্য করবে।'

ঠাণ্ডা বাতাসে হিহি করছে ওরা। লেদার জ্যাকেটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে রানা, দেখছে বরফ খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরি করছে লোপেজ। 'কি করছ তুমি?'

'স্টোভটা গর্তের ভিতর না বসালে বাতাসে নিভে যাবে আগুন,' বলল লোপেজ, খালি একটা ক্যান রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'বরফ ভরে স্টোভে চড়াও এটা। গরম কিছু খাওয়া দরকার আমাদের। মিলারকে দেখছি আমি।'

বরফ গলতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় লেগে গেল। প্রথমে মিলারকে খেতে দিল ওরা ক্যানভর্তি পানি। খেতে দেরি করল বলে পানিটুকু আর গরম থাকল না। গলায় বরফ আটকে খক খক করে কাশতে শুরু করল সে। আবার বরফ চড়াল রানা।

'ওপরে তাকিয়ে গিরিপথটা এখনও দেখিনি আমি,' বলল রানা। 'দেখে কি মনে হলো তোমার?'

ফলের ক্যানটা খুলছিল লোপেজ, মুখ তুলে তাকাল সে। বলল, 'খারাপ। তবে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করিনি আমি। অসংখ্য চিড় ধরা একটা গ্লেসিয়ার রয়েছে ওখানে।'

পানি খেয়ে ফুটো করা ফলের ক্যানটা লোপেজের হাত থেকে নিল রানা। প্লেন-দুর্ঘটনার পর এই প্রথম কিছু মুখে তুলে স্বাদ পাচ্ছে। প্রায় তড়িৎ গতিতে অনেকটা শক্তি ফিরে এল ওর শরীরে। পিছন ফিরে তাকাল ও। মাইনটা দৃষ্টিপথের বাইরে, কিন্তু অনেক দূরে নদীর খাদটা দেখতে পাচ্ছে কয়েক হাজার ফিট নিচে। ব্রিজটা আছে ওখানে কোথাও, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে এগোল রানা গিবিপথটা দেখার জন্যে। ওর ঠিক নিচেই রয়েছে গ্লেসিয়ারটা। গুঁড়ো, আধসেরী থেকে শুরু করে কয়েক টন ওজনের বরফের অজস্র খণ্ড আর তার মাঝখানে আঁকাবাঁকা কাটাকুটি দাগের মত শত সহস্র ফাটল। প্রায় তিন হাজার ফিট নিচে গিয়ে শেষ হয়েছে গ্লেসিয়ারটা, সেখানে নীল পানিতে টইটম্বুর একটা পাহাড়ী লেক দেখতে পাচ্ছে রানা। তাকিয়ে আছে, এমন সময় বাতাসে চাবুক মারার তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে দূরে কোথাও কড় কড় কড়াৎ করে বজ্রপাত হলো যেন। সেই সাথে লেকের মাঝখানে পানির নিচ থেকে আকাশের দিকে লাফ দিয়ে উঠল একটা সাদা স্তম্ভ।

'খুব ধীরে এখানে সেখানে আগুপিছু করছে বরফ,' পিছন থেকে বলল লোপেজ। 'পাথরের প্রাচীর আর গ্লেসিয়ারের মাঝখানে একটা লেক সব সময়ই দেখা যায়। কিন্তু লেকের ব্যাপারে আমরা উৎসাহী নই। আমাদেরকে যেতে হবে ওখানে।' হাত তুলে গ্লেসিয়ার উপরটা দেখাল সে।

গিরিপথের সামনের উপত্যকাটা হঠাৎ সাদাটে ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেল, এবং দীর্ঘ দশ সেকেন্ড পর ভেসে এল গম্ভীর মেঘ ডাকার আওয়াজ। 'উঁচু পাহাড়ে সারাক্ষণ একটা নড়াচড়া হচ্ছেই।' বলল লোপেজ। 'পাথর আসলে বরফকে স্থায়ী আসন পাততে দেয় না। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য জায়গায় ধস নামছে তুষারের।'

উপর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। জানতে চাইল, 'কতটা ওপরে উঠতে হবে আমাদেরকে?'

'প্রায় পাঁচশো মিটার—কিন্তু গ্লেসিয়ারটা পেরোবার জন্যে তার আগে খানিকটা নামতে হবে।'

'গ্লেসিয়ারটাকে ঘুরে যাওয়া কি সম্ভব?'

নিচের লেকের দিকে তর্জনী তাক করল লোপেজ। 'একহাজার মিটার নামতে হবে তাহলে। তার মানে আরও একটা রাত কাটাতে হবে পাহাড়ে।'

গ্লেসিয়ারটাকে গম্ভীর মুখে দেখছে রানা। এই প্রথম ভয়ের একটা ঠাণ্ডা গিঁট তৈরি হলো ওর তলপেটে। এখন পর্যন্ত কোন বিপদের দেখা পায়নি ওরা, বরফের উপর দিয়ে অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটার হাড়ভাঙা খাটনি গেছে শুধু শরীরের উপর দিয়ে। কিন্তু সামনে এবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ওরা সত্যিকার বিপদের—রোদের তাপে তরল হয়ে ওঠা ভিত নিয়ে কোথায় কোন্ বরফের চাঁই ধসে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, কে জানে! তার ওপর রয়েছে অসংখ্য বরফ ঢাকা চিড় বা ফাটল।

ফিরে এসে যে যার সুটকেস তুলে নিল ওরা। কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে নিল লোপেজ, বরফের উপর বুদ্ধ মূর্তির ভঙ্গিতে বসে কোলের উপর অসাড়ভাবে পড়ে থাকা হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে মিলার। নিঃশব্দে তার পাঁজরে মৃদু একটা জুতোর খোঁচা মারল লোপেজ। গায়ে হাত পড়লেই নড়েচড়ে ওঠে মিলার, জানা হয়ে গেছে তার।

পরস্পরের সাথে বাঁধা দড়িটা পরীক্ষা করল রানা। তারপর আগের সেই ভঙ্গিতে আবার রওনা হলো ওরা।—প্রথমে অভিজ্ঞ লোপেজ, মাঝখানে বোঝাস্বরূপ মিলার, সবশেষে নির্ভরযোগ্য রানা।

নিচের দিকে নেমে গ্লেসিয়ারে পৌঁছানো—মাত্র দুশো ফিটের ব্যাপার—কিন্তু সময়টা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল রানার। লোপেজ অত্যন্ত সহজভাবেই উতরে গেল, আর মিলার এমনই বেঘোরে আছে যে তার চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে কিছু টেরই পাচ্ছে না।

এখানে পাথর ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু তাতে বরফ একেবারে নেই বললেই চলে, গিরিপথ থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র হু হু বাতাস পাথর থেকে চেঁছে নিয়েছে তুষার। কিন্তু পাথরগুলোর গায়ে পিচ্ছিল, পাতলা একটা স্তর রয়েছে বরফের। মসৃণ বরফে পা ফেলাই বিপজ্জনক, পা আটকাবার কোন উপায় নেই। পাহাড় অভিযাত্রীদের হাতে স্পাইক থাকে, সেগুলো বরফে গেঁথে নিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে তারা—কিন্তু ওদের সাথে সে-ধরনের কিছু নেই। এভাবে এগোনো পাগলের কাজ, ভাবল রানা।

প্রতি দশ পনেরো সেকেন্ড পর পর অত্যন্ত সাবধানে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে লোপেজ, কিভাবে এগোতে হবে পরামর্শ দিচ্ছে। 'তাড়াহুড়ো করে দরকার নেই। এক ইঞ্চি এগোতে পারলে মনে করবে এক মাইল পথ পেরিয়ে এসেছ। মিলার! কোথায় পা ফেলছ, ইউ ব্লাডি ফুল! ডানদিকে দেখতে পাচ্ছ না, ডানদিকে উঁচু হয়ে রয়েছে পাথরটা— হ্যাঁ, ওটার এপারে পা বাধাও—হ্যাঁ...'

গ্লেসিয়ারে নামতে দেড় ঘণ্টা সময় নিল ওরা। শেষ চল্লিশ ফিট বাকি থাকতে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজনই। বরফের প্লাস্টার ঢাকা পাঁচিল খাড়া নেমে গেছে। কি করতে হবে বলে দিল লোপেজ, এদিকের পাথর ভঙ্গুর, তার উপরই আধহাত লম্বা পেরেকগুলো হাতুড়ি ঠুকে গাঁথল সে। তারপর তিনটে দড়ির লুপ তৈরি করে নিজেদেরকে আটকে নিল সেগুলোয়। প্রথমে নেমে গেল রানা, লোপেজ

পাঁচিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে দড়িটা একটু সামনে বাড়িয়ে ধরে আছে। পাঁচিলের দিকে মুখ করে লুপের উপর বসল রানা। পা-দুটোর কাজ হবে পাঁচিলের গা থেকে শরীরটাকে দূরে সরিয়ে রাখা। 'সাবধান,' সতর্ক করে দিল ওকে লোপেজ। 'লাট্টুর মত ঘুরতে শুরু করো না যেন আবার। ধাক্কা লেগে ফেটে যাবে মাথার খুলি।'

যন্ত্র-মানবের মত এরপর লোপেজের নির্দেশ অনুসরণ করে নিচে নেমে এল মিলার। ভয়ের কোন চিহ্নমাত্র নেই তার চেহারায়। তার মনের অবস্থাও, ভাবল রানা, নিশ্চয়ই একেবারে খালি—ভাবলেশহীন।

সবশেষে লোপেজ। দড়িটার উপর নজর রাখার কেউ নেই তার বেলায়। টিপ বোতাম খোলার মত পট পট শব্দে পাথর থেকে বেরিয়ে এল পেরেকগুলো, শেষ দশ ফিট থাকতে ধপাস করে পড়ে গেল। দড়িটা নেমে এসে কুণ্ডলী পাকাল তার শরীরের পাশে। দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। 'লেগেছে কোথাও?'

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল লোপেজের, এই কষ্টের মধ্যেও হাসল সে, 'লেগেছে তো বটেই, জিজ্ঞেস করো হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা।' হাঁপাচ্ছে সে, হঠাৎ রানার হাত দুটো শরীর থেকে প্রায় ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল। 'পেরেক!' এক নিঃশ্বাসে বলল সে, 'পেরেকগুলো খোঁজো!'

তুষারের উপর থেকে তিনটে পেরেক খুঁজে বের করল রানা, আরেকটা কোথাও পাওয়া গেল না। গম্ভীরভাবে হাসল লোপেজ। 'পড়ে গিয়ে ভালই করেছি, তা নাহলে সবগুলো পেরেক ওপরে রয়ে যেত। পরে এগুলো কাজে লাগবে আমাদের। কিন্তু এখন থেকে পাথর এড়িয়ে চলতে হবে আমাদেরকে, বুঝলে? পাথরের ওপরের ওই পিচ্ছিল বরফে ক্র্যাম্পন ছাড়া পা ফেলা বোকামি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। দড়িটা তুলে নিয়ে নিজের কোমরের সাথে একটা প্রান্ত বাঁধছে সে, ওদিকে মিলারের কোমরে দড়ি পরাচ্ছে লোপেজ। বাঁধার কাজ শেষ করে গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা।

অন্য এক জগৎ দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে ও। প্রাণহীন, মানবসভ্যতা থেকে শত সহস্র কোটি যোজন দূরের অচেনা কোন গ্রহের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন। নিচে থেকে চাপ খেয়ে লক্ষ লক্ষ টন বরফ কুঁকড়ে উঠেছে, বাতাস আর রোদ কারিগরি ফলিয়ে তার চেহারা আর আকার করে তুলেছে কিম্ভূতকিমাকার। তির্যকভাবে উঠে গেছে আকাশের দিকে বিশাল সব বরফের স্তম্ভ, ঝুর ঝুর করে ঝরছে হালকা তুষারের কণা—চারদিকে যেন তুলো উড়ছে। এই স্তম্ভগুলো এক একটা হুমকি, যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। কোথাও সিঁড়ির প্রশস্ত ধাপের মত উঠে গেছে উপর দিকে, গিয়ে ঠেকেছে আরেকটা সিঁড়ির ধাপের শেষ মাথার সাথে, দুই কি তিনশো ফিট উপরে। সরল, আঁকাবাঁকা অসংখ্য চিড় দেখতে পাচ্ছে রানা, কোনটা ছোটখাট, কোনটা পঞ্চাশ থেকে একশো দেড়শো গজ লম্বা। কোন চিড়ের ভিতর আড়াআড়িভাবে দু'দশটা ট্রাক ঢুকে যেতে পারবে। প্রশস্ত ফাটলের উপর ঝুলন্ত সেতু দেখতে পাচ্ছে রানা। কোথাও সেতুটা হয়তো একহাত চওড়া, কোথাও বিশ-পঁচিশ হাত, কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—মাঝখানে পাঁচ সাত গজ ফাঁক। রানা জানে, সব ফাটল চোখে ধরা পড়ে না। সেগুলো

সাংঘাতিক ফাঁদ এক একটা। ফাটলের উপর নিরীহ চেহারার পাতলা বরফের স্তর থাকে, দেখে চেনার উপায় নেই যে এর নিচেই লুকিয়ে আছে মৃত্যু। একটু চাপ পড়লেই ভেঙে যাবে বরফের ঢাকনি, হুড়মুড় করে ধসে পড়বে অনেক নিচে। দুশ্চর এই ভয়ঙ্কর এলাকার উপর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে ওদেরকে।

'ওপারে যেতে কতটা পথ?' জানতে চাইল রানা।

'আধমাইলের কিছু কম,' আইস-অ্যাক্সটা শক্তভাবে হাতে নিয়ে বলল লোপেজ। 'সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, চলো, এগোনো যাক।'

দ্রুত এগোতে চাইছে লোপেজ। পা ফেলার আগে প্রতিটি ফুট আইস-অ্যাক্সের হাতল ঠুকে পরীক্ষা করে নিচ্ছে সে। লক্ষ্য করল রানা, পরস্পরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছে সে, এবং দড়িটাকে দুই ফেরতা করে নিয়েছে—ফলে অর্ধেক কমে গেছে সেটার দৈর্ঘ্য।

মিলারের চলার গতি একটু ঢিলে হলেই টান পড়ছে দড়িতে, অমনি তাড়া দিচ্ছে লোপেজ, 'পা চালাও, পা চালাও।'

ঝুঁকে পড়ে এক মুঠো তুষার তুলে নিল রানা। এদিকের তুষার অনেকটা পাউডারের মত, ভালভাবে গোল পাকানো যায় না, দড়িতে একটু ঢিল পড়লেই তুষারের বল ছুঁড়ে মিলারের ঘাড়ে মারছে ও।

এমনিতে প্রচণ্ড খাটনির পথ, তার উপর বার কয়েক ওদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে গেল লোপেজ যেখান থেকে পিছু হটে আসতে হলো। খাড়া প্রাচীর তিনবার পথরোধ করে দাঁড়াল, দু'বার প্রশস্ত দুটো ফাটলের সামনে পড়ল। পাঁচবারই পিছিয়ে এসে নতুন পথ খুঁজতে হলো ওদেরকে। একবার ওরা বরফের উঁচু পাঁচিল ঘেরা গোলকধাঁধায় হারিয়ে ফেলল নিজেদেরকে। এক গলি থেকে আরেক গলিতে, সেখান থেকে ক'বার মোড় নিয়ে আবার সেই প্রথম গলিতে ফিরে আসা। কোন অভিযোগ নেই মিলারের, মাথা নিচু করে টলতে টলতে অনুসরণ করে যাচ্ছে লোপেজকে। গোলকধাঁধায় পড়ে দিক হারিয়ে ফেলল রানা, পুব পশ্চিম জ্ঞান লোপ পেল ওর। বিড় বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে এদিকে লোপেজ। 'দূর, ছাই, বেরুতে পারছি না কেন!'

যে-পথে এই গোলকধাঁধায় ঢুকেছে ওরা সেটাকেও এখন আর চেনার উপায় নেই। দশ মিনিট আরও কেটে গেল অসহায়ভাব। বিপদ কাটেনি, কেটে যাবার কোন লক্ষণও দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

এদিকে পায়ে কোন সাড়া পাচ্ছে না রানা, পায়ের আঙুল এবং গোড়ালির অবস্থাও তাই। পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কা বোধ করল ও। কথাটা জানাল লোপেজকে। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ল লোপেজ। 'বসে পড়ো,' দ্রুত বলল সে। 'বুট জোড়া খোলো পা থেকে।'

পা থেকে পট্টি খুলে ফেলল রানা। অসাড়, শক্ত হয়ে ওঠা আঙুল দিয়ে বুটের ফিতে খুলতে চেষ্টা করছে ও। প্রায় পনেরো মিনিট লেগে গেল এই সহজ কাজটা করতে। নরম ফিতেগুলো ঠাণ্ডায় শুটকি মাছের মত শক্ত হয়ে বেঁকে গেছে, অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে হাতের আঙুলগুলো, এবং ব্রেনটা শরীরটাকে ঠিকমত কন্ট্রোল করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত পা থেকে জুতো এবং মোজা জোড়া খুলতে পারল

নিজের চেষ্টাতেই।

খুঁটিয়ে রানার পায়ের গোড়ালি দুটো পরীক্ষা করল লোপেজ। 'গোড়ালিতে ফ্রস্ট-বাইট শুরু হয়েছে সবে। তুমি বাঁ পা-টা ঘষো, আমি ডান পায়ে ঘষছি।'

দ্রুত এবং চাপ দিয়ে গোড়ালিটা ঘষছে রানা, এতটুকু সাড়া পাচ্ছে না ও। অপর পায়ের গোড়ালিটা নির্মমভাবে ঘষে চলেছে লোপেজ। রক্ত প্রবাহ আবার শুরু হতেই ব্যথায় গোঙাতে শুরু করল রানা, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে গায়ের জোর লাগিয়ে দ্রুত গতিতে ম্যাসেজ করে যাচ্ছে লোপেজ। 'এটা আর ঘটতে দিয়ো না,' রানাকে বলল। 'গোড়ালিটা এবং পায়ের পাতা জুতোর ভিতর নাড়াচাড়া করতে হবে। হাতের আঙুলের কি অবস্থা, দেখি?' রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতের আঙুল পরীক্ষা করল লোপেজ। 'ঠিক আছে। কিন্তু হাত পায়ের আঙুল, গোড়ালি, কানের লতি এবং নাকের ডগার ওপর খেয়াল রাখতে হবে তোমার। একটু পরপর ঘষবে এগুলো।' ঘাড় ফিরিয়ে মিলারের দিকে তাকাল, দেখল পা দুটো ছড়িয়ে বরফের উপর বসে আছে সে, বুক ছুঁয়ে আছে চিবুকটা। 'ওর কি অবস্থা?'

বহুকষ্টে আড়ষ্ট পা দুটোকে জুতোয় ভরে ফিতে লাগাল রানা, তারপর জুতোর উপর থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পট্টি বাঁধল। মিলারের জুতো খুলতে হিমশিম খাচ্ছে লোপেজ, তাকে সাহায্য করল ও। নিষ্প্রাণ একটা পুতুলের মত স্থির হয়ে আছে মিলার, সাহায্যও করছে না সে, বাধাও দিচ্ছে না। রানার চেয়ে ওর পায়ের অবস্থা খারাপ। দু'জন মিলে ঝাড়া দশ মিনিট অবিরত ম্যাসেজ করার পর গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। মুখ তুলে তাকিয়ে রানা দেখল তার খোলা চোখের মণি দুটো আবার এক আধটু নড়তে শুরু করেছে।

'একা পেয়ে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ আমাকে···ঠিক আছে!'

মিলারের কথা কানে তুলছে না ওরা। নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ দিগ্বিদিক হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে। 'মেরে ফেলছে আমাকে···ছাড়ো···'

'অ্যাই!' চোখ রাঙাল লোপেজ। 'নড়ো না। আর একটু ম্যাসেজ করতে দাও।'

শেষ পর্যন্ত ওকে ছেড়ে দিল ওরা। নিজের চেষ্টাতেই জুতোয় পা ভরে ফিতে বেঁধে নিল সে। পট্টি বাঁধার সময় পাহাড় আর বরফকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গালিগালাজ বেরুতে শুরু করল তার মুখ থেকে।

লোপেজের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা। আইস-অ্যাক্সটা তুলে নিয়ে বলল লোপেজ, 'এই গোলকধাঁধা থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে না পারলে জানি না আমাদের কপালে কি আছে। এসো, আবার চেষ্টা করা যাক।'

প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ওরা। 'দিকভ্রান্ত হয়ে গেছি আমরা,' বলল রানা, 'তুমি বলতে পারবে কোন্ দিকে মুখ করে এগোচ্ছি এখন আমরা?'

'কম্পাস থাকলে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হত না,' বলল লোপেজ। 'সম্ভবত পুব দিকে যাচ্ছি আমরা।'

আলো হঠাৎ যেন কমে যাচ্ছে, টের পেয়ে মাথার উপর তাকাল রানা। দেখল প্যাসেজের উপর বরফের সিলিং শুরু হয়েছে।

'এদিকে এর আগে আসিনি আমরা,' বলল লোপেজ। 'দেখা যাক কোথায়

;পৌঁছাই। সাবধান, দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ো না, নাড়া খেলে সিলিং খসে পড়তে পারে।'

আরও পাঁচ মিনিট হাঁটল ওরা। এর মধ্যে বাঁক নিল সাতবার।

'গ্লেসিয়ারের ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছি আমরা বলতে পারবে?'

'মাঝখানে কোথাও,' বলল লোপেজ।

হঠাৎ নিজেদেরকে ওরা করিডরের বাইরে, একটা ফাটলের সামনে আবিষ্কার করল। গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছাড়ল রানা। কিন্তু লোপেজের চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, ফাটলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে শুধু বলল, 'এটা পেরোতে হবে—কোনদিকে আর কোন পথ নেই।'

ফাটলের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটা সেতু রয়েছে, দুই প্রান্ত ছুঁয়ে ঝুলছে ভঙ্গুর বরফের একটা লম্বা পাত। কিনারার কাছে গিয়ে থামল রানা, উঁকি দিয়ে অস্পষ্ট সবুজাভ গভীরতার দিকে তাকাল ও। অনেক নিচে নিশ্চয়ই কোথাও তল আছে এই ফাটলের, কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না।

'লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে যদি এগোই,' রানার পাশ থেকে বলল লোপেজ, 'ওজনের চাপ ভাগ হয়ে যাবে—বরফটা ভেঙে পড়বে না'। রানার বুকে টোকা মারল সে। 'তুমি আগে।'

আচমকা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল মিলার। 'আমাকে মেরে ফেললেও ওটার ওপর দিয়ে যাব না—তোমাদের মত এখনও পাগল হইনি আমি।'

'যা করতে বলা হচ্ছে করো,' বিরক্তির সাথে বলল রানা। ব্রিজে পা দিতে ভয় লাগছে ওরও, কিন্তু বিকল্প কোন উপায় নেই দেখে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে ও।

ব্রিজটা পনেরো ফিট লম্বা তাই নতুন ভাবে নিজেদেরকে দড়ি দিয়ে বাঁধল লোপেজ। সন্তর্পণে এগোচ্ছে রানা।

'কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নয়,' বলল লোপেজ। 'শুয়ে পড়ো, তারপর হাত আর পা ঠেলে এগোও—সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে।'

ফাটলের কিনারায় শুয়ে পড়ল রানা। একটু একটু করে বুক ঘষে এগোচ্ছে। অর্ধেক শরীর ব্রিজের উপর চলে এসেছে ওর। চওড়ায় ব্রিজটা মাত্র ছয় ফিট, একদিকে একটু ঢালু। কিনারা থেকে ঝুর ঝুরে তুষার খসে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। কোমরে বাঁধা দড়িটা থাকায় সাহস পাচ্ছে ও, কিন্তু এও জানে যে হ্যাঁচকা টান সহ্য করার মত শক্তি এ-দড়ির নেই। ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যখন পৌঁছুল ও, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে কপালে।

দশ সেকেন্ড পড়ে থাকল রানা, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল।

ওপারে দাঁড়িয়ে হাসছে লোপেজ। 'ঠিক আছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বরফ হয়ে ওঠার আগেই কপাল থেকে ঘামের বিন্দুগুলো মুছে ফেলল ও।

'কিন্তু আমাকে তোমরা ওটার ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না,' চেঁচিয়ে উঠল মিলার।

'দু'দিক থেকে দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা হবে তোমাকে,' এপার থেকে বলল রানা, 'খুব বেশি চাপ না পড়লে ওটা ভাঙবে না—আর যদি ভাঙেও, দড়ি তো রয়েছেই—কোনও ভয় নেই পড়ে যাবার।'

'এসব ছেলে ভুলানো কথা...'

'চলে এসো, লোপেজ,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা, 'স্টুপিড বাস্টার্ডটা থাকুক ওখানে।'

কেঁপে গেল মিলারের কণ্ঠস্বর, 'আ-আমাকে ফেলে রেখে যাবে নাকি?'

'বেশ, নাহয় তুমিই বলে দাও কি করা উচিত আমাদের?'

উত্তর দিতে না পেরে অসহায় ভাবে চুপ করে আছে মিলার। একটা হাত বাড়িয়ে তার ঘাড় চেপে ধরল লোপেজ। 'বসো!'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল মিলার। ব্যথায় নয়, ভয়ে। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে ফাটলের কিনারায়।

'শোও,' মিলারের ঘাড়ে চাপ একটু বাড়াল লোপেজ।

ফোঁপাচ্ছে মিলার। তবে শুয়ে পড়তে দেরি করল না।

'ব্যস্ত ভাবে নয়, ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোও,' ঘাড় থেকে হাত তুলে নিয়ে বলল লোপেজ। এগোতে শুরু করল মিলার। লোপেজের প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হলো সে। যত নিষেধ করছে লোপেজ; তত বেশি কাঁপছে সে। শরীরটাকে ব্রিজের উপর সোজাসুজি রাখতে পারল না, পা দুটো ঝুলে পড়ল একবার কিনারা থেকে। দম বন্ধ করে এপার থেকে দেখছে রানা। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে মাথায় কি ভূত চাপল, পাগলের মত হাত পা নেড়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল সে। পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল প্রথমবার, কিন্তু দ্বিতীয় বার সফল হলো সে। ওদিকে হায় হায় করছে লোপেজ, চিৎকার করে আবার শুয়ে পড়তে বলছে রানা—কিন্তু কারও কথায় কান না দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিলার, ছুটল ঝুলন্ত সেতুর উপর দিয়ে রানার দিকে।

অকস্মাৎ তুষার কণার একটা মেঘ ঘিরে ফেলল রানাকে, এবং ছুটে এসে মুখোমুখি ধাক্কা মারল ওকে মিলার। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রানা! পরমুহূর্তে একটা গর্জন শুনতে পেল ও। গর্জনটা ফাটলের নিচ থেকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। উঠে বসল রানা। দেখল ফাটলের মাঝখানে সেতুটার চিহ্নমাত্র নেই, উপরে তুষার কণা উড়ছে, ওপারে অসহায় ভাবে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে লোপেজ।

নয়

ফাটলের ধারে মুখ থুবড়ে বরফের উপর পড়ে আছে মিলার। সেতু পেরিয়ে কঠিন জায়গায় পৌঁছুবার আনন্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

মাথাটা একদিকে একটু কাত্ করে দু'কোমরে হাত রেখে অসহায়ভাবে

ফাটলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে লোপেজ। এপার থেকে তার বুকের উত্থানপতন দেখে বুঝতে পারল রানা, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর ঝুঁকে পড়ল, উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে সে ফাটলের সবুজাভ অতল তল।

বরফের সেতুটা সম্পূর্ণ খসে পড়ে গেছে। দুই কিনারার মাঝখানে এখনও বাতাসে ভর করে ভাসছে লক্ষ-কোটি তুষার কণা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে থাবা মারল মিলারের ঘাড়ে, তাকে টেনে দাঁড় করাল দু'পায়ের উপর, তারপর ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড়া লাগাল তার গালে। 'স্বার্থপর শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'শুধু নিজের দিকটাই তোমার কাছে বড়!'

কাঁধের উপর মিলারের মাথাটা এদিক ওদিক হেলছে দুলছে, তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল রানার পায়ের কাছে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে সে। কষে একটা লাথি মারল রানা তার পাঁজরে, তারপর লোপেজের দিকে তাকাল। 'কি করব এখন আমরা?'

উত্তর না দিয়ে সুঠামদেহী লোপেজ ক্ষীণ একটু হাসল। আইস-অ্যাক্সটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে কানের পাশ দিয়ে মাথার পিছনে নিয়ে গেল সে, বলল, 'সরে দাঁড়াও।' রানা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে দেখে আইস-অ্যাক্সটা ছুঁড়ল সে। রানার পায়ের কাছ থেকে দেড় হাত দূরে এসে বরফে গেঁথে গেল সেটা। 'ঝুলে বোধহয় ওপারে যেতে পারব,' বলল সে। 'হাতুড়ি ঠুকে যতটা পারো বরফে গাঁথো অ্যাক্সটা।'

কোমরে বাঁধা দড়ির উপর আঙুল রাখল রানা। 'এই পচা দড়ি তোমার ওজন সইতে পারবে বলে মনে করো?'

দৃষ্টি দিয়ে দূরত্বটা মেপে নিল লোপেজ। 'যা দড়ি আছে, তিন ফেরতা করা যাবে। তিন প্রস্থ দড়ি আমার ওজন সইতে না পারলে সেটা দড়ির দোষ, আমাদের করবার কিছুই নেই। নাও, শুরু করো কাজ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর বরফে আইস-অ্যাক্সটা গাঁথতে শুরু করল হাতুড়ি ঠুকে। জানে ও, লোপেজের একার নয়, ওদের সবার প্রাণ বিপন্ন। সাহায্য নিয়ে দ্রুত রবিনের কাছে ফিরতে না পারলে ব্রিজের কাছে ওদের আটজনের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শূন্য। এদিকে লোপেজ যদি দড়ি ঝুলে এপারে আসতে গিয়ে নিজেকে খুইয়ে বসে, গিরিপথে পৌঁছানো তো দূরের কথা, গ্লেসিয়ারের এই বেঢপ জগতে পথ খুঁজে নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো তার পক্ষে কোন কালেও সম্ভব হবে না। মিলারকে গুনতির মধ্যেই ধরা যায় না, প্রথম থেকেই সে একটা ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কঠিন বরফে আইস-অ্যাক্সটা তিন ভাগের দুই ভাগ গেঁথে নিয়ে টেনে পরীক্ষা করল রানা। তারপর ফিরল মিলারের দিকে। ফুলবাবু-লোকটা ফোঁপাচ্ছে, মুখ ঘষছে বরফে। তার কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিল রানা। দড়ির প্রান্তগুলো ফাটলের ওপারে ছুঁড়ে দিল ও। নিজের কোমরে সেগুলো বেঁধে নিল লোপেজ, তারপর বসে পড়ল ফাটলের কিনারায়। দুই হাঁটুর ফাঁক দিয়ে নিচের গভীরতার দিকে চেয়ে আছে সে। কিন্তু উদ্বেগ বা ভীতির চিহ্নমাত্র নেই তার চেহারায়।

একত্রিত করা দড়ির প্রান্তগুলো আইস-অ্যাক্সের সাথে বাঁধল রানা কষে। একটা লুপ তৈরি করে আটকাল নিজের কোমরে, তারপর জুতোর ডগা দিয়ে ঘা মেরে বরফ খুঁড়ে দুটো গর্ত তৈরি করল গোড়ালি রাখার জন্যে। বলল, 'যতটা সম্ভব টান দিয়ে রাখছি দড়িতে।'

দড়িটা টেনে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো লোপেজ। একটু থেমে বলল, 'কিনারা আর দড়ির মাঝখানে কিছু একটা রাখো, তা না হলে পিছলে সরে যাবে দড়ি।'

মাথার পাগড়ী খুলে সেটাকে আরেকভাবে ভাঁজ করে একটা প্যাড তৈরি করল রানা। ফাটলের কিনারা আর দড়ির মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল সেটাকে।

নাড়া দিয়ে টেনে আবার দড়িটা পরীক্ষা করল লোপেজ। পনেরো ফিট দূরে ফাটলের ওদিকের দেয়ালে কতটা জোরে গিয়ে ধাক্কা খাবে সে তার একটা আনুমানিক হিসাব করে নিল। পা দুটো বেকায়দাভাবে দেয়ালে বাড়ি খেলে মট করে ভেঙে যাবে হাড়, বুঝতে পারছে। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল তার। পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল সে শূন্যে।

তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা, অকস্মাৎ টান অনুভব করল দড়িতে, তারপর নিচের দেয়ালের সাথে লোপেজের বুটের সংঘর্ষের আওয়াজ পেল। টান টান দড়িতে হঠাৎ কোন ঢিল পড়ছে না দেখে স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল ও; বুকের ভেতর থেমে গেল কাঁপুনিটা। পেরেছে লোপেজ, ভাবছে ও, এখন শুধু দড়ি ধরে উঠে আসতে হবে তাকে।

যেন এক যুগ পর কিনারার উপর মাথা দেখা গেল লোপেজের। তাকে টেনে তোলার জন্যে এগিয়ে গেল রানা। নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে লোপেজকে। আশ্চর্য একটা মানুষ, ভাবল রানা, যে-কোন বিপদে অবিচল থাকার মত এমন শক্ত নার্ভ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। মানুষের এ-ধরনের গুণকে সমীহ করে রানা।

কিনারার কাছে বসে মুখ থেকে ঘাম মুছছে লোপেজ। মিলারকে দেখিয়ে বলল, 'ওর বোকামির জন্যে সামনে আরও যে কত বিপদে পড়তে হবে···'

'কি করব ওকে নিয়ে আমরা?' হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। 'চুকিয়ে ফেলব ঝামেলা?' পকেটে হাত ভরে পিস্তলটা ছুঁলো ও।

এখনও বরফের কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে মিলার, বিড় বিড় করছে।

উঠে দাঁড়াল লোপেজ। প্লেন থেকে পাওয়া কুঠারটা খুলে নিল কোমরের বেল্ট থেকে। রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সে। 'সবার কথা ভাবছি আমি। এ লোক আমাদের সাথে থাকলে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারব না। এর জন্যেই আমাদের সবাইকে মরতে হবে। আমাদের সবার স্বার্থে এর বেঁচে থাকা চলে না।'

লোপেজের আশ্চর্য শান্ত অথচ দৃঢ় কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। রাগ পানি হয়ে গেছে ওর। হোক নীচ, স্বার্থপর এবং বোকা, তাই বলে ঠাণ্ডা মাথায় একজন লোককে খুন করা যায় না।

'না,' বলল রানা। 'রাগের মাথায় এমন কিছু করা উচিত হবে না যার ফলে সারা জীবন কষ্ট পায় আমাদের বিবেক।'

'এর বোকামির জন্যে তোমার বান্ধবী যদি মারা যায় ব্রিজের ধারে তোমার

বিবেক কষ্ট পাবে না?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। মুহূর্তের জন্যে স্বার্থপর মনে হলো নিজেকে। উদ্ধার পাবার আশা নেই, এমন একটা বিপদে ফেলে রেখে এসেছে ওদেরকে সে। তারপর ভাবল, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। বাঁচতে হলে বাইরে থেকে সাহায্য দরকার, এবং সে-সাহায্য পেতে হলে কাউকে না কাউকে গিরিপথ পেরোতেই হবে। না, সোহানাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসে ভুল করেনি সে, পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। এবং সাহায্য সংগ্রহ করে ওদেরকে সে উদ্ধারের ব্যবস্থা যে ভাবেই হোক করবে এতেও কোন সন্দেহ নেই। সোহানাকে একদল সন্ত্রাসবাদীর হাতে পড়তে দেবে না সে। সুতরাং, মস্ত বাধা মিলারকে সরিয়ে দেয়াই একান্ত দরকার।

রানার চিন্তাভাবনাগুলো পরিষ্কার পড়তে পারছে লোপেজ। মিলারের দিকে এক পা এগোল সে। 'এখন বুঝতে পারছ তো, ওর বেঁচে থাকা চলে না?'

লোপেজের চোখে চোখ রাখল রানা। 'সব বুঝতে পারছি আমি,' বলল ও। 'কিন্তু অসহায় একজন লোককে এভাবে খুন করতে পারবে তুমি?'

আরও এক পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল লোপেজ, মিলারের মাথা লক্ষ্য করে তুলল কুঠারটা, বলল, 'পারি কি না পারি দেখো...'

দ্রুত লোপেজের হাত ধরে ফেলল রানা। 'না, লোপেজ। তুমি খুনী নও, এ-কাজ তোমার সাজে না।'

পেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। কয়েক সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করে ক্ষান্ত হলো লোপেজ। বলল, 'তোমার জেদের কাছে আমি হার মানলাম, রানা। আফটার অল, তুমি আমার চেয়ে সব দিক থেকে বড়। কিন্তু, কাজটা করতে দিলে ভাল করতে—একথা একসময় নিজেই স্বীকার করবে তুমি। দেখো, আমাদের সবার জন্যে ও একটা অভিশাপ।' হাতের কুঠারটা পায়ের কাছে ফেলে দিল সে।

সর্বমোট সোয়া তিন ঘণ্টা লাগল ওদের গ্লেসিয়ারটা পেরোতে। ইতিমধ্যে ক্লান্তির প্রায় চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে রানা, কিন্তু বিশ্রামের জন্যে সময়ের বরাদ্দ পাওয়া গেল না লোপেজের কাছ থেকে। 'দিনের আলো থাকতেই যতটা সম্ভব ওপরে উঠে যেতে হবে,' বলল সে। 'আজ রাতে এমনিতেই আমরা সাংঘাতিক ক্লান্ত থাকব, তার ওপর তাঁবু এবং উপযুক্ত পোশাক ছাড়া খোলা জায়গায় যদি রাত কাটাতে হয়, একজনও বাঁচব না আমরা।'

অতি কষ্টে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল রানা। কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ সে-ব্যাপারে টনটনে, নিখুঁত ধারণা রাখে লোপেজ, তার যুক্তি খণ্ডন করতে যাওয়া বৃথা। জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে মিলারকে দাঁড় করাল ও। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বেশ। পথ দেখাও।'

একটু অপ্রতিভ দেখাল লোপেজকে। বলল, 'সামনের পথ অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল। আমি চাই, তুমি পথ দেখাও, রানা।'

অবাক হলো রানা। বিপদকে ভয় পাবার লোক তো লোপেজ নয়। ওর মনের কথা বুঝতে পেরে একটু হাসল লোপেজ, বলল, 'যতটুকু যোগ্যতা রাখি, সেইটুকু

ঝুঁকি নিয়েছি আমি এতক্ষণ। কিন্তু সামনের পথে যে বাধাগুলোর আশঙ্কা করছি সেগুলোর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নই। আমার দোষে সবাই মারা পড়ি, তা চাই না। দরকার হলে পথ নির্দেশ দেব আমি পিছন থেকে, কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তোমার!'

লোপেজের অকপট স্বীকারোক্তিতে তার চরিত্রের আরেকটা গুণ বিকশিত হলেও, রানার মনে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধল। গম্ভীর হয়ে ভাবছে, কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করছে সে যে দায়িত্ব নিতে রাজী নয়? মুখ তুলে গিরিপথের দিকে তাকাল ও। বলল, 'গ্লেসিয়ার পেরোবার সময় নিচে নেমে এসেছি আমরা, তার মানে,' মনে মনে একটা হিসাব শেষ করল ও, তারপর আবার বলল, 'ষোলোশো থেকে দু'হাজার ফিটের মত ওপরে উঠতে হবে আমাদেরকে, তাই না?'

'তাই।'

ওদের বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ারের বিশাল বিস্তার, বিচিত্র ভঙ্গিতে নেমে গেছে নিচের দিকে। আবার উপর দিকে তাকাল রানা। ক্রমশ একটানা উঠে গেছে বরফের মাঠ—মাঝামাঝি দূরত্বে একসার পাথরের পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। 'ওটা টপকাতে হবে নাকি?' জানতে চাইল রানা।

গভীর মনোযোগের সাথে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল জায়গাটা লোপেজ, তারপর মাথা নাড়ল সে, বলল, 'তার দরকার হবে না। আমরা ওই ডানদিকের শেষ দেয়ালটার পাশ দিয়ে যেতে পারব বলে মনে করি। পাঁচিলগুলোর ওপরে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছুতে হবে। রাতটা ওখানে কাটাতে না পারলে বিপদ।' পকেট থেকে ছোট একটা লেদার ব্যাগ বের করল সে। 'হাত পাতো, এগুলো এখন দরকার তোমার।'

ব্যাগটা থেকে বের করে একডজন চৌকো কোকা বিস্কিট দিল লোপেজ। একটা মুখে পুরে চুষতে শুরু করল রানা। কটু, বিস্বাদ লাগল জিনিসটা।

মিলারকেও দেয়া হলো কয়েকটা বিস্কিট; কিন্তু মুখে পুরে একধারে ফেলে রাখল সে একটা বিস্কিট, চুষতে ভুলে গেল। আবার সে একটা নির্বোধ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে; দড়িতে টান পড়লে এগোয়, তা নাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে। আশপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয়।

পাঁচিলগুলোকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হলো ওদের, এবার সবার সামনে রয়েছে সতর্ক রানা, তার পিছনে প্রায় অচেতন মিলার, সবশেষে পরিশ্রান্ত, গম্ভীর লোপেজ।

কিন্তু কতটুকু সতর্ক বা সচেতন রানা, নিজেও ভাল বুঝতে পারছে না ও। কোকার প্রভাবে ক্লান্তি দূর হয়েছে, এবং সেই সাথে সম্ভবত কিছুটা চৈতন্য ও বোধশক্তি লোপ পেয়েছে ওর, মিলারের মত যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জাবর কাটার ভঙ্গিতে কোকা বিস্কিট চিবাচ্ছে, সামনের উঁচু বরফে আইস-অ্যাক্স গেঁথে নিয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে।

প্রথম দিকে জমাট বরফের পুরু স্তর এবং তার উপর ছড়ানো নরম তুষারের দেখা পেল ওরা, কিন্তু ক্রমশ পাতলা হয়ে এল বরফের স্তর, পিচ্ছিল বরফের চাদরের উপর এখন আর নরম তুষারের একটা কণাও নেই। এই পরিস্থিতিতে

ক্র্যাম্পন ছাড়া পাহাড়ে চড়া স্রেফ পাগলের কাজ, কোকার প্রভাব মুক্ত হলে এ-কাজে বোধহয় অগ্রসর হত না রানা।

পাথরের পাঁচিলগুলোর ওপরে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা সময় নিল ওরা। এবং পৌঁছেই নিরাশায় ছেয়ে গেল ওদের মন। পাঁচিলের কিনারা থেকে কয়েক ফিট দূরে একটা বরফের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। খাড়া উঠে গেছে বিশ ফিটের চেয়ে কিছু বেশি। দেয়ালের চওড়া মাথায় জমে আছে তুষারের স্তূপ, উচ্চতায় সেটা দেয়ালের তিনগুণের কম নয়। গিরিপথের সামনে আড়াআড়ি ভাবে কোথাও বিরতি না নিয়ে সোজা চলে গেছে দেয়ালটা অনেকদূর পর্যন্ত।

হাঁপাচ্ছে রানা। কথা বলার জন্যে দমটা আটকাল, কিন্তু বলার মত কোন শব্দ হাতড়ে না পেয়ে আবার হাঁপাতে শুরু করল ও।

কালো হয়ে গেছে লোপেজের মুখের চেহারা। দম ফুরিয়ে এসেছে তারও। বোকার মত তাকিয়ে আছে বরফের দেয়ালটার দিকে।

তিনবারের চেষ্টায় কথা বলতে পারল রানা, 'মাঝামাঝি জায়গায় দেয়ালটা একটু কম উঁচু মনে হচ্ছে। এসো। সাবধান, কিনারা থেকে যতটা পারো দূরে সরে থাকো।'

পাঁচিলের মাথাটা পিচ্ছিল বরফে মোড়া। প্রথমদিকে চওড়ায় সেটা খুবই কম, মাত্র ফুটখানেক। তবে যত সামনে এগোচ্ছে ওরা ততই চওড়ার দিকে বাড়ছে কার্নিসটা। ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে রানার হাঁটা, আরও দৃঢ়ভাবে পা ফেলছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা বাতাস উঠেছে পশ্চিম দিক থেকে, ক্রমশ বাড়ছে সেটা। রাতে এর হামলা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেয়ালের আড়ালটা খুব কাজ দেবে, ভাবছে রানা, কিন্তু সুযোগটা নিতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি। দেয়ালের মাথায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ফিট উঁচু তুষার জমে আছে, রাতের মধ্যেই সেটাকে ধসিয়ে দিতে পারে বাতাস।

কার্নিসের কিনারার দিকে সরে এল লোপেজ, নিচের দিকে তাকাতেই ঝাপসা গভীরতার মাঝখানে ফ্যাকাসে রঙের কুয়াশা দেখতে পেল ও। শিউরে উঠল শরীরটা, কিনারা থেকে সরে এল নিরাপদ দূরত্বে। লক্ষণ ভাল নয়, বুঝতে পেরেছে সে, আজ রাতে তুষারপাত ঘটবে। মিলার হেলে দুলে এগোচ্ছে, তার চলার গতি কমে আসছে দেখে একটা ধমক লাগাল।

এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরের ঘটনা। অকস্মাৎ বরফে পা হড়কে গেল লোপেজের। এর আগেও কয়েকবার এভাবে পিছলেছে পা, এবং প্রতিবার নিপুণ দক্ষতার সাথে মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়ে উঠেছে বিপদটা। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, পতনটা রোধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে অপর পায়ে ভর দিয়ে লাফ দিল সে কাছিমের পিঠের মত ফুলে ওঠা বরফের গা লক্ষ্য করে। কিন্তু বাড়ানো হাতটা সেখানে পৌঁছুল না। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোপেজ। চোখের নিমেষে নিজেকে সে চিৎ হওয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল বরফের উপর, দ্রুত বেগে ঢালু কার্নিসের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে কিনারার দিকে। হাত দুটো কোথাও আটকে নিজেকে থামাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে সে, পলকের জন্যে সাদা বরফে তাজা রক্তের লাল ফিতে দেখতে পেল সে। শরীরের অর্ধেকটা কিনারার বাইরে ঝুলে পড়েছে, এই

সময় আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। কিনারা ধরে ফেলে শেষ চেষ্টা করল লোপেজ, ধরলও, কিন্তু মট্ করে ভেঙে গেল বরফ, ছোট টুকরোটা রয়ে গেল তার মুঠোর ভিতর—খসে পড়ল সে নিচের দিকে।

লোপেজের চিৎকার শুনে এবং দড়িতে টান অনুভব করে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। নিমেষের মধ্যে আইস-অ্যাক্সটা বরফে গেঁথে ঝাঁকিটা সামলে নিল ও। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল কিনারার কাছাকাছি বরফের সাথে ধস্তাধস্তি করছে মিলার। তাকে টেনে কিনারার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে দড়িটা, এতক্ষণে তা বুঝতে পেরে ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল তার গলা থেকে। লোপেজের ছায়া পর্যন্ত কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা।

চরকির মত দুনিয়াটাকে চোখের সামনে ঘুরতে দেখতে পাচ্ছে লোপেজ। দড়ির শেষ মাথায় ঝুলছে সে। প্রথমে বিশাল আকাশের নীল বিস্তার, তারপর অকস্মাৎ বরফ মোড়া উপত্যকা, পরমুহূর্তে কুয়াশায় আধো ঢাকা কালচে পাহাড় শ্রেণী, সবশেষে নাকের কাছে ভিজে পাথর—একের পর এক পলকের জন্যে দেখতে পাচ্ছে সে। খাড়া নেমে গেছে পাঁচিলের গা তিনশো ফিট, তারপর শুরু হয়েছে বরফের ঢাল। দড়ি এঁটে বসায় বুকে, পাঁজরে তীব্র ব্যথা লাগছে তার। উপর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে মিলারের।

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে পিঠের পেশীগুলোকে শক্ত করে নিল রানা। পচা দড়িটা যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে ভেবে দুরু দুরু করছে বুকের ভিতর। মিলারের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দড়ি টানো—টেনে তোলো ওকে।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে এর মধ্যে মিলার, বরফের উপর ধস্তাধস্তি থেমে গেছে তার। তার হাতে কি যেন একটা চকচক করে উঠল। সেটা সে দড়ির উপর ঘষছে।

এক মুহূর্ত পর জিনিসটা দেখতে পেল রানা। একটা ছুরি। দড়িটা যেখানে কিনারা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, ঠিক সেইখানে ছুরি চালাচ্ছে মিলার, দড়িটা কেটে দিয়ে লোপেজের ভার থেকে মুক্ত হতে চায় সে।

বিদ্যুৎবেগে বেল্টে গিয়ে পড়ল রানার হাতটা, ডাকোটা থেকে পাওয়া কুঠার একটানে বের করে আনল ও, দ্রুত সেটাকে উল্টো করে নিয়ে হাতল ধরে কাঁধের উপর তুলল ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে, আধ সেকেন্ড বিরতি নিল লক্ষ্য স্থির করার জন্যে, তারপর ছুঁড়ে দিল মিলারের মাথার দিকে।

ঘাড়ের ঠিক উপরে নিখুঁত ভাবে গেঁথে গেল কুঠারটা, দু'ফাঁক হয়ে গেল খুলির নিচের দিকটা। রোমহর্ষক আর্তচিৎকার উঠেই থেমে গেল মুহূর্তে, এবং নিচে থেকে ব্যাপারটা কিছুই অনুমান করতে না পেরে বিহ্বল হয়ে উপর দিকে মুখ তুলে তাকাল লোপেজ। কিনারা থেকে খসে পড়ল একটা ছুরি, মাথাটা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না সে। তার চোখের পাশে একটু চামড়া কেটে নিয়ে পাক খেতে খেতে নেমে গেল ছুরিটা। তারপর ঝর ঝর করে রক্তের একটা ধারা পড়তে শুরু করল তার মাথার উপর।

হাইজ্যাক-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮০

এক

ফ্লাস্কটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না রবিন। একবার ভাবল রানাকে উপহার দেয়া লেদার জ্যাকেটের পকেটে রয়ে গেছে কিনা, তারপরই মনে পড়ল ওভারকোটের পকেটে ছিল সেটা, এবং কেবিন ক্যাম্পে পৌঁছে ওভারকোটটা মিলারের উপস্থিতিতে খুলে রেখেছিল একটা শেল্‌ফে। চৌর্যকর্মটি যে তারই, তাতে আর সন্দেহ কি। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল ওর।

মদ খেয়ে নেশা করুক বা না করুক, নির্বাসিত জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভোলার ধন্বন্তরি ওষুধটা নাগালের মধ্যে আছে এটা জানা থাকলে অদ্ভুত একটা শান্তি অনুভব করে ও, নেশা করে মাতাল হবার ঝোঁকটা গোঁয়ারের মত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না কখনও। এই এখন যেমন, ফ্লাস্কটা নেই বুঝতে পেরে রাগে অন্ধ হয়ে উঠেছে ও, অসহায় বোধ করছে, মাতাল হবার লোলুপ একটা আকুতি কিলবিল করছে ওর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে।

কিন্তু একটু পরই কাঁধে নেয়া দায়িত্বের কথা মনে পড়ে যেতে নিজেকে সামলে নিল রবিন। একটা অসম্ভব হিসাব মেলাবার জন্যে প্রাণপণ লড়ছে ওরা। অঙ্কটার ফল জানা আছে সবার—নির্ঘাত, অবধারিত, সুনিশ্চিত অপঘাত মৃত্যু। দুর্যোগের অশুভ ঘনঘটার মাঝখানে ক্ষীণ আলোর মত আশার দু'একটা বিন্দু যে নেই, তা নয়। তেমনি একটা আশার বিন্দু, রানা এবং লোপেজ সাহায্য নিয়ে ফিরে আসবে।

নির্জন, নিস্তব্ধ পাহাড়ী রাতে নিজেকে বিদ্রূপ করে একটু হাসল রবিন। যাকে বলে মিরাকল, ভাবছে সে, দু'একটা আজও ঘটে দুনিয়াতে—সেজন্যেই ওদেরকে পাহাড় টপকাতে যেতে বাধা দেয়নি সে।

মাসে কয়েকবার এই অভিশপ্ত অ্যান্ডেজের উপর দিয়ে ওড়াউড়ি করতে হয় তাকে, তাই অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে জানে যে সাহায্য নিয়ে আসতে নয়, রানা আর লোপেজ গেছে আত্মহত্যা করতে। পাহাড়ই দেবে ওদেরকে চিরস্থায়ী আশ্রয়।

রাতটা বড় বেশি নিস্তব্ধ, বড় বেশি অস্বস্তিকর। গত সন্ধ্যায় ব্রিজটাকে পোড়াবার ব্যর্থ চেষ্টার পর থেকে কিছুই ঘটেনি আর। পুবাকাশের গায়ে অন্ধকারের সাথে ভোরের ম্লান আলোর পালা বদলের কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। কেবিন ক্যাম্প থেকে ট্রিবুসেটটা নিয়ে আসতে হলে পুরুষদের সবাইকে যেতে হবে সেখানে, ভাবছে রবিন, কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্রিজ ছেড়ে যাওয়াটাও উচিত হবে না। শত্রুরা চুপচাপ আছে বটে, কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তার অর্থ হয়তো নতুন কোন বুদ্ধি পাকাচ্ছে ওরা—আচমকা কোন ভেল্কি দেখিয়ে ব্রিজের এপারে চলে আসার

আয়োজন করছে। পরিবহন এবং টিম্বারের ব্যবস্থা করতে কি রকম সময় লাগবে ওদের জানা থাকলেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত রবিন।

পাথরে পা পড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রবিন। বাতাসে শাড়ির আঁচল উড়ছে দেখে বুঝল সোহানা এগিয়ে আসছে। যুক্তি বা চিন্তা ছাড়াই নিমেষে রানার উপর ঈর্ষা হলো ওর—এমন মেয়েকে বান্ধবী হিসেবে পাওয়া দুর্লভ ভাগ্যের ব্যাপার। শুধু মনোলোভা সৌন্দর্য নয়—বুদ্ধি, সাহস, কোমল সহৃদয়তা এবং আত্মনিবেদনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মেয়েটার চরিত্রে। নিজেকে বড় বেশি একা এবং বঞ্চিত লাগছে তার। রলির চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল।

'বেনেদেতার ব্যাপারটা শুনেছ?' রবিনের পাশে বসে বলল সোহানা, মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড় থেকে সরিয়ে দিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলগুলোকে।

আগুনে যেন পানি পড়ল বেনেদেতার নামটা কানে যেতেই। এর কোন যুক্তি নেই, ভাবল রবিন, বেনেদেতার নাম শুনলে বা তাকে দেখতে পেলে কেন সে পুলকিত হয়ে উঠছে! আয়ুর শেষ মাথায় পৌঁছে এ কি মতিভ্রম তার।

'না' বলল রবিন। 'কি হয়েছে?'

'একটুও ঘুমায়নি,' বলল সোহানা। 'সারাটা রাত ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর ম্লান গলায় বলল, 'পাঁচ বছর আগে, আজকের দিনে, ওর মা-বাবা এবং ভাইকে খুন করেছিল জেনারেল মোয়াজার অনুসারীরা। সিনর বরগুয়িজ বেনেদেতাকে নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তা নাহলে...' একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করে প্রসঙ্গ বদল করল সে, 'এদিকের খবর কি? কিছু ঘটেছে?'

মৃতদের জন্যে কেঁদে লাভ কি, ভাবছে রবিন, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আমরাও তো মরতে যাচ্ছি। তারপর একবার ভাবল, সোহানাকে বলবে নাকি যে তার দৃঢ় বিশ্বাস, রানার সাথে তার আর কোনদিন দেখা হবে না—হয়তো ইতিমধ্যেই ওকে গ্রাস করে নিয়েছে পাহাড়। বড় নির্মম হয়ে যাবে কাজটা, থাক।

'ব্রিজের ওপারে আছে ওরা, এটুকু বুঝতে পারছি,' বলল রবিন। 'না, তেমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু সামনে একটু এগিয়ে উঁকি দিলেই তোমার কপাল ফুটো হয়ে যাবে—সাংঘাতিক সতর্ক হয়ে আছে ওরা।'

'ট্রিবুসেট নিয়ে আসার কি হবে?'

সমস্যার দিকটা তুলে ধরল রবিন। বলল, 'একটা পরামর্শ দাও দেখি।'

'সিনর বরগুয়িজকে এবং মিস জুডিকে নিয়ে তোমরা সবাই ক্যাম্পে চলে যাও,' বলল সোহানা। 'আমার ধারণা, শত্রুরা এমন একটা চাপ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা ঠেকাতে হলে অন্য কোন দিকে নজর দেয়া চলবে না আমাদের। সিনর বরগুয়িজ এবং মিস জুডি এখানে থাকলে সমস্যারই সৃষ্টি হবে শুধু। তাঁরা তো আর লড়তে পারবেন না।' একটু বিরতি নিল সোহানা, তারপর আবার বলল, 'ওদেরকে ঠেকাতে হলে ট্রিবুসেটটা একান্ত দরকার। তোমরা সবাই গিয়ে নিয়ে এসো ওটাকে। এখানে গিলটি মিয়া আর আমি থাকছি পাহারায়।'

'কিন্তু তোমাদের নিরাপত্তার কথাটা...'

'বিপদ কোথায় যে নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠছে? এখানে একজন থাকাও যা সবাই

থাকাও তাই। ওরা যদি ব্রিজ মেরামত করে ফেলে, কি করার আছে আমাদের, দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করা ছাড়া? ব্রিজ মেরামত করতে দেরি আছে, তাই না? সুতরাং বিপদও এত তাড়াতাড়ি দেখা দেবে না। আর তেমন যদি কিছু ঘটে, আমি বা গিলটি মিয়া কেউ একজন দৌড়ে যাব তোমাদেরকে সাবধান করে দেবার জন্যে।'

ভেবেচিন্তে রাজী হয়ে গেল রবিন। সোহানা তাকে বলল, 'গিয়েই পাঠিয়ে দাও গিলটি মিয়াকে। আর, শোনো, বেনেদেতাকে সাথে নিতে ভুলো না। ওকে কিছু একটা কাজের মধ্যে রাখতে পারলে শোকটা ভুলে থাকবে।'

রক শেল্টারে ফিরে এল রবিন। দেখল, ঘুম থেকে জেগেছে সবাই, এবং বেনেদেতা ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে চা-নাস্তা পরিবেশন করছে নিঃশব্দে। চোখাচোখি হতে সহানুভূতির সাথে একটু হাসতে চেষ্টা করল রবিন, কিন্তু পারল না। বেনেদেতাও চোখ নামিয়ে নিল।

প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে বলল ওদেরকে রবিন, সবশেষে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল। 'সিনর গিলটি মিয়া, তোমার ঘাড়েই গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে যাচ্ছি আমরা। মাত্র দুটো, তার বেশি বোল্ট ব্যবহার করতে পারবে না তুমি। দুটো ক্রস বো-ই কক্ করে রেখে যাব তোমার জন্যে আমরা। ব্রিজ মেরামত শুরু করেছে ওরা, দেখামাত্র দুটো বোল্ট ছুঁড়বে তুমি, তারপর যত জোরে পারো ছুটবে কেবিন ক্যাম্পের দিকে, আমাদেরকে খবর দেবার জন্যে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে দুটো বোল্টই দেরি করিয়ে দেবে ওদেরকে, এবং ওদের মুখোমুখি হবার জন্যে নেমে আসার যথেষ্ট সময় পাব আমরা।'

একটু থেমে আর কি বলবে ভেবে নিল রবিন। 'ফর গডস সেক, একই জায়গা থেকে বোল্ট দুটো ছুঁড়ো না। ইতিমধ্যে চতুর হয়ে উঠেছে ওরা, আমাদের সবগুলো প্রিয় পোস্ট চিনে ফেলেছে।' এক এক করে সকলের দিকে তাকাল সে। 'কোন প্রশ্ন?'

বৃদ্ধ সিনর বরগুয়িজ বললেন, 'একা আমার জন্যেই এই বিপদে পড়েছ তোমরা, অথচ তোমাদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারছি না। করার মত কিছু একটা কাজ যদি তোমরা দিতে আমাকে, ক্যাম্পে না গিয়ে এখানেই থাকতাম আমি।'

'আপনার করার মত কোন কাজ এখানে নেই,' বলল রবিন।

'কেবিন ক্যাম্পে আছে,' বলল কোনালি। 'ওখানে ধীরে-সুস্থে দু'একটা বোল্ট তৈরি করতে পারবেন আপনি।'

'ঠিক আছে,' বৃদ্ধ বরগুয়িজ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন।

ওদিকে গিলটি মিয়ার কানে কানে কি যেন বলছেন মিস জুডি। বৃদ্ধার চোখেমুখে মিনতির ভাব ফুটে উঠেছে।

'ঠিক আচে,' বলল গিলটি মিয়া। তাকাল রবিনের দিকে। বলল, 'মিস জুডি বলচেন এখানেই থাকবেন তিনি, কেবিন ক্যাম্পে যাবেন না।'

সবাই অনেক করে বোঝাল তাঁকে, কিন্তু বুড়ির একই জেদ, ব্রিজ এবং সবাইকে ছেড়ে নড়বেন না তিনি। অগত্যা তাঁর কথাই মেনে নিতে হলো সবাইকে। দু'ঘণ্টার পথ, কিন্তু ক্যাম্পে পৌঁছুতে এবার তিন ঘণ্টা লেগে গেল

ওদের। সিনর বরগুয়িজের শারীরিক দুর্বলতাই দেরি করিয়ে দিল ওদেরকে। ব্রিজে কি হচ্ছে ভেবে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে রবিনের। কানটা সবসময় সজাগ রেখেছে ও। অন্তত এখন পর্যন্ত কোন রাইফেলের আওয়াজ পায়নি—কিন্তু বাতাসটা নিচের দিক থেকে নয়, নেমে আসছে পাহাড়ের দিক থেকে, গুলি হলে শুনতে নাও পাওয়া যেতে পারে। উদ্বেগ এতে আরও বেড়ে গেল তার।

কেবিন ক্যাম্পের সামনে জনসনের সাথে দেখা হলো ওদের। শুকনো মুখে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। 'একা দম ফেটে মরে যাবার অবস্থা হয়েছে আমার—ব্রিজের খবর কি, রবিন?'

'এখনও এপারে আসেনি ওরা,' বলল রবিন। 'রানা, লোপেজ—ভালয় ভালয় রওনা হতে পেরেছিল ওরা?'

'আমার ঘুম না ভাঙিয়েই চলে গেছে ওরা,' মুখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাল জনসন। 'ইতিমধ্যে মাইনে পৌঁছে যাবার কথা ওদের।'

ট্রিবুসেটটাকে কেন্দ্র করে একটা চক্কর দিচ্ছে রবিন। 'বাহ, বেশ মজবুত আর সুন্দর দেখতে লাগছে জিনিসটা, জনসন।'

'সময় পেলে আরও ভাল করা যেত। হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করারও নেই।'

'কিন্তু কিভাবে এটা কাজ করবে তা তো ছাই বুঝতে পারছি না।'

হেসে ফেলল প্রফেসর কোনালি।

'ব্রিজের কাছে নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সব পার্টস খুলে ফেলা হয়েছে, তাই বুঝতে পারছ না,' বলল জনসন। 'অ্যাক্সেলে চাপিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে

'রুশো-ফিনিশ যুদ্ধের কথা ভাবছিলাম আমি,' পকেট থেকে অর্ধেক নিঃশেষিত চুরুটটা বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল প্রফেসর কোনালি। 'আমার সাবজেক্টের চেয়ে অনেক আধুনিক বিষয় এটা, কিন্তু ফিনরা কমবেশি আমাদের মত সমস্যায় পড়েছিল—হাতিয়ার ছিল না ওদের। কিন্তু সেজন্যে ওরা দমে যায়নি। কে না জানে যে এই বিপদে পড়েই ওরা বুদ্ধি খাটিয়ে মলোটভ ককটেল আবিষ্কার করে ফেলে।'

নিমেষে কেবিনের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা খালি বোতল আর প্যারাফিনের অবশিষ্ট ড্রামটার কথা মনে পড়ে গেল রবিনের। সম্মান দেখাবার ভঙ্গিতে কোনালির দিকে একটু ঝুঁকে আবার সিধে হলো সে, বলল, 'অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে—ডক্টর জিনিয়াস। আবার তুমি চমক লাগিয়েছ।' জনসনের দিকে ফিরল সে। 'বোতলগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করো তাড়াতাড়ি।'

ড্রামটা যে কেবিনে আছে সেদিকে দ্রুত পা বাড়াল রবিন। পিছন থেকে জনসন বলল, 'খোলাই আছে ওটা, সকালে ঢুকেছিলাম একবার।'

ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রবিন, মদের বোতল সাজানো কাঠের বাক্সটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে ঝুঁকল সে, হাত বাড়িয়ে ধরল একটা বোতল, দু'হাতে নিয়ে আঙুল বুলাচ্ছে সেটার গায়ে। জিভ বের করে ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিল। পায়ের শব্দ, কে যেন এদিকে আসছে, দ্রুত বাক্সের খোপে বোতলটা রেখে দিয়ে বাক্সটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বেনেদেতা কেবিনে ঢুকে

দেখল প্যারাফিন ড্রামটার উপর ঝুঁকে পড়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যাপটা খুলছে রবিন।

দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে আছে বেনেদেতা খালি বোতলগুলো। 'জনসন বলল এগুলো নাকি তোমার দরকার। খালি বোতল কি কাজে লাগবে বলো তো?'

ব্যঙ্গ করে উত্তর দেবার ইচ্ছাটা আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ল, মৃদু কণ্ঠে নরম সুরে বলল রবিন, 'এক ধরনের বোমা তৈরির চেষ্টা করছি আমরা। দেখো তো ছিপি তৈরির জন্যে খানিকটা কাপড় যোগাড় করতে পারো কি না।'

বোতলে প্যারাফিন ভরতে শুরু করল রবিন। একটু পর ফিরে এল বেনেদেতা। বোতলের গলা পেঁচিয়ে কাপড়ের ছিপি তৈরি করার পদ্ধতিটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আর সবাই কোথায়?'

'কি এক বুদ্ধি বের করেছে ডক্টর কোনালি, জনসন আর কাকা তাকে সাহায্য করছে।'

'এখানে একা রেখে যাচ্ছি বলে তোমার কাকা মন খারাপ করে আছেন?' আরেক বোতল ভরছে রবিন।

'মন খারাপ করলেই বা কি,' বলল বেনেদেতা। 'বিপদের কথা ভেবে এখানেই তাঁর থাকা উচিত।'

'তোমার কাকাকে আমার সাংঘাতিক নিঃসঙ্গ মনে হয়।'

'রাজনীতি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, বিয়ে করার সময়ই পেলেন না,' হাত চালু রেখে গল্প করছে বেনেদেতা। 'আমাদের পরিবারের সবাই নিহত হবার পর থেকে তবু তো আমি রয়েছি পাশে।' কি যেন ভাবল সে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তোমাকেও কিন্তু নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় আমার।'

'হয়তো তাই,' সংক্ষেপে উত্তর দিল রবিন, এক টুকরো কম্বলে হাত মুছছে সে।

উঠে দাঁড়াল বেনেদেতা। 'এখান থেকে উদ্ধার পাবার পর কি করবে তুমি?'

'যদি উদ্ধার পাই, তাই না?' উঠে দাঁড়াল রবিনও। 'তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, উদ্ধার পাই তো আগে।' একটু ভাবল সে, তারপর আবার বলল, 'অ্যান্ডেজ এয়ার লিফটে ফিরে যেতে পারব না, একথা ঠিক। ওদের একটা প্লেন ধ্বংস করেছি আমি, কোন্ ভরসায় চাকরিতে রাখবে?'

'কেউ যদি তোমার জন্যে কিছু করতে চায়, ধরো যদি আরও ভাল কোন চাকরির প্রস্তাব পাও—তখন কি করবে?'

'স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে, বেনেদেতা,' বলল রবিন। 'আমি স্বপ্ন বিদ্বেষী একজন লোক। কেউ আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চাইলে তাকে আমি নিষেধ করব। মদের বোতল নামিয়ে খোপে প্যারাফিন ভরা বোতলগুলো রাখো, ট্রিবুসেটের সাথে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে ওগুলো।' বলে আর দাঁড়াল না রবিন, বেনেদেতাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

ক্যাম্পের আরেক প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে রবিন, চিন্তার ভারে নুয়ে আছে মাথাটা। একসময় নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মানসিক অশান্তির এই বহিঃপ্রকাশ শোভন নয়, এখন সে বুঝতে পারছে—বিশেষ করে বেনেদেতাকে

এভাবে অপমান করার কোন অধিকার তার নেই। ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয় কি তার?

কিন্তু চিন্তাটাকে সাথে সাথে নাকচ করে দিল রবিন। ক্ষমা চাইলেই ভুল বুঝবে বেনেদেতা, প্রশ্রয় দেয়া হয়ে যাবে তাকে। বেনেদেতা বরং তাকে অভদ্রই জানুক, তাতে ক্ষতি নেই, তবু তাকে নিয়ে স্বপ্ন যেন না দেখে।

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে কাঁধ দুটো উঁচু করল রবিন, আবার এগোতে শুরু করে প্রচণ্ড একটা কিক মারল একটা নুড়ি পাথরে। বাঁ দিক থেকে গলার আওয়াজ আসছে শুনে পাহাড়ের দিকে এগোল ও।

প্রকাণ্ড একটা কেব্‌ল্ ড্রামকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জনসন, কোনালি এবং সিনর বরগুয়িজ।

'কি হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল রবিন।

'বীমা,' উত্তেজিত, উৎফুল্ল দেখাচ্ছে প্রফেসর স্যামুয়েল জনসনকে, 'শত্রুরা ব্রিজের এপারে যদি এসেই পড়ে, এর সাহায্যে ওদেরকে আমরা একটা ধাক্কা মারতে পারব।'

প্রকাণ্ড ড্রামটাকে ঠিক পজিশনে নিয়ে আসার জন্যে ড্রাম আর পাথুরে মাটির মাঝখানে ঢোকানো কাঠের টুকরোটার গায়ে পাথর দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল জনসন আবার। 'জিনিসটা কি তা তো দেখতেই পাচ্ছ—ভারী তার বহন করে এটা, বিশাল একটা সুতোর রীল-এর মত দেখতে, তাই না?'

মস্ত একটা চাকার মত, দেখতে সুতোর রীল-এর মতই বটে; ডায়ামিটারে আট ফিটের কম নয়। 'হুঁ, বুঝলাম। তারপর?' জানতে চাইল রবিন।

'কাঠটা পচে মত গেছে, তা ঠিক। বছরের পর বছর খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে যা হয়। কিন্তু জিনিসটার ওজন আছে, ঠিক মত ধাক্কা দিতে পারলে গড়াতেও আপত্তি করবে না। ওদিকে একটু নেমে গিয়ে উঁকি দিয়ে এসো, কি দেখতে পাও বলো আমাকে।'

পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটু নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন, সামনেটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। নিচে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা।

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জনসন। 'রাস্তা থেকে এই জায়গাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রামটাকেও শত্রুরা দেখতে পাবে না। ওদের গাড়ির জন্যে এখানে অপেক্ষা করব আমরা। যখন দেখব রাস্তার ওই জায়গার কাছে চলে এসেছে, অমনি ঠেকটা সরিয়ে নিয়ে গড়িয়ে দেব ড্রামটাকে। ধাক্কাটা যদি কায়দা মত লাগে, গাড়িটা তো চুরমার হবেই, রাস্তাটাও ব্লক হয়ে যাবে। ঠিক কিনা?'

ঘাড় ফিরিয়ে সিনর বরগুয়িজের দিকে তাকাল রবিন, ড্রামটাকে ঠেলে নিয়ে আসার কায়িক পরিশ্রমে এখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। জনসন আর কোনালির উপর প্রচণ্ড রাগ হলো তার। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদেরকে ইঙ্গিত করল সে। তারপর খানিক দূরে সরে গেল, যাতে সিনর বরগুয়িজ ওদের কথা শুনতে না পান। জনসন এবং কোনালি এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

'বুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমাদের?' দু'কোমরে হাত রেখে বলল রবিন। 'যা খুশি তাই করার অনুমতি কার কাছ থেকে পেয়েছ?'

কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জনসন, ধীরে ধীরে রক্ত জমছে তার মুখে। 'কিন্তু…'

তাকে থামিয়ে দিল রবিন। 'তোমার আইডিয়াটা খারাপ তা বলছি না, কিন্তু কাজে হাত দেবার আগে আমার সাথে একটা আলোচনা করোনি কেন? ড্রামটাকে ঠেলে আনার কাজে আমি হাত লাগাতে পারতাম, বুড়ো ভদ্রলোক প্যারাফিন ভরতে পারতেন বোতলে। তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল নয়, একথা আমরা সবাই জানি। তিনি যদি মারা যান, অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ? ব্রিজের ওপারের ওই নর-পিশাচগুলো জিতে যাবে না? ভবিষ্যতে আমার অনুমতি ছাড়া, খবরদার, কোন কাজে ডাকবে না ওঁকে।'

জনসন কাঁপতে শুরু করেছে। 'সাবধান করে দিচ্ছি, চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে না, রবিন,' দু'কোমরে হাত রাখল সে-ও। 'সত্যি কথা বলি—সিনর বরগুয়িজ বা আর কারও জন্যে লড়ছি না, আমি লড়ছি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে।'

'না। আমি যতক্ষণ কমান্ডে আছি ততক্ষণ শুধু নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে লড়ছ না তুমি। আমার সমস্ত নির্দেশ তোমাকে মেনে চলতে হবে, এবং কিছু করার আগে আমার সাথে আলাপ করে নিতে হবে।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল জনসন। 'কমান্ড করার অধিকারটা তোমাকে দিল কে?'

'কেউ দেয়নি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবিন, 'আমি নিজেই নিয়েছি।' জনসনের চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, 'আমার কমান্ড মেনে নিতে রাজী নও? তাহলে চ্যালেঞ্জ করো—দু'জনে লাগি এসো, দেখা যাক নিষ্পত্তি হয় কিনা।'

ঠিক ভয়ে বা দুর্বলতার কারণে নয়, রবিনকে সীমা ছাড়াতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে জনসন। পরমুহূর্তে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তারও। 'হ্যাঁ, নিষ্পত্তি একটা চাই আমি।'

জনসনের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল রবিন, 'চাও ভাল কথা। কিন্তু চাওয়া তোমার উচিত হবে না, তাতে নিজেকে অপদস্থ করাই সার হবে।'

চোখের চারপাশ কুঁচকে গেছে জনসনের, পাতা দুটো ঘন ঘন পড়ছে আর উঠছে। তাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল কোনালি, বলল, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করলেই ভাল করব আমরা,' জনসনের দিকে ফিরল সে, বলল, 'তবে, রবিন ঠিকই বলছে। সিনর বরগুয়িজকে দিয়ে কাজটা করানো উচিত হয়নি আমাদের।'

'উচিত না হয় হয়নি,' ঝাঁঝের সাথে বলল জনসন, 'কিন্তু তাই বলে কারও চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শুনতে আমি রাজী নই। আমি আবার বলছি, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার অধিকার আমাদের প্রত্যেকের আছে। সবার জন্যেই খাটছি আমরা, চেষ্টা করছি। কিন্তু নিজেকে বলি দিয়ে আরেকজনের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে—এই রকম কোন অঙ্গীকারের মধ্যে আমি নেই।'

'আমি কি মনে করি, শুনবে?' বলল রবিন। 'এখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি একজন মৃত লোক। ব্রিজ পেরিয়ে খুনেগুলো এপারে আসবেই, বাধা দিয়ে ওদেরকে আমরা বড়জোর কিছুটা দেরি করিয়ে দিতে পারব, ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। এবং ব্রিজের এপারে এসে পিঁপড়ের মত পায়ে দলে মারবে ওরা আমাদের

সবাইকে—সেজন্যেই নিজেকে আমি একটা লাশ বলে ধরে নিয়েছি। সিনর বরগুয়িজের ওপর বিশেষ কোন দরদ নেই আমার, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে চায়, সেইসাথে খুন করতে চায় প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শীকে। আমারও শত্রু ওরা, আমার কাজ ওদেরকে বাধা দেয়া, ওদের বিরুদ্ধাচরণ করা—সেজন্যেই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এত মাথাব্যথা আমার। ওরা যা চায় তা আমরা হতে দিতে পারি না।'

মুখ শুকিয়ে গেছে জনসনের। 'আমি মনে করতাম দলের মধ্যে আমিই বোধহয় একমাত্র ভীতু লোক। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। যাই হোক, ভীতু হতে পারি, কিন্তু আমি তোমার মত এত সহজে নিরাশ হই না। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, রানা এবং লোপেজ সাহায্য আনতে রওনা হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কয়েকটা দিন শত্রুদেরকে দেরি করিয়ে দিতে পারলেই আমাদের বিপদ কেটে যাবে।'

'তাহলে আরও একটু শোনো,' নির্দয় ভাবে বলল রবিন, 'আমি মনে করি রানা, লোপেজ এবং মিলার—এরা তিনজনও মরা মানুষ। একবিন্দু আশা নেই ওদের। তুমি জানো, পাহাড়ের ওই মাথার কাছে কি ঘটছে? জানো না, জানলে বোকার মত আশাবাদী হয়ে উঠতে না। দুটো মার্কিন এবং একটা জার্মান পাহাড় অভিযাত্রী দলকে সাহায্য করতে হয়েছিল আমাকে। অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ছিল তাদের সাথে—কিন্তু কেউ তারা পাহাড় টপকাতে পারেনি—তিন দলের সর্বমোট ছয়জনের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে আসতে পেরেছিল, তাও ফিরে আসার দেড় ঘণ্টা পর সে মারা যায়।' শৃঙ্গগুলোর দিকে একটা হাত তুলল সে। 'ওগুলোর নাম পর্যন্ত নেই, এমনই দুর্গম এক একটা।'

বোবা হয়ে গেছে জনসন।

'খারাপ কথা,' বলল কোনালি।

'কিন্তু মিথ্যে নয়।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কোনালি। 'তা ঠিক।'

'কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে থাকব আমরা?' বলল জনসন। 'বিপদের ছবিটা যত ভয়ঙ্করই হোক, আমি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে মন বসাতে চাই। আমি কাজ করব, কাজ করে ভুলে থাকব···'

'বলো কাজ করে বদলাবার চেষ্টা করব ছবিটাকে,' বলল রবিন। 'এসো, ট্রিবুসেটটাকে নিচে নামাবার ব্যবস্থা করি।'

পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ট্রিবুসেটটাকে নামাতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না ওদেরকে। অ্যাক্সেলের চারদিকে চারটে খুদে চাকা লাগিয়ে নিয়েছে জনসন, সেজন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করল রবিন। মাত্র তিন ঘণ্টা লাগল কাজটায়। চুলের কাঁটার মত বাঁকগুলোয় একটু যা অসুবিধে হলো বেঢপ হাতিয়ারটাকে ঘোরাতে। প্রতিটি বাঁক নেয়ার সময় গিলটি মিয়া বা সোহানাকে ছুটে আসতে দেখবে বলে আশঙ্কা করল রবিন। কিন্তু কারও ছায়া পর্যন্ত দেখল না সে, এখন পর্যন্ত রাইফেলের কোন আওয়াজও তার কানে ঢোকেনি। শত্রুপক্ষ এখনও আক্রমণ করেনি, ধরে নিল সে।

রাস্তা থেকে সরিয়ে জনসনের নির্দেশিত একটা জায়গায় ট্রিবুসেটটাকে তোলা

হলো। এই সময় দেখা গেল ছোট ছোট পা ফেলে থুরথুরে বুড়ি মিস জুডি এগিয়ে আসছেন একমুখ হাসি নিয়ে। তাঁর হাতে রবিনের একটা শার্ট দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধা চশমা পরে আছেন, কিন্তু কাঁচ দুটো কপালে তোলা।

'খবর কি, মিস জুডি?' এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে ধরল রবিন।

'খবর ভাল, ভাই,' এইটুকু হেঁটে এসেই হাঁপিয়ে গেছেন মিস জুডি। 'ওপার থেকে ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করছে না।'

একটু ভাবল রবিন, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ট্রাকের আওয়াজ পেয়েছেন?'

'আজ সকালে জীপটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা, তারপর নতুন কোন ইঞ্জিনের শব্দ পাইনি।'

হাসছে রবিন। বলল, 'আমাদের আঘাতটা বোধহয় খুব জোরাল ছিল, ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। ব্রিজের ওপারে ওরা আছে তো? নাকি লেজ গুটিয়ে ভেগেছে?'

সূচে পরানো সুতো আর রবিনের শার্টটা দেখিয়ে মিস জুডি বললেন, 'তোমার এই শার্টটা সেলাই করছিলাম, হঠাৎ প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এল—শত্রুরা আছে, নাকি চলে গেছে? উঁকি মারতে নিষেধ করে দিয়েছে গিলটি মিয়া, তাই কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় মাথায় একটা বুদ্ধি এল।'

'কি বুদ্ধি?'

'একটা লাঠির মাথায় আমার টুপিটা আটকে সেটা উঁচু করে ধরলাম একটু,' মিস জুডি বললেন। 'টিভির ওয়েস্টার্ন ছবিগুলোর নায়করা এই কৌশল করে।'

হো হো করে হেসে উঠল রবিন। তারপর জানতে চাইল, 'টুপিটা নিশ্চয় ফুটো হয়ে গেছে?'

'টুপিতে ওরা গুলি লাগাতে পারেনি, সবগুলো আশপাশ দিয়ে চলে গেছে।'

'দারুণ, চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রবিন। 'এই বয়সে আপনাকে কর্ম-তৎপর দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমি।'

'এবার আমাকে ছাড়ো, ভাই,' হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন মিস জুডি। 'সোহানা রান্নার কাজ শেষ করে রেখেছে, কিন্তু সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—গরম করে দিলেই খেতে বসতে পারবে তোমরা।' রবিনের হাত থেকে নিজেকে আলতো-ভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মিস জুডি তারপর কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রবিনের দিকে, বললেন, 'জানো, আমার কিন্তু খুউব মজা লাগছে—এই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব—দারুণ রোমাঞ্চকর, তাই না?' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে আবার এগোতে শুরু করলেন তিনি।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ভাবছে, বলে কি! মজা লাগছে!

পেট ফোলা পাথরের একটা চত্বরে বসানো হয়েছে ট্রিবুসেটটাকে, যাতে ছোট বাহুতে চাপানো ওজনের ভার অনেকটা পথ নেমে এসে মাটিতে পড়ে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা লাগল হাতিয়ারটাকে জোড়া দিতে। 'এটার একটা নকশা আমাকে আঁকতে দেখে রানা বলেছিল, কি ওটা? দাঁড়িপাল্লা নাকি? নিশ্চয়ই পাগল-ছাগল ভেবেছিল সে আমাকে, কিন্তু দাঁড়িপাল্লার সাথে নকশাটার যে মিল আছে, সেটা তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

মিলটা দেখতে পাচ্ছে রবিনও, বেঢপ আকারের একটা তুলাদণ্ডেরই মত দেখতে বটে জিনিসটা। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাজ করবে কি? নাকি এত খাটনি বৃথা যাবে?'

'মগজ খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে, কাজ কতটুকু করবে তা আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। কলেজে এ-বিষয়ে পড়াবার সময় কখনও ভাবিনি প্রাণের দায়ে পড়ে একটা ট্রিবুসেট তৈরি করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পড়ব জানলে এক্সপেরিমেন্টটা আগেই সেরে রাখতাম।'

'ওটা কি খুব জোরে কিক মারবে? ঝাঁকিটা যদি খুব বেশি হয়…'

'তা হবে না,' সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কোনালি, 'ধাক্কা যা লাগবার মাটিতে লাগবে, এবং মাটি সেটুকু হজম করে নেবে।' মাঝারি আকারের কুমড়ার মত একটা বোল্ডারের দিকে আঙুল তুলল সে। 'ওটা দিয়ে টেস্ট করা যাক, কি বলো?'

'ঠিক আছে,' বলল রবিন। 'কি করতে হবে আমাদেরকে?'

'প্রথমে প্রাণপণে টানতে হবে এই দড়িটা,' বলল জনসন।

তিনটে পুলির সাথে জড়ানো দড়িটা, এক প্রান্ত দীর্ঘ বাহুর শেষ মাথায় বাঁধা। রবিন এবং জনসন দড়িটা ধরে টানছে। দীর্ঘ বাহুটা নেমে এল নিচে, ওজন সহ ছোট বাহুটা উঠে গেল উপরে। ওজন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মস্ত বড় একটা মরচে ধরা বালতি ভরা পাথর। দীর্ঘ বাহুটা মাটি স্পর্শ করতেই সামনে এগিয়ে এল কোনালি, লিভার টেনে কাঠের একটা ব্লক ফেলল সে, দীর্ঘ বাহুটাকে মাটির সাথে চেপে ধরে রাখল ব্লকটা। বোল্ডারটা দুই হাত দিয়ে ধরে তুলে নিয়ে এল জনসন, ছোট বাহুর উপর বসানো অনেক ছোট এবং বেঁটে অপর বালতিটাতে রাখল সেটাকে।

'এখন আমরা রেডি,' বলল জনসন। 'এরই মধ্যে ব্রিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি আমি—এখন একজনকে দেখতে হবে বোল্ডারটা কোথায় গিয়ে পড়ে।'

'আমি যাচ্ছি,' উৎসাহের সাথে দৌড়ুল রবিন। খানিক দূর এগিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলল সে, তারপর ক্রল করে গিলটি মিয়ার পাশে গিয়ে হাজির হলো। গম্ভীরভাবে বলল, 'গোলাটা ছুঁড়তে যাচ্ছি আমরা।'

ট্রিবুসেটটা দেখার জন্যে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল গিলটি মিয়া। তারপর দু'হাত দিয়ে নিজের মাথাটাকে ঢেকে ফেলল সে।

'আমরা রেডি!' চেঁচিয়ে উঠল কোনালি।

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল রবিন। সাথে সাথে ফায়ারিং লিভারটা হ্যাঁচকা টান মেরে নামিয়ে দিল কোনালি। প্রচণ্ড ভার সহ ছোট বাহুটা চোখের পলকে নেমে এল, মিসাইলবাহী দীর্ঘ বাহুটা স্যাঁত করে উঠে গেল উপরে। মহা এক সংঘর্ষ ঘটল মাটির সাথে লোহার বালতিটার, কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই রবিনের। ধনুকের মত বাঁকা একটা পথ তৈরি করে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বোল্ডারটা, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে তার, অবাক বিস্ময়ে সেটাকে দেখছে সে। দীর্ঘক্ষণ শূন্যে থাকল বোল্ডারটা, এবং অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠল। তারপর একসময় নামতে শুরু করল, এখন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে তার পতনের বেগ। ব্রিজের উপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা, রাস্তা পেরিয়ে আগুনের বিধ্বস্ত ট্রাকটাকে ছাড়িয়ে পাহাড়ের

গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। ধুলো দেখে বোঝা গেল ঠিক কোথায় গিয়ে পড়েছে সেটা।

'জেসাস!' কাঁপা গলায় ফিস ফিস করছে রবিন। 'কি সাংঘাতিক রেঞ্জ!' পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল সে, দৌড়ে ফিরে এসে রিপোর্ট দিল ওদেরকে, 'ব্রিজ ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরে ডানদিকে পঁচিশ গজ সরে গিয়ে পড়েছে। কত ওজন ছিল পাথরটার?'

'প্রায় ত্রিশ পাউন্ড,' আন্দাজ করে বলল জনসন। 'আরও বড় পাথর দরকার আমাদের।' ট্রিবুসেটের গায়ে আদর করে হাত বুলাল সে। 'বাঁ দিকে একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে একে।'

নদীর ওপার থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, তারপর গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। প্রচণ্ড একটা চাপড় মারল কোনালির পিঠে রবিন, ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল কোনালির, তার মনে হলো, শিরদাঁড়াটা আর একটু হলে ভেঙে যেত। 'ওদের পিলে চমকে দিয়েছ আবার তুমি, প্রফেসর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ব্রিজটাকে আমরা চুরমার করে ছাড়ব!'

ঢোক গিলে ব্যথা হজম করে হাসতে চেষ্টা করছে কোনালি।

কিন্তু এরপর দমে গেল রবিন, বুঝল যত সহজ ভেবেছিল সে আসলে কাজটা তত সহজ নয়। পরবর্তী ছয়টা পাথর ছুঁড়তে পুরো একটি ঘণ্টা লেগে গেল, এবং ছয়টার মধ্যে একটাও ব্রিজে গিয়ে পড়ল না। দুটো পাথর আর একটুর জন্যে ব্যর্থ হলো ব্রিজে আঘাত করতে, আরেকটা পাথর বাঁ দিকের টানা দড়ির গায়ে ঘষা খেল। এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল ব্রিজটা। কিন্তু সরাসরি একটা আঘাতও লাগল না ব্রিজে।

প্রমাণ হয়ে গেল, শত্রুরাও কোন অংশে কম অসহায় নয়। হাঁক ডাক, দৌড়াদৌড়ি যথেষ্ট করছে তারা, গুলিও ছুঁড়ছে এন্তার কিন্তু উড়ন্ত পাথুরে গোলার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারছে না। দিশেহারা অবস্থা হয়েছে ওদের।

'ঠিক রেঞ্জটা কেন পাচ্ছি না আমরা?' অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রবিনের। 'এই শালার বেজন্মাটার হয়েছে কি?'

'মুখ সামলে কথা বলো, রবিন,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে সতর্ক করে দিল কোনালি।

'অ্যাই, সাবধান, মাথা গরম করবে না কেউ,' দ্রুত বলল সোহানা। তাকাল রবিনের দিকে। 'একটা ট্রিবুসেট নিখুঁতভাবে টার্গেটে গিয়ে আঘাত করবে এমন আশা তুমি করতে পারো না। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে পাথরগুলো, এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের কাজই হলো ছড়িয়ে পড়ার এলাকাটাকে যথাসম্ভব ছোট করে আনার চেষ্টা করা।'

'বাহুটা কাঁপছে, যথেষ্ট শক্ত নয় ওটা,' বলল জনসন. 'তাছাড়া ভাগ্যগুণেও নিখুঁতভাবে একটা পাথর ব্রিজে ফেলতে পারিনি আমরা. যদি পারতাম, একই ওজনের পাথর দিয়ে আবার চেষ্টা করলে হয়তো এক পেতাম। বাহুটার কাঁপুনি রোধ করতে না পারলে ডানে বাঁয়ে সরে যাবে আর পাথরের ওজন

কম বেশি হচ্ছে বলেই কখনও আগে কখনও পিছনে গিয়ে পড়ছে…'

'বাহুটা যাতে না কাঁপে তার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রবিন।

এদিক ওদিক মাথা দোলাল জনসন। 'একটা স্টীল গার্ডার পেলে ব্যবস্থা করা যেত—কিন্তু পাব কোথায়?'

'ঠিক কি ওজনের পাথর লাগবে তা জানার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে, তাই না?'

কাজ পাগল প্রফেসর জনসন ধুলোর উপর হাঁটু গেড়ে বসে লাঠি, দড়ি আর তক্তা দিয়ে একটা দাঁড়িপাল্লা তৈরি করল, বলল, 'এটার সাহায্যে নিখুঁত ওজন পাওয়া যাবে এমন আশা দয়া করে কেউ কোরো না। তবে একটার সাথে আরেকটা পাথরের ওজনের গরমিল আধ পাউন্ডের বেশি হবে না, এটুকু আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।'

আবার ওরা ছুঁড়তে শুরু করল গোলা। পরবর্তী চারটে বোল্ডারের শেষেরটা বিকেলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার সৃষ্টি করল।

ট্রিবুসেটের ছোট বাহুর প্রান্তে আটকানো লোহার বালতিটা মাটির সাথে ধাক্কা খেয়ে ধুলোর মেঘ ওড়াল একটা। ক্রিকেটের একজন ফাস্ট বোলারের বল ধরা হাতের মত উঠে এল দীর্ঘ বাহুটা। আকাশ পথে সওয়ার হলো বোল্ডার। ক্রমশ উঠে যাচ্ছে উপরে, আরও উপরে। রবিনের মাথার উপর এসে পাথরটা তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছুল এবং তারপর শুরু হলো তার পতন। শির শির করে উঠল রবিনের শিরদাঁড়া। গতিপথ দেখে মনে হচ্ছে টার্গেটে গিয়ে পড়বে এটা।

মাটির টানে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে নামছে বোল্ডারটা। দম আটকে রেখে অপেক্ষা করছে রবিন। ব্রিজটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে যে দড়ি দুটো, তার মাঝখানে পড়তে যাচ্ছে গোলাটা। শরীরে পুলক অনুভব করছে রবিন। দুই দড়ির মাঝখানে পড়ছে, তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

ব্রিজের উপরই পড়ল বোল্ডার। কিন্তু কোন শব্দ হলো না। একচুল নড়লও না ব্রিজটা। পরমুহূর্তে পাথরটাকে দেখতে পেল রবিন। ঠিক ব্রিজের মাঝখানের ফাঁক গলে নেমে যাচ্ছে। টগবগিয়ে নৃত্যরত নদীর পানিতে পড়ল সেটা। সফেন পানি লাফ দিয়ে উঠে এসে ভিজিয়ে দিল প্ল্যাঙ্কগুলোর নিচের দিক।

'গড অলমাইটি!' কপাল চাপড়ে হতাশা ব্যক্ত করল রবিন। 'লক্ষ্যভেদে সফল, কিন্তু ভুল জায়গাটায়!'

কিন্তু এই নাটকীয় ব্যর্থতা অদ্ভুত একটা আশার সঞ্চার করল রবিনের মনে। জনসনকে সে যা বলেছিল কেবিন ক্যাম্পে, তা বোধহয় সত্যি নয়—না, নিজেকে এখন আর একটা লাশ বলে মনে করছে না সে। লড়াই করে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ তাদের আছে।

ট্রিবুসেটের কাছে ফিরে এল রবিন। তিক্ত এবং কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জনসনকে বলল সে, 'দক্ষ একজন গোলন্দাজ তুমি, সন্দেহ নেই।'

'কি বলতে চাও?'

'শেষ গোলাটা নিখুঁত ছিল,' বলল রবিন, 'কিন্তু যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখানে প্ল্যাঙ্ক নেই—ফাঁক গলে পাথরটা নদীতে পড়েছে।'

'সত্যিই?' সন্তুষ্ট চিত্তে বলল জনসন, 'যাই হোক, এ থেকে প্রমাণ হলো, সঠিক রেঞ্জ পেয়েছি আমি।'

'কথা নয়,' স্মরণ করিয়ে দিল ওদেরকে সোহানা। 'কাজ চাই। এসো, আবার দেখা যাক।'

অনিয়মিত বিরতি নিয়ে বিকেলের বাকি সময়টায় বারবার ট্রিবুসেট দাগা হলো। ক্রীতদাসের মত অমানুষিক খাটছে ওরা, দড়ি টানছে, দূর থেকে বাছাই করে আনছে বোল্ডার, দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন মাপছে।

যুদ্ধের রোমাঞ্চ মিস জুডির শিরায় শিরায়, প্রতিটি রোমকূপে সংক্রমিত হয়েছে। অদ্ভুত একটা লালিমা ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়। বাঁকা কোমর কিভাবে যেন অনেকটা সোজা হয়ে গেছে তাঁর। হাঁটা চলার সময় কারও সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি, গিলটি মিয়ার দেয়া একটা লাঠির উপর ভর করে হাঁটছেন এখন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জেদের কাছে হার মেনে একটা কাজের দায়িত্ব তাঁকে না দিয়ে পারল না সোহানা। উঁচু একটা পাথরে কম্বল বিছিয়ে আসনটাকে নরম করা হয়েছে, মিস জুডি সেটার উপর বসে বোল্ডার ওজন করছেন। তাঁকে সাহায্য করছে সোহানা।

কোমল স্বভাবা থুরথুরে বৃদ্ধা কতখানি নির্মম এবং পাষাণ হৃদয় হতে পারেন, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ওরা। দুশো গজ দূর থেকে বাছ বিচার করে এক একটা বোল্ডার অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে আসছে ওরা, কিন্তু মিস জুডি ওজন নিয়ে রায় দিচ্ছেন, 'এটা বাতিল, আরও বড় পাথর নিয়ে এসো।'

মিস জুডির নির্দয়তা অবশ্য সুফল প্রসব করল। খাটনির ভয়ে এরপর থেকে ওরা আরও সতর্ক হলো বোল্ডার নির্বাচনে। খানিক পর দেখা গেল ওজন অনুমান করার ব্যাপারে ওরা যারা পাথর নির্বাচন করছিল সবাই এক একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

হাতঘড়ির দিকে একটা চোখ রেখে ট্রিবুসেট দাগার সংখ্যা নোট করছে রবিন। আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে পরিস্থিতি। ঘণ্টায় এখন ওরা বারোটা করে বোল্ডার ছুঁড়ছে। আড়াই ঘণ্টায় ছাব্বিশটা পাথর ছুঁড়েছে ওরা, এর মধ্যে লক্ষ্যস্থলে আঘাত করেছে সাতটা। তার মানে, হিসেব করল রবিন, প্রতি চারটের মধ্যে একটা। মাত্র দুটো বোল্ডারকে ব্রিজের উপর পড়তে দেখেছে সে, কিন্তু ওই দেখাতেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে এ ধরনের আঘাত সামলে টিকে থাকা বেশিক্ষণ সম্ভব নয় ব্রিজটার পক্ষে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো ব্রিজের এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে পাথরগুলো। তা না পড়ে একই জায়গায় যদি আঘাতগুলো পড়ত, অনেক বেশি ক্ষতি হত ব্রিজের। যাই হোক, দুটো প্ল্যাঙ্ক সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন একটা ফাঁকের সৃষ্টি করেছে তারা, আরও কয়েকটা প্ল্যাঙ্ক বাঁকিয়ে দিয়েছে—এও কম নয় কিছু। এর ফলে ব্রিজ পেরোতে চাইছে এমন একজন লোক হয়তো ভয় পাবে না, কিন্তু গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসার সাহস হবে না কারও।

শত্রুদেরকে অসহায় দেখে সবাই ওরা খুশি। ওদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ব্রিজটা, অথচ করার কিছুই নেই। প্রথম দিকে রাইফেল ছুঁড়ে আক্রোশ প্রকাশ করেছিল তারা, এখন তাও থেমে গেছে। একটা পাথর ব্যর্থ

হলে হৈ-হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করছে তারা, সফল হলে গজরাচ্ছে।

সন্ধ্যার আধঘণ্টা আগে জনসনকে নিয়ে রবিনের কাছে এল সোহানা। ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে দু'জনের আপাদমস্তক।

'দুঃসংবাদ,' বলল জনসন।

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের।

'কাজ বন্ধ রাখতে হবে।'

'অসম্ভব! কেন?'

'ট্রিবুসেটের জয়েন্টগুলো ঢিলে হয়ে গেছে,' বলল সোহানা। 'এমন কাঁপছে, যে কোন মুহূর্তে খুলে পড়ে যেতে পারে।'

'আর দুই কি তিনটে বোল্ডার ছোঁড়ার পরই আয়ু শেষ হয়ে যাবে ওর,' ম্লান মুখে বলল জনসন।

'সারারাত পাথর ছুঁড়তে চেয়েছিলাম আমি,' বলল রবিন। 'আমার ইচ্ছা সকালের মধ্যে ব্রিজটাকে মেরামতের অযোগ্য করে তুলি।'

'তা সম্ভব নয়,' বলল জনসন। 'দুটো বাহুতেই চিড় ধরেছে—নড়বড় করছে সবগুলো পার্টস। সময় থাকতে মেরামত না করলে ওটার আশা ছেড়ে দিতে হবে।'

অস্তিত্ব জুড়ে একটা দামাল অস্থিরতা অনুভব করছে রবিন। পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল সে। ট্রিবুসেটের কাছে ফিরে এল। খুঁটিয়ে দেখে আরও নিরাশ হয়ে পড়ল সে। এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি জনসন, শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে হাতিয়ারটা।

'মেরামত করতে পারবে তুমি?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' সতর্ক উত্তর দিল জনসন, 'বোধহয় পারব।'

'চেষ্টা নয়, বোধহয় নয়—কাজটা করতেই হবে, করো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। একবারও পিছন দিকে না ফিরে হন হন করে হেঁটে চলে গেল সে।

নিশুতি রাত।

দুধ-সাদা রঙের প্রায় চারকোনা একটা ভাসমান চাদরের মত পূর্ণ চাঁদের নিচে স্থির হয়ে আছে একখণ্ড মেঘ। রূপের ছটায় উদ্ভাসিত নববধূর মত লাগছে চাঁদটাকে, স্বচ্ছ কুয়াশার ঘোমটা টেনে কার অপেক্ষায় যেন পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্ডেজের শিখরে। কি এক নিরাশায় ছেয়ে গেল বুকটা রবিনের। চোখ দুটো নামিয়ে নিল সে। পাথরের মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে সে। ফুরফুরে বাতাস কি এক করুণ সুর হয়ে বাজছে তার কানে। খাড়া পিঠের একটা মস্ত পাথরের কাছে বসে হেলান দিল সে, পকেট থেকে বের করে পাশে রাখল মদের বোতলটা। চাঁদের আলো লেগে বোতলের ভিতরের স্বচ্ছ পানীয় মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে। একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল রবিন।

শরীরের প্রতিটি পেশীর পরতে পরতে বাসা বেঁধেছে ক্লান্তি, অনুভব করছে রবিন। কয়েকটা দিন স্নানাহার এবং নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করে অমানুষিক খেটেছে সে, দম ফেলার একমুহূর্ত অবসর দেয়নি নিজেকে। বেনেদেতা এবং মিস জুডি দায়িত্ব নিয়েছে নাইট ডিউটির। সারারাত আজ তাকে ঘুমাতে হবে, নির্দেশ দিয়েছে

সোহানা। কিন্তু ঘুম কি তার আসবে!

ব্রিজের কাছে ট্রিবুসেট নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে দুই প্রফেসর—জনসন আর কোনালি। ওদের সাথে ভিড়ে গিয়ে কাজে হাত দিলে মানসিক যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, ভাবল সে, কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না তার।

ওদের সাথে আমাদের পরিচয় নেই, ওরা আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা, অথচ পরস্পরের প্রাণের দুশমন আমরা—সন্ত্রাসবাদীদের কথা ভাবছে রবিন। আবার একটা জীপ এগিয়ে নিয়ে এসেছে ওরা, হেডলাইট জ্বেলে আলোয় ভাসিয়ে রেখেছে ব্রিজটাকে। একটা ব্যাপার খুবই বিস্ময়কর, এখন পর্যন্ত আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ নেয়নি শত্রুপক্ষ। এদিক থেকে কিছু একটা করা হলে রাইফেল ছুঁড়েই ক্ষান্ত হচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়। পাল্টা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না ওরা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নেবে না—নিশ্চয়ই কিছু একটা করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ওরা—যখন করবে, হয়তো হঠাৎ করেই চমকে দেবে তাদেরকে।

চিন্তিত ভাবে বোতলটার দিকে তাকাল রবিন।

গিরিপথের উদ্দেশে ভোরবেলা মাইন ত্যাগ করবে রানা এবং লোপেজ। ভাবছে সে, পারবে কি ওরা পৌঁছুতে? জনসনকে মিথ্যা কথা বা বাড়িয়ে কিছু বলেনি সে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করে সে, গিরিপথে পৌঁছানো সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। প্রচণ্ড শীত ওখানে, অথচ ওদের সাথে তাঁবু নেই। বরফ মোড়া ঢালই বা পেরোবে কিভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়া? তাছাড়া, আকাশের চেহারাও ভাল ঠেকছে না, অচিরেই একটা পরিবর্তন দেখা দেবে আবহাওয়ায়। ওরা যদি গিরিপথ পেরোতে না পারে, কিংবা যদি পেরোতে বেশি সময় নেয়—জিতে যাবে শত্রুরা। যুদ্ধের দেবতা ওদের পক্ষে, কেননা সংখ্যায় ওরা ভারী। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে বোতলটা তুলে নিয়ে ছিপি খুলল রবিন, তরল শয়তানকে শরীরে ঢোকার পথ করে দিল মুখটা হাঁ করে।

রক শেল্টার।

সেলাই, রান্না বা আর সব হালকা মেয়েলি কাজ তাঁকে দিয়ে হবে না, প্রায় ঘোষণার সুরে কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন মিস জুডি। সিরিয়াস কাজ চাই তাঁর, যুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে এমন সব কাজ। 'বিশ্বাস করো ভাই, আমার কিন্তু সাংঘাতিক মজা লাগছে!'

এই প্রথম শুনছে কথাটা বেনেদেতা, চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল সে। 'কি বললেন, মজা লাগছে?'

'খু-উ-ব,' আহলাদে আটখানা হয়ে বললেন মিস জুডি। 'শেষ জীবনে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাব, কখনও ভাবিনি।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সাবধানে জানতে চাইল বেনেদেতা, 'আপনি জানেন, আমরা সবাই মারা যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, ভাই, জানি—জানি বৈকি! মজাটা তো সেখানেই। মরার ভয় আছে বলেই তো রোমাঞ্চ আছে। এখন আমি বুঝতে পারি পুরুষরা কেন যুদ্ধ-যাত্রা করে।

এই রোমাঞ্চপ্রীতিই জুয়ার প্রতি আসক্ত করে তোলে ওদেরকে। কিন্তু যুদ্ধে তারা সবচেয়ে দামী জিনিসটা বাজী ধরে—নিজেদের জীবন। এই রোমাঞ্চ না থাকলে জীবনের স্বাদ থাকত না, একটা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দাঁড়াত জীবনের।'

মুখ বন্ধ হয়ে আছে বেনেদেতার। কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি বা সত্যতা একেবারে যে নেই তা হয়তো নয়, ভাবছে সে, কিন্তু একজন নব্বুই বছরের অথর্ব বৃদ্ধার মুখ থেকে এসব বেরিয়ে আসবে তা আশা করা যায় না।

'ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছি আমি, সমাজ সেবায় কাটিয়েছি আরও চল্লিশটা বছর,' মনের দরজা খুলে দিয়েছেন বৃদ্ধা। 'স্নেহময়ী হেডমিস্ট্রেস হিসেবে একগাদা ছেলেমেয়ে আমাকে দারুণ ভক্তি করত। অল্প বয়স থেকেই রোমান্টিক ছিলাম আমি, কিন্তু আমার ভিতরের যত উচ্ছ্বাস তা কোনদিন প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়নি। শিক্ষয়িত্রী?' চোখ মটকে হাসলেন মিস জুডি 'সবাই মনে করে একজন শিক্ষয়িত্রীর জীবনে রোমাঞ্চ থাকতে পারে না, তার জীবনে সেক্স থাকতে পারে না, সে হবে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে, একটা আদর্শ, পবিত্রতার প্রতীক। বিশ্বাস করো ভাই, সেই জীবনটার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। কিন্তু যখন হুঁশ ফিরল, তখন অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার। কোন পুরুষ আর আমাকে দেখে হাসে না, বন্ধুত্ব করার জন্যে এগিয়ে আসে না।'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন মিস জুডি।

'বয়স বাড়লেও, মনের রোমান্টিক ভাবে ভাটা পড়েনি,' আবার শুরু করলেন মিস জুডি। 'অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় আমি, এবং সেজন্যেই শিক্ষকতা ছেড়ে ঢুকলাম সমাজ সেবায়। জীবন আমাকে বঞ্চিত করেছে, একথা বলি না। মানুষের দুঃখে কেঁদেছি যেমন, তেমনি তাদের সুখে হেসেছিও। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে অনেক শিখেছি। কিছুই ফেলে দেবার মত নয়।' বৃদ্ধার ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, চোখ দুটো ছল ছল করছে, 'কিন্তু তবু বলব, নিজেকে আমি প্রকাশ করার সুযোগ পাইনি। নিজের জন্যে কখনও উন্মাদ হইনি, হাসিনি, বা কাঁদিনি—এইটাই সবচেয়ে বড় খেদ আমার। বড় ভয়ঙ্কর নিরাপদ জীবন ছিল আমার, কখনও সেখানে বিঘ্নিত হয়নি শান্তি—তাই আজ এই সংকটে পড়ে বুঝতে পারছি জীবনটাই আমার অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু নিজে কখনও বিপদে পড়িনি—বিপদের প্রকৃত রূপ এবং তাৎপর্য তাই অজানা ছিল আমার। আজ দেখছি বিপদই জীবন। যার জীবনে বিপদ নেই তার জীবন অর্থহীন, তার বেঁচে থাকার মধ্যে স্বাদ গন্ধ বলতে কিছুই নেই।'

ম্লান মুখে মিস জুডির দিকে তাকিয়ে আছে বেনেদেতা। বর্তমান পরিস্থিতি তার এবং তার কাকার জীবন নিয়ে টান দিয়েছে, উচ্ছন্নে যেতে বসেছে একটা দেশের ভবিষ্যৎ—অথচ নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা রোমান্টিসিজমের আলোয় চাক্ষুষ করছেন পরিস্থিতিটাকে। এই ভদ্রমহিলা ভাগ্যগুণে যদি নিজের দেশে ফিরতেও পারেন, সম্পূর্ণ অন্য এক অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ হয়ে ফিরে যাবেন। আগের সেই নিরাপত্তা, সেই শান্তি, সেই নিরুপদ্রব জীবন বাস্তবের কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বলে মনে হবে তাঁর। দুশ্চর পর্বতের নিষ্প্রাণ উদোম কালো গা, ব্রিজের ওপার থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসা মৃত্যু, অক্সিজেন, খাদ্য এবং আরামের অভাব,

গোলা-গুলি, বাঁচার আকুতি—এই সব স্মৃতিই তখন হয়ে উঠবে তাঁর কাছে জলজ্যান্ত বাস্তব।

লাঠিটা টেনে নিলেন মিস জুডি। বললেন, 'ব্রিজের দিকে যাচ্ছি আমি, তুমি ভাই রবিনের শার্টটা সেলাই করে রেখো।'

চোখ কপালে উঠে গেল বেনেদেতার। 'আপনি একা পাহারা দিতে যাচ্ছেন?'

'পারব ভাই,' দাঁতহীন মিষ্টি হাসি হাসলেন তিনি। 'দুঘণ্টা পর তুমি গিয়ে ছুটি দিও আমাকে।' লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, কিন্তু অর্ধেকটা উঠে দাঁড়িয়েছেন, এই সময় কোমরে হাত দিয়ে ব্যথায় মুখ বিকৃত করলেন, ককিয়ে উঠে বললেন, 'মাগো, মরে গেছি···'

'কি হলো?' দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে মিস জুডিকে ধরে ফেলল বেনেদেতা।

'কোমরে···খিঁচ্ ব্যথা—ও ভাই, গিলটি, ঘুমালে নাকি? আমাকে ধরে একটু পৌঁছে দাও না, ভাই···'

অন্ধকার শেল্টার থেকে চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল গিলটি মিয়ার, বলল, 'বুজলে মেম-সায়েব, তোমার বয়সটা বড় বেরসিক, তোমার মনের মর্ম বুজতে চায় না। দাঁড়াও বাপু, আগে এক কাপ গরম কফি বানিয়ে খাইয়ে নিই, তারপর যাচ্চি তোমার সাতে।'

বেনেদেতার সাহায্যে ধীরে ধীরে আবার বসলেন মিস জুডি। গিলটি মিয়া আসতেই বললেন, 'আমার একটা উপকার করবে, ভাই?'

'কি উবগার?···থাক, মুক ফুটে আর বলতে হবে নাকো, বুজতে পেরেচি। সোহানাদির কাচ থেকে মলম চেয়ে নিয়ে কোমরটা তোমার মালিশ করে দিতে হবে, এই তো?'

গিলটি মিয়ার সাথে মিস জুডি চলে যাবার পর রবিনের শার্টটা নিয়ে বসল বেনেদেতা। সান্ধ্যভোজনের সময় নিদারুণ মন মরা অবস্থায় দেখেছে রবিনকে সে। লোকটার দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা মমতা উথলে ওঠে তার বুকে। কি যে দুঃখ ওর, চেষ্টা করেও সে জানতে পারল না। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে ও। ব্যর্থ প্রেম? বোধহয় তাই। খাওয়া শেষ করে কারও সাথে কোন কথা না বলে শেল্টার থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে ও, ডান দিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ওদিকে কোথাও গেছে, দেখেছে সে।

শার্টটা সেলাই করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনেদেতা। শেল্টার থেকে বেরিয়ে এল সে, খানিক দূর এগিয়ে বাঁক নিল ডান দিকে।

পাথরের সাথে কাঁচের ঠোকা খাওয়ার শব্দ অনুসরণ করে হঠাৎ রবিনের পিছনে এসে থমকে দাঁড়াল বেনেদেতা। আবছা কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রবিন। হাতে মদের বোতল, গুন গুন করে অপরিচিত একটা গানের সুর ভাঁজছে। বোতলটা অর্ধেক খালি।

ছায়া থেকে বেরিয়ে রবিনের সামনে চলে এল বেনেদেতা। মুখ নামিয়ে তাকাল রবিন, মাথাটা এদিক ওদিক বেসামাল ভাবে দুলছে। চাঁদের আলোয় মুক্তোর মত সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে তার, হাসছে সে। বোতল ধরা হাতটা লম্বা করে দিল বেনেদেতার দিকে, 'নাও, বেনেদেতা, এক ঢোক খেয়ে নাও—দুনিয়ার তাবৎ

দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে,' জড়ানো গলায় বলল সে।

'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল বেনেদেতা, একটু নেমে রবিনের আরও কাছাকাছি দাঁড়াল সে। হাতের শার্টটা দেখিয়ে বলল, 'গায়ের শার্টটা খুলে এটা পরবে? নোংরা হয়ে গেছে ওটা, ধোয়া দরকার।'

'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালবাস বুঝি?' হা হা করে হেসে উঠল রবিন। 'দুনিয়াটাও বড় নোংরা হয়ে গেছে, বেনেদেতা, কিন্তু এটাকে তুমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে পারো না···'

বোতলের দিকে একটা আঙুল তুলল বেনেদেতা। 'এ পরিস্থিতিতে ওটা খাওয়া কি উচিত হচ্ছে?'

'ঈট, ড্রিঙ্ক, অ্যান্ড বী মেরী—ফর টু-মরো উই সার্টেনলি ডাই!' বলে নেশার ঘোরে আবার হা হা করে হেসে উঠল রবিন। তারপর আবার ঝট্ করে বোতলটা বাড়িয়ে দিল বেনেদেতার দিকে। 'নাও হে, দু'ঢোক গেলো—তারপর এসো ফুর্তি করি।'

বোতলটা ধরল বেনেদেতা, রবিনের হাত থেকে নিয়ে দ্রুত একটা পাথরে বাড়ি মারল। কি করতে যাচ্ছে বেনেদেতা তা শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরে বাধা দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবিন। বেনেদেতাকে নিয়ে পড়ে গেল পাথুরে মাটিতে।

উঠে বসতে গিয়ে বেনেদেতা অনুভব করল শক্ত মুঠোয় তার কনুইয়ের উপরটা চেপে ধরে আছে রবিন, নিঃশব্দ হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীরটা। 'ছাড়ো,' মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল বেনেদেতা।

'তুমি একটা ক্ষতি করেছ আমার,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'ছাড়ব না, আমিও তোমার একটা ক্ষতি করব।'

কাঁধে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল রবিন বেনেদেতাকে, তার মুখের সামনে মুখ নামিয়ে মদের গন্ধ ভরা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলল সে, 'অসহায় রাগে এতদিন শুধু ফুঁসেছি, আজ আমি প্রতিশোধ নেব। চেঁচিয়ো না, এখান থেকে ব্রিজ বা শেল্টার পর্যন্ত তোমার আওয়াজ পৌঁছাবে না। আমার প্রতিশোধের শিকার তোমাকে হতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, বেনেদেতা।'

'কি যা তা বকছ! ছাড়ো আমাকে···কিসের প্রতিশোধ, কি করেছি তোমার আমি?'

'তুমি?' হঠাৎ মুখ নামিয়ে বেনেদেতার নিচের ঠোঁটটা দাঁতের মাঝখানে নিয়ে একটু কামড়ে দিল রবিন। শরীরের উপর ভার হয়ে চেপে আছে রবিন, নিচে থেকে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বেনেদেতা। 'না, তুমি আমার কোন ক্ষতি করোনি,' বলল রবিন। 'সুযোগই পাওনি তুমি। পেলে হয়তো করতে। সে যাক···'

'লাগছে আমার, রবিন,' এতটুকু ঘাবড়ায়নি বেনেদেতা, বিপদটাকে সে ঠাণ্ডা মাথায় নিয়েছে। 'উঠে পড়ো। কথা দিচ্ছি, যা হবার হয়েছে, আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করব।'

'কিছুই হয়নি এখনও—হবে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রবিন। 'এবং হবার পর সে-কথা ভুলে যাও তাও আমি চাই না। তোমাদেরকে আমি ঘৃণা করি, বেনেদেতা। তাই শাস্তিটা এমনই দিতে চাই, চিরকাল যেন মনে থাকে···'

'কাপুরুষ!' অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল বেনেদেতা, নিমেষে অন্য এক মূর্তি ধারণ করল সে। 'পুরুষ জাতির কলঙ্ক তুমি, তুমি একটা মেরুদণ্ডহীন জানোয়ার! ভেবেছিলাম তুমি একজন সত্যিকার ভদ্রলোক, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বেঁচে থাকার অযোগ্য একটা নোংরা প্রাণী ছাড়া কিছুই নও!'

নিশুতি রাত চমকে উঠল রবিনের অট্টহাসিতে। এবার সত্যি সত্যি ভয় পেল বেনেদেতা, মাতালটার কবল থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

হাসি থামল রবিনের। বলল, 'আরও কিছু বলার থাকলে বলে নাও। কিন্তু যাই বলো না কেন, আমার শাস্তি থেকে আজ তোমার রেহাই নেই...'

গায়ের জোরে একজন পুরুষের সাথে পারবে কেন বেনেদেতা, কিন্তু আর কোন উপায় নেই দেখে হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল সে।

হ্যাঁচকা টান মেরে বেনেদেতার কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলল রবিন। নেশার ঘোরে কি করছে তা বুঝি সে নিজেও ভাল করে জানে না। বেনেদেতার বুকে একটা থাবা বসিয়ে ব্লাউজটা মুঠো করে ধরল সে, আবার টান দিয়ে ছিঁড়তে চাইছে এবার ব্লাউজের বোতাম।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বেনেদেতা। কান্নার শব্দে আরও যেন খেপে গেল রবিন। ব্লাউজটা ছিঁড়ে বেনেদেতার বুকের মাঝখানে বুক নামিয়ে দিল সে। একটা হাত রাখল বেনেদেতার ঘাড়ের পিছনে, বুকের সাথে পিষে ফেলছে সে কোমল নারীদেহটাকে।

শেষ পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় শুরু করল বেনেদেতা। 'তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে অপমান করো না...'

আরেকটা অট্টহাসিতে বেনেদেতার আবেদন চাপা পড়ে গেল।

'রবিন!' রবিনের মাথার পিছন থেকে তীক্ষ্ণ হুইসেলের মত বেজে উঠল সোহানার কণ্ঠ।

অট্টহাসিটা মাঝপথে থেমে যেতেই ভৌতিক নিস্তব্ধতা নামল চারদিকে। রবিন আর বেনেদেতা হাঁপাচ্ছে, আর কোন শব্দ নেই।

'ছাড়ো ওকে!' ঘ্যাচ করে রবিনের মাথার খুলিতে কুড়ুল মারল যেন সোহানার গলার স্বরটা।

ঝপ্ করে বাস্তবে ফিরে এসেছে রবিন। যন্ত্রের মত বেনেদেতাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

গাউনটা নামিয়ে উন্মুক্ত উরু দুটো ঢাকল বেনেদেতা। উঠে বসল দ্রুত। কোটটা টেনে বুক ঢাকল সে, তার উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখল হাত দুটোকে।

'তুমি যাও, বেনেদেতা,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল বেনেদেতা, ধীর পায়ে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে সে রক শেল্টারের দিকে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। তার সামনে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'কিছু বলার আছে তোমার?' রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকল রবিন।

'নেই,' বলল সোহানা। 'কিন্তু কিছু কথা আমার মুখ থেকে শোনার আছে তোমার—শোনো, বলছি।' রাগে হাঁপিয়ে গেছে সোহানা, দম নিয়ে শুরু করল সে, 'বাস্তবের মুখোমুখি হতে ভয় পায় যারা তারাই হয় মদের বোতল নয়তো মেয়েমানুষের ওপর পৌরুষ দেখিয়ে তার আড়ালে লুকাতে চায়—তুমিও তাই চাইছ, সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে তোমার মত শক্তিশালী একজন পুরুষের ভয়টা কিসের? কি এমন ঘটেছে তোমার জীবনে যে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে আছ? এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, তোমাকে আমার জোসেফ মিলারের চেয়েও অধম মনে হচ্ছে। তার নীচতাগুলোরও উৎস কোন না কোন ভীতিবোধ, কিন্তু তবু ভাল যে শুধু বোতলের ভিতরে লুকিয়েই ভয়-মুক্ত হতে পারে সে, অন্তত তোমার মত একাধিক আশ্রয়ের দরকার হয় না তার।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রবিন। কিন্তু মুখও তুলল না, কোন উত্তরও দিল না।

'ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকতে পারে না,' বলল সোহানা। 'এর সমাপ্তি টানতে হবে তোমাকেই।'

মুখ তুলল রবিন, মৃদু গলায় বলল, 'যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারি—তাই করছি। এর বেশি বলার কিছু নেই আমার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে মুখ করে হাঁটা ধরল সে।

'যাচ্ছ কোথায়, থামো!' তীব্র গলায় বলল সোহানা। 'শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই মিটে যাচ্ছে না ব্যাপারটা। তোমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তার সম্মান তুমি রাখোনি। বেনেদেতাকে অপমান করে তুমি আমাদের সবাইকে অপমান করেছ। বেনেদেতা ছাড়া আরেকজন যুবতী নারী এখানে রয়েছি আমি। নিজের নিরাপত্তার গরজেই গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার জানতে চাই আমি। জানতে চাই তুমি কি আসলেই পশু, নাকি ঝোঁকের মাথায় একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে যাচ্ছিলে। এই জানার ওপর নির্ভর করছে কতটুকু সাবধান হতে হবে আমাদের। তাছাড়া, নেতৃত্বের প্রশ্নটাও ভেবে দেখতে হবে আবার এখন।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রবিন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'তার আগে তোমার জঘন্য অন্যায়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই আমি,' নির্দয়তা ফুটে উঠল সোহানার কণ্ঠস্বরে। 'শুধু বেনেদেতার সাথে নয়, সবার সাথে অন্যায় আচরণ করছ তুমি। কি ভেবে নিয়েছ আমাদেরকে, দাবার গুটি? সিনর বরগুয়িজ থেকে শুরু করে জনসন, কোনালি—এমন কি মিস জুডির সাথেও ধমকের সুরে কথা বলো তুমি—কেন? এমন ভাব দেখাও তোমার সমস্যা সমাধান করার জন্যেই এখানে আছে সবাই, তাছাড়া আর কোন ভূমিকা নেই যেন কারও। একবারও বোধহয় ভাবনি, সমস্যাটা তোমার নয়, এটা আমাদের সবার সমস্যা। আমাদের সবার চেয়ে বেশি খাটছে জনসন, অথচ তার সাথে অকারণে লেগেছ তুমি। কেন?' গলার স্বর খাদে নেমে এল সোহানার, 'চিরকাল তুমি এমন ছিলে, কেন যেন তা আমার মনে হয় না। নাকি আমার ধারণাটা ভুল, রবিন?'

দুর্বল হয়ে পড়ছে রবিন। ভেতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা ভাবাবেগ, মনে হচ্ছে সব কথা এখন একে যদি খুলে বলতে না পারে, দম ফেটে

মারা যাবে সে।

'কিছু একটা ঘটেছে তোমার জীবনে, কি সেটা, রবিন?' সোহানার অপেক্ষাকৃত নরম সুর সহানুভূতির মত শোনাল রবিনের কানে। 'বলে ফেলো, হালকা হয়ে যাবে মন।'

'বলার মত নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল রবিনের। 'ভয়ঙ্কর অপমানের কথা।'

'বসো,' হাত নেড়ে বসতে ইশারা করল রবিনকে সোহানা। রবিন ধীরে ধীরে বসে পড়ল একটা পাথরের উপর। সোহানাও বসল তার সামনা সামনি। বলল, 'হোক অপমানের—কিছু এসে যায় না তাতে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, যুদ্ধ করছি প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। এর চেয়ে সত্য আর কিছুই নয়। এই মুহূর্তে অতীত জীবনের অপমান, লাঞ্ছনা, বেদনা যদি তোমার পায়ে শৃঙ্খল হয়ে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সমূহ বিপদ। আমাদের সবার স্বার্থে তোমার ব্যক্তিগত সমস্যাটার কথা জানা দরকার আমার। নাও, শুরু করো···কি ঘটেছিল মেয়েটার সাথে—ডিভোর্স?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'কেন? তুমি তো ভালবাসতে তাকে, ও বাসত না?'

টপটপ করে কয়েক ফোঁটা গরম পানি গড়িয়ে পড়ল রবিনের গাল বেয়ে। ধীরে ধীরে মুখ খুলল সে। একটু একটু করে সব জেনে নিল সোহানা। ওর একান্ত আদরের ধন জেমকে নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নেয়ার কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রবিন। সমবেদনায় চোখের পাতা ভিজে গেল সোহানারও। আর তাই দেখে গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করল রবিন সোহানার প্রতি। সব নারী যে এক নয়—একথাটা হঠাৎ করেই শিখে ফেলল সে আশ্চর্য এক বাঙালী রমণীর কাছ থেকে।

'তোমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে,' সব শুনে বলল সোহানা। 'কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ কি, সব জানার পরও যে ব্যক্তি জেমকে ভালবেসে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, সে কত বড় মহৎ হৃদয়ের অধিকারী? সেই মহত্ত্ব আজ তোমার মধ্যে কোথায়, রবিন? রলি বেঈমানী করেছে তোমার সাথে, কিন্তু তুমি? তুমিও কি নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছ না? আশ্চর্য, কত বদলে গেছ তুমি! একবারও ভাবনি, এই দুনিয়ায় রলিদের সংখ্যা নগণ্য—ওদেরকে ভুলে যাওয়াই সব দিক থেকে ভাল। ঠকিয়েছে তোমাকে, জেমকে কেড়ে নিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রতি তোমার যে ভালবাসা সেটুকু তো আর কেড়ে নিতে পারেনি!'

'না তা পারেনি,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল রবিন। 'চিরকাল ওকে মনে থাকবে আমার!' ধীরে ধীরে সোহানার দিকে ফিরল ও। 'আজ যে উপকার করলে, কোনদিন ভুলব না। তোমার মত করে কখনও ভাবিনি, এখন বুঝতে পারছি নিজের অজান্তে আস্ত একটা স্বার্থপর অমানুষ হয়ে উঠেছি আমি।' খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ও, তারপর বলল, 'এখন কি করা উচিত আমার? বেনেদেতার কাছে মাফ চাইব?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু সে কি আর আমাকে আগের চোখে দেখবে?'

'সে কথা ভেবে দ্বন্দ্বে ভোগার কোন মানে হয় না,' বলল সোহানা। 'তোমার

প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। 'আমি তাহলে যাই, আর সবার সাথেও কথা বলা দরকার আমার।'

একটা অপরাধ বোধে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন, বুঝতে পারছে সোহানা। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, এ লোক সম্পূর্ণ বদলে যাবে আজ থেকে। কিন্তু তবু কি সে বেনেদেতার কাছ থেকে ক্ষমা পাবে?

'যাও,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা। নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করছে কাঁধে ও। জানে, রবিনের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না বেনেদেতা। যাতে তাকায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ওকেই।

দুই

কুয়াশার আঁচলে ঘোমটা মুড়ি দিয়ে ভোর এল। রোদ উঠতেই স্বচ্ছ হয়ে গেল আকাশ। ট্রিবুসেটের কাছে একটা সভায় বসল ওরা পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার জন্যে। 'কি মনে হচ্ছে তোমার?' জনসনকে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'কতক্ষণ লাগবে ওটা মেরামত করতে?'

দেড় ইঞ্চি লম্বা চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল কোনালি, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে রবিনের দিকে। কি যেন ঘটেছে ওর, ভাবছে সে। কারও উপর চোটপাট করছে না, নিরীহ একটা ভাব নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একধারে। ঘাড় ফিরিয়ে বেনেদেতার দিকে তাকাল কোনালি, ব্রিজের দিকে নজর রাখছে সে। মেয়েটারও কি যেন একটা হয়েছে, কাজের ছুতোয় আজ আর সে রবিনের আশপাশে ঘুর ঘুর করছে না, বরং সতর্কতার সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখছে সকাল থেকেই।

'আরও দু'ঘণ্টা। তার কমে পারব না।' এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল জনসন।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সোহানা, কিন্তু হঠাৎ থমকে গিয়ে মাথাটা কাত করল একদিকে, কিছু শুনতে চেষ্টা করার ভঙ্গিতে। কয়েক সেকেন্ড পর রবিনও শুনতে পেল শব্দটা—দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে একটা জেট প্লেন।

নদীর উজান দিকের আসমান থেকে আচমকা ওদের কাছে চলে এল প্লেনটা। নিমেষে চারদিক কেঁপে উঠল একটানা ইঞ্জিনের গর্জনে, স্যাঁত করে ছুটে গেল একটা ছায়া ওদের উপর দিয়ে। মাথা ঘুরিয়ে দেখছে ওরা জেটটাকে, হঠাৎ সেটা খাড়া হয়ে উঠে গেল উপরে, সেই সাথে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল। 'দেখতে পেয়েছে—ওরা আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে,' চেঁচিয়ে উঠল জনসন। উত্তেজনায় ছোট ছেলের মত লাফাচ্ছে সে, পাগলের মত মাথার উপর হাত নাড়ছে।

'ওটা একটা স্যাবর জেট,' বলল রবিন। 'ওই, ফিরে আসছে আবার।'

দূর দিগন্তে খুদে একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে এখন প্লেনটাকে, বাঁক নেবার জন্যে

উত্থানের শিখরে পৌঁছে নাক নিচু করে ডাইভ দিচ্ছে নিচের দিকে। জীবনে বোধহয় এত জোরে চিৎকার করেননি মিস জুডি। তাঁর দুই হাত মাথার উপর পাখির ডানার মত অবিরাম ঝাপটা মারছে। পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ বলল রবিন, 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার—সবাই ছড়িয়ে পড়ো—টেক কাভার!'

চিল এসে পড়লে মুরগীর ছানারা যেভাবে ছুটোছুটি শুরু করে ওরাও সেভাবে যে যেদিকে পারল ছুটে লুকিয়ে পড়ল। সগর্জনে আবার এসে পড়ল মাথার উপর স্যাবরটা। কিন্তু মেশিনগানের কোন শব্দ হলো না। ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে সেটা, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ইঞ্জিনের শব্দ। আরও দুবার ওদের উপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা, যেখান দিয়ে উড়ে গেল ঠিক তার নিচের লম্বা ঘাসের গোছাগুলো কাঁপতে কাঁপতে নুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর দীর্ঘ একটা দূরত্ব পাড়ি দিল সেটা তির্যকভাবে পশ্চিম দিকে উঠে গিয়ে, অ্যান্ডেজের চূড়া ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত।

বেরিয়ে এসে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়াল সবাই ওরা, তাকিয়ে আছে শৃঙ্গগুলোর দিকে। নিস্তব্ধতা ভাঙল প্রথমে জনসন, রবিনের দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকাল সে, বলল, 'সব দোষ তোমার। এর জন্যে তুমি দায়ী। কোন্ বুদ্ধিতে লুকাতে বললে সবাইকে? প্লেনটা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করতে এসেছিল।'

'তাই কি?' বলল সোহানা। 'বেনেদেতা, কর্ডিলেরার এয়ারফোর্সে কি স্যাবর জেট আছে?'

'ওটা একটা এয়ারফোর্স ফাইটার, সন্দেহ নেই,' বলল বেনেদেতা। 'কিন্তু এটা কোন্ স্কোয়াড্রনের তা আমার জানা নেই।'

'গায়ে প্রতীক চিহ্ন ছিল নিশ্চয়ই,' বলল রবিন। 'কিন্তু দেখতে পাইনি আমি। কেউ দেখেছ?'

দেখেনি কেউ।

'প্লেনটা কোন্ স্কোয়াড্রনের তা জানা গেলে ব্যাপারটা বোঝা যেত,' বলল রবিন।

'নিশ্চয়ই আমাদেরকে খুঁজতে এসেছিল,' জোর দিয়ে বলল জনসন। রবিনের উপর ভয়ানক রেগে গেছে সে।

'না,' ধারণাটা বাতিল করে দিল সোহানা। 'ঠিক কোথায় আসতে হবে তা জানত পাইলট—খোঁজার ভঙ্গিতে আসেনি সে, সরাসরি আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। ঠিক এখানেই যে আমরা আছি, তা সে জানল কিভাবে? আমরা তাকে বলিনি, রানা বা লোপেজ তাকে বলেনি—সবে মাত্র আজ ওরা মাইন ছেড়ে রওনা হয়েছে—কে বলল তাহলে?'

হাতের চুরুটটাকে নদীর দিকে খাড়া করে ধরল কোনালি, 'ওরা বলেছে। প্লেনটা যে আমাদের সাহায্য করতে আসেনি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'অনেক হয়েছে, এবার কাজে হাত দাও,' অস্থির হয়ে উঠে তাড়া লাগাল সোহানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রিজটাকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। গিলটি

মিয়া, একটা ক্রস বো নিয়ে ভাটির দিকে চলে যাও। ওপারে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে নজর রাখতে হবে তোমাকে। এদিকে কাউকে যদি আসতে দেখো, একটা বোল্ট ছুঁড়ে সাথে সাথে ছুটে এসে খবর দেবে। বেনেদেতা, যাও ব্রিজের ওপর নজর রাখো তুমি। বাকি আমরা সবাই ট্রিবুসেটের পিছনে লাগি এসো।'

হিসেব করতে ভুল করেছিল জনসন, দু'ঘণ্টা উতরে যাবার পরও দেখা গেল ট্রিবুসেটটা এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। ঘামে ভেজা ধুলো মাখা হাত দিয়ে কপালটা ঘষে নিয়ে বলল সে, 'আরও এক ঘণ্টা লাগবে।'

কিন্তু এক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল না। চিৎকার করে সবাইকে থামতে বলল সোহানা। কাজ বন্ধ করে সবাই তাকাল তার দিকে। 'ট্রাকের আওয়াজ পাচ্ছি আমি,' বলল সে। তার কথা শেষ হতেই ভাটির দিক থেকে রাইফেলের শব্দ ভেসে এল। পরমুহূর্তে আরেকটা শব্দ কানে ঢুকল ওদের। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা সোহানার। নিমেষে কালো হয়ে গেছে সবার চেহারা। একটানা কয়েক সেকেন্ড পর থামছে শব্দটা, তারপর আবার শুরু হয়ে কয়েক সেকেন্ড পর থেমে যাচ্ছে—মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করছে শত্রুরা।

দৌড়ে বেনেদেতার কাছে পৌঁছুল সোহানা। এক নিঃশ্বাসে জানতে চাইল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' নদীর ওপারে চোখ রেখে বলল বেনেদেতা। এক সেকেন্ড পর উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ট্রাক···একটা; দুটো, তিনটে ট্রাক—বড় আকারের।'

'নেমে এসো। দেখতে দাও আমাকে।'

উঁচু-নিচু পাথরের মাঝখান থেকে ক্রল করে নেমে এল বেনেদেতা, তার জায়গায় উঠে গেল সোহানা একই ভঙ্গিতে। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে রাস্তা ধরে ব্রিজের দিকে ছুটে আসছে বড় একটা আমেরিকান ট্রাক, সেটাকে অনুসরণ করছে আরও দুটো। প্রথমটায় লোকজন ভর্তি, কমপক্ষে বিশ-পঁচিশজন, সবাই রাইফেলধারী। অস্বাভাবিক কি একটা আছে ট্রাকটার সাথে, দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছে না সোহানা। পর মুহূর্তে ট্রাক-বডির নিচে ইস্পাতের পাতটা দেখতে পেল, পেট্রল ট্যাঙ্কটাকে আড়াল করে রেখেছে। হুঁ, ভাবল ও, সাবধানতা অবলম্বন করছে ওরা।

ঝাঁকি দিয়ে ব্রিজের কাছে থামল ট্রাকটা, নেমে পড়ল লোকজন, দ্রুত আড়ালে চলে গেল। প্রথমটার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দ্বিতীয় ট্রাকটা। স্টিয়ারিং হুইলের সামনে এবং পাশের সীটে দুজন লোককে দেখতে পাচ্ছে সোহানা, কিন্তু এটার পিছনে লোকজন নেই। পিছনের লম্বা খোলটা তেরপল দিয়ে ঢাকা, ভিতরে কি আছে দেখার উপায় নেই। তৃতীয় ট্রাকে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কিছু কম লোকজন রয়েছে, ধরাধরি করে তারা একটা লাইট মেশিনগান নামাচ্ছে দেখে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল সোহানার। অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল ওরা লাইট মেশিনগানটাকে।

'ওদেরকে পাঠিয়ে দাও এখানে,' বেনেদেতাকে বলল সোহানা।

রবিনের পিছু পিছু জনসন এবং কোনালি এল। সব শুনে বলল জনসন, 'মেশিনগানের কথা শুনে মনটা দমে যায় ঠিকই, কিন্তু ওরা কি এমন করতে পারবে

ওটা দিয়ে যা রাইফেল দিয়ে পারেনি?'

'হোস পাইপ দিয়ে পানি মারার মত করে বুলেট ছুঁড়তে পারবে,' বলল রবিন। 'ধৈর্যের সাথে নিয়ম ধরে তা করলে খাদের গা ধসিয়ে দেয়া সম্ভব। তা যদি দেয়, গা ঢাকা দিয়ে ব্রিজের ওপর নজর রাখার জায়গা পাব না আমরা। তাছাড়া, এখন ক্রস বো ছুঁড়তে চাইলে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে কোনালিকে, বলল, 'দ্বিতীয় ট্রাকটা খালি, বলছ?'

'তা কখন বললাম? বলেছি ওটায় লোকজন ছিল না। তেরপল দিয়ে ঢাকা বলে পিছনে কি আছে দেখতে পাইনি।' তিক্ত হাসল সোহানা। 'হাতি ঘোড়া যাই নিয়ে আসুক, আমাদের বিপদের মাত্রা বাড়ছে বৈ কমছে না।'

টোকা মেরে শুকনো ঘাসের একটা পাতা শার্ট থেকে ফেলে দিয়ে কোনালি বলল, 'ব্যাপারটা কেন যেন ভাল ঠেকছে না আমার।'

কি যেন চিন্তা করছিল সোহানা, হঠাৎ সে কাঁধ ঝাঁকাল, মুখ তুলে তাকাল এক এক করে সবার দিকে। একটা ইতস্তত ভাব কাটিয়ে উঠতে চাইছে সে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রবিন।

'ব্যাপারটা কেন যেন আমারও ভাল ঠেকছে না। আমি মনে করি এখন একটা মাত্র উপায় খোলা আছে আমাদের সামনে—ওদের সাথে আপস রফা করা,' অপ্রত্যাশিতভাবে বলল সোহানা। 'বিরোধ যত বড়ই হোক না কেন, আপসের সুযোগ একবার পাওয়া যায়ই। সুযোগটা নিতে চাই আমি, ওদের সাথে সন্ধি করতে চাই।'

হতভম্ব হয়ে গেছে জনসন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রবিন, সোহানার মনের কথাটা পড়তে চেষ্টা করছে সে। বিস্মিত, আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেনেদেতা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা। একমাত্র প্রফেসর কোনালি গম্ভীর, সোহানার প্রস্তাবে আশ্চর্যও হয়নি, দুঃখিতও নয় সে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে নিস্তব্ধতা ভাঙল রবিন। 'কিছু দান করার থাকলে তবেই সন্ধি হয়। শত্রুরা সবদিক থেকে আমাদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, কোন্ দুঃখে আপস করতে রাজী হবে ওরা? তার আগে জবাব দাও—আমরাই বা আপস করতে যাব কেন? আমরা জানি, যা চাইব তাই অকাতরে দান করার প্রতিশ্রুতি দেবে ওরা, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কিছুতেই রক্ষা করবে না—এসব কথা ভেবে তাহলে লাভ কি?'

'ওদেরকে দান করার মত কিছু নেই আমাদের হাতে, একথা বলছ কেন?' শান্ত ভঙ্গিতে বলল সোহানা। 'সিনর বরগুয়িজ রয়েছেন আমাদের হাতে। ওরা তো তাঁকেই চায়, সুতরাং আমরা তাঁকে ওদের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব দেব।' একযোগে সবাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে থামতে বলল সে। 'আমরা জানি, বিনিময়ে ওরা আমাদের জীবন দান করার প্রস্তাব দেবে, সেইসাথে এও জানি যে সে-প্রতিশ্রুতি ওরা রক্ষা করবে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আরে না, সিনর বরগুয়িজকে সত্যি সত্যি ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি না আমরা। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে কয়েকটা ঘণ্টা আদায় করে নেয়াই উদ্দেশ্য

হবে আমাদের। হাতে কয়েকটা ঘন্টা পেলে এদিকে আমরা নিজেদেরকে অনেকটা তৈরি করে নেবার সুযোগ পাব।'

বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করল রবিন, তারপর জানতে চাইল, 'কি মনে করো, জনসন?'

কাঁধ ঝাঁকাল জনসন। 'ধারণাটা ভাল। এতে আমাদের কিছুই হারাবার নেই সন্ধির প্রস্তাবে যদি রাজী হয় ওরা, আর কিছু না হোক, কিছু সময়ের জন্যে দূরে সরে থাকবে বিপদটা। এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি আমরা, ওই সময় আদায় করার জন্যেই, নয় কি?'

'সময় পেলে ট্রিবুসেটটা মেরামত করে নিতে পারব,' বলল রবিন, 'এই নগদ লাভটুকুও কম না। ঠিক আছে, দেখা যাক চেষ্টা করে।'

'এক মিনিট,' বলল কোনালি, 'এখুনি কি কিছু করতে যাচ্ছে ওরা?'

খাদের ওপারে তাকাল রবিন। শত্রুদেরকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। গোটা পরিস্থিতি শান্ত, থমথম করছে। 'না,' গম্ভীর ভাবে বলল সে।

'ওরা কিছু একটা শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি আমরা,' বলল কোনালি। 'সম্ভবত নবাগতদের সাথে মীটিং করছে ওরা, তা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। এই সময়টাকে উপরি পাওনা হিসেবে নিতে চাইলে আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কিছু শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।'

নদীর ভাটির দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন মিস জুডি, হঠাৎ তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'গিলটি ভায়া কিন্তু এখনও ফিরে আসেনি।'

'তাই তো?' বলেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সোহানা।

'দাঁড়াও,' বাধা দিল রবিন। 'আমি যাচ্ছি—ওকে তুলে আনতে হতে পারে।'

উঁচু নিচু পাথরগুলোর মাঝখান থেকে নেমে এসে সমতল মাটির উপর দিয়ে ছুটল রবিন। ব্রিজ থেকে ওকে শত্রুরা দেখতে পাবে বলে ঘুর পথে খানিক দূর এগিয়ে তারপর রাস্তা পেরোতে হলো তাকে। ওপারে পৌঁছে পাথরের আড়াল আবডালে গা ঢাকা দিয়ে ভাটির দিকে এগোচ্ছে। গিলটি মিয়া কোথায় পজিশন নিতে পারে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা আছে ওর। কিন্তু সরাসরি সেখানে পৌঁছে গিলটি মিয়াকে দেখতে পেল না। বিশ মিনিট দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে গেছে সে। ছুঁচাল দিকগুলো মাটিতে গাঁথা অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বোল্ট, সেগুলোর দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত পর একটা পাথরে খানিকটা রক্ত দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুকটা।

মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে রবিন। রক্তের আরেকটা দাগ। তারপর আরেকটা। দাগগুলো অনুসরণ করে এগোচ্ছে রবিন। একশো গজের মত এগিয়ে গেল সে; তারপর দুর্বল গোঙানির শব্দ শুনতে পেল। একটা পাথরকে পাশ কাটাতেই এবার সে দেখতে পেল গিলটি মিয়াকে। পাথরটার ছায়ায় শুয়ে আছে গিলটি মিয়া, বাঁ দিকের কাঁধটা চেপে ধরে আছে এক হাত দিয়ে, অপর হাত দিয়ে চোখের পানি মুছছে। হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসল রবিন, দু'হাত দিয়ে ধরে মাটি থেকে তুলল মাথাটা। 'কোথায় লেগেছে, গিলটি মিয়া? কাঁধে? তা ঠিক হয়ে যাবে…'

চোখ মেলে তাকাল গিলটি মিয়া। রবিনকে দেখে ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'আর কোথাও লেগেছে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল গিলটি মিয়া। রাগে দুঃখে ঠোঁটের কোণ দুটো প্রসারিত হলো দু'দিকে। 'শুদু কাঁদে লেগেচে—ও কিচু না। কিন্তু ক্রস বো-টা হারিয়ে ফেলেচি আমি।'

'সেজন্যে কাঁদছ? দূর বোকা!' বেশি নাড়া না দিয়ে গিলটি মিয়ার কাঁধের কাছে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল রবিন। স্বস্তির পরশ অনুভব করল সে. ক্ষতটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। চামড়া সহ কিছুটা মাংস তুলে নিয়ে গেছে বুলেট. ভাগ্য ভাল হাড়ে ঘষা খায়নি। কিন্তু প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলে নিস্তেজ, দুর্বল হয়ে পড়েছে গিলটি মিয়া।

'ট্রিবুসেটটা মেরামত হয়নি একোনো. এদিকে ধনুকটাও হারালুম.…এঁকড়ে ধরে রাকলে এমনটা হত না…ধাক্কাটা লাগতেই হাত ফস্কে পড়ে গেল নদীতে…'

'পড়ে গেছে ভাল হয়েছে,' বলল রবিন। 'একটা ক্রস বোর চেয়ে তোমার প্রাণের দাম অনেক বেশি।' শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতটা বেঁধে দিল সে। 'হাঁটতে পারবে?'

'দলের মদ্যে একমাত্র আমিই গুলি খেয়েচি তো. তাই একটু লজ্জা পাচ্ছিলুম.' দুর্বল একটু হাসল গিলটি মিয়া। 'যদি পারো. কাঁদে করে নিয়ে চলো আমাকে—চোখ বুজে পড়ে থাকব আমি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রবিন, তারপর হেসে ফেলে নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'কিন্তু গুলি খাওয়াটা লজ্জার কোন ব্যাপার নয়, বুঝলে?'

'গর্বের কিচু আচে?'

স্বীকার করতে হলো রবিনকে, 'না, তা নেই।'

গিলটি মিয়াকে কাঁধে তুলে নিয়ে ধীরপায়ে ব্রিজের কাছে ফিরে এল রবিন। রক শেল্টারে পৌছে মিস জুডির জিম্মায় গিলটি মিয়াকে যখন তুলে দিল, তখন ভান করে চোখ বুজে নেই সে, সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মিস জুডি ছাড়া সবাই আবার ফিরে এল ব্রিজের কাছে। 'সন্ধির প্রস্তাব দেয়া এখন আরও প্রয়োজন হয়ে উঠেছে,' বলল রবিন। 'আঘাতটা মারাত্মক না হলেও রক্ত ঝরে দুর্বল হয়ে গেছে গিলটি মিয়া, সুস্থ হতে সময়ের দরকার। কিছু ঘটেছে নদীর ওপারে?'

'না,' বলল কোনালি। 'তবে ট্রিবুসেটকে আবার প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছি আমরা।'

এর কিছুক্ষণ পরই নড়েচড়ে উঠল শত্রুরা। দু'জন লোককে দেখা গেল, দ্বিতীয় ট্রাকটা থেকে তেরপল সরাচ্ছে। 'আর দেরি করার মানে হয় না,' বলল রবিন। লম্বা শ্বাস টেনে চিৎকার করে স্প্যানিশ ভাষায় বলল, 'সিনরস—সিনরস! আমি তোমাদের লীডারের সাথে কথা বলতে চাই। তাকে আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে আসতে বলো। আমরা ছুঁড়ব না কিছু।'

তেরপল ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল লোক দু'জন, পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর খাদের দিকে ঘাড় ফেরাল। কি করবে ঠিক করতে পারছে না ওরা। বিদ্রূপের সুরে কোনালিকে বলল রবিন, 'সম্ভব হলে গোটা অ্যান্ডেজটাকে তুলে ছুঁড়ে দিতাম শালাদের মাথার ওপর।'

লোক দু'জন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে বলে মনে হলো; দৌড়ে পাথরের আড়ালে চলে গেল তাদের একজন, এবং দু'মিনিট পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী সেই নেতা গোছের লোকটা. পরনে বাঘের ছাপ মারা ইউনিফর্ম, দাড়ির সাথে সংযুক্ত গোঁফে ভারিক্কি চালে পাক দিচ্ছে। রাস্তা ধরে নিচের দিকে নেমে এল সে, দাঁড়াল ব্রিজের গোড়ায়। চিৎকার করে বলল, 'সিনর বরগুয়িজ নাকি?'

'না,' স্প্যানিশের বদলে ইংরেজিতে হাঁক ছাড়ল এবার রবিন। 'আমি ক্যাপ্টেন রবিনসন।'

'ও, বাহাদুর সেই পাইলট?' ইংরেজিতেই বলল দৈত্যাকৃতি লোকটা। ওদের পরিচয় জানে শত্রুরা, চমকে উঠে ভাবল রবিন। লোকটা জানতে চাইল, 'কি চাও তুমি, সিনর রবিন?'

'সিনর,' বলল রবিন, 'তোমরা গুলি করছ কেন?'

হো হো, হা হা—গলার স্বর বদলে কিছুক্ষণ নানা স্কেলের হাসি ছাড়ল সন্ত্রাসবাদীদের নেতা, তারপর বলল, 'কেন গুলি করছি তা তুমি সিনর বরগুয়িজকে জিজ্ঞেস করোনি? নাকি সে এখনও নিজেকে মন্টেস বলে পরিচয় দিচ্ছে?'

'বরগুয়িজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' জানাল রবিন। 'তার সাথে তোমাদের বিরোধ, তাতে আমার কি? বিশ্বাস করো, এই পরিস্থিতিতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।'

অট্টহাসির দমকে মাথাটা পিছন দিকে হেলে পড়ল নেতার, নিজের উরুতে মস্ত এক চাপড় মেরে বলল সে, 'সুতরাং?'

'এখান থেকে মুক্তি চাই আমি।'

'বরগুয়িজের ব্যাপারটা?'

'ওকে তুমি নিতে পারো। সেজন্যেই তো এসেছ তোমরা, তাই না?'

এবার আর হাসছে না দশাসই, মাথাটা একদিকে কাত করে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করছে। ফিস ফিস করে কি যেন বলল রবিন সোহানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে। সায় দিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সোহানা, তারপর নিচু গলায় কি যেন বুঝিয়ে দিতে শুরু করল বেনেদেতাকে। 'ঠিক আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল বেনেদেতা।

'ব্রিজে নিয়ে এসো বরগুয়িজকে, সিনর রবিন,' চিৎকার করে জানাল লোকটা, 'ওকে হাতে পেলে তোমাদের আমরা অবাধে চলে যেতে দেব।'

'মেয়েটার কি হবে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'তাকেও আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, অবশ্যই।'

বেনেদেতার সাথে চোখাচোখি হতেই একটা চোখ টিপল রবিন, অমনি রক্ত পানি করা রোমহর্ষক একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল বেনেদেতার কণ্ঠস্বর থেকে, ছয় সেকেন্ড পর অকস্মাৎ থেমেও গেল সেটা, কেউ যেন বেনেদেতার মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল চিৎকারটাকে।

আরও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর প্রতিপক্ষের উদ্দেশে বলল রবিন, 'দুঃখিত, সিনর,—একটু বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল,' কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলল সে, 'বুঝতেই তো পারছ এখানে আমি একা নই—আরও অনেকে রয়েছে।'

'তোমরা সবাই মুক্তি পাবে;' দরাজ গলায় বলল নেতা, 'আমি, নিজে

তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদে সান ক্রোসে পৌঁছে দেব। এবার বরগুয়িজকে ব্রিজে নিয়ে এসো, ওকে আমাদের হাতে তুলে দিলেই তোমরা মুক্ত।'

'এক্ষুণি? তা সম্ভব নয়,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'বরগুয়িজ রয়েছে ওপরের ক্যাম্পে। ব্রিজের এখানে বিপদ দেখে চলে গেছে সে। আবার তাকে নামিয়ে আনতে সময় লাগবে।'

সন্দিহান হয়ে উঠল দৈত্যটা, মাথাটা একটু কাত করে তাকিয়ে আছে এদিকে। 'বরগুয়িজ ভেগেছে?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল সে।

'ধুস শালা!' বিড় বিড় করে বলল রবিন, তারপর চিৎকার করে জানাল, 'লোপেজ ওপরের ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল বরগুয়িজকে কিন্তু লোপেজ মারা গেছে তোমাদের মেশিনগানের গুলিতে।'

'আচ্ছা! লোপেজই তাহলে একটু আগে রাস্তার ওপর আমাদেরকে আক্রমণ করেছিল! মারা গেছে শুনে বড়ই ব্যথা পেলাম, ক্যাপ্টেন। খুবই ইচ্ছা ছিল ওকে হাতে পাবার।' চিন্তিতভাবে নিজের বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে লোকটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রবিন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ব্যাটা।

মাথা তুলে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, সিনর রবিন।'

'কতক্ষণ?'

'দু'চার মিনিট, তার বেশি নয়,' রাস্তা ধরে উঠে গেল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে।

পিছন ফিরল রবিন, সোহানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম বুঝছ?'

'সেকেন্ড-ইন কমান্ডের সাথে পরামর্শ করতে গেল,' বলল সোহানা।

'টোপটা গিলবে বলে আশা করো?'

'বুদ্ধি করে লোপেজের কথাটা বলে ভাল করেছ,' বলল সোহানা। 'ওরা ভাববে লোপেজই এতক্ষণ একজোট করে রেখেছিল আমাদেরকে, সে মারা যেতে আমাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। আমি আশাবাদী।'

দু'চার মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট দেরি করল সন্ত্রাসবাদীদের নেতা। এবার সাথে একজন লোককে নিয়ে ব্রিজের গোড়ার কাছে এসে দাঁড়াল সে। সঙ্গীটি বেঁটে, কিন্তু শারীরিক গঠন দেখে বোঝা যাচ্ছে বুনো ঘোড়ার মত শক্তিশালী এই লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল, কালো টুপির মত খুলি কামড়ে বসে আছে, 'ঠিক আছে,' বলল দশাসই নেতা। 'আপস রফায় রাজী আছি আমরা। বরগুয়িজকে নামিয়ে আনতে কতক্ষণ লাগবে?'

'অনেক দূরের পথ,' দম নিয়ে বলল রবিন, 'বেশ অনেকটা সময় লাগবে ধরো, পাঁচ ঘণ্টা।'

সহকারীর সাথে পরামর্শ করল লোকটা, তারপর চিৎকার করে জানাল, 'ঠিক আছে, পাঁচ ঘণ্টা।'

'এখন থেকে তাহলে যুদ্ধ-বিরতি?' বলল রবিন। 'এদিক ওদিক কোনদিক থেকেই হামলা হবে না?'

'হবে না,' প্রতিশ্রুতি দিল প্রতিপক্ষ।

একটা হাঁফ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। 'বাঁচা গেল!' তিক্ত হেসে বলল সে,

'অন্তত পাঁচটি ঘণ্টার জন্যে তো বটেই। আয়ু বাড়াবার জন্যে এত ঝামেলা কখনও পোহাতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না।'

'ট্রিবুসেট,' ব্যস্তভাবে বলল সোহানা। 'বাকি কাজটুকু সেরে রেডি করে রাখো ওটাকে।' লাঠি ঠুকে ঠুকে মিস জুডি এগিয়ে আসছেন দেখে দ্রুত জানতে চাইল সে, 'কেমন আছে গিলটি মিয়া, মিস জুডি?'

'গরম সুপ খাইয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে রেখে এসেছি,' হেঁটে এসে হাঁপাচ্ছেন, তবু সন্তুষ্ট চিত্তে একগাল হেসে নিলেন। 'চিন্তার কিছু নেই, উঠে হেঁটে বেড়াতে খুব একটা সময় নেবে না গিলটি ভায়া।'

'পাঁচ ঘণ্টা খুব কম সময়,' বলল কোনালি। 'এইটুকু যে পেয়েছি, সেটাও ভাগ্য, কিন্তু তবু এটাকে দীর্ঘ সময় বলা যায় না। চেষ্টা করলে হয়তো সময়টা আরও একটু বাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে ওদের কাছ থেকে।'

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' বলল সোহানা। 'কিন্তু খুব বেশি সময় চাওয়া যাবে না। পাঁচ ঘণ্টা পর সিনর বরগুয়িজকে যখন আমরা হাজির করতে ব্যর্থ হব, সাংঘাতিক সন্দিহান হয়ে উঠবে ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল কোনালি। বলল, 'কি করবে ওরা আমাদের? গত তিন দিন ধরে দেখছি তো, পেরেছে কিছু করতে?'

'পারেনি,' বলল সোহানা। 'কিন্তু আমার মন বলছে, এবার কিছু একটা করতে পারবে ওরা, সেজন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে ওদের। মনের এই অবস্থা বুঝেই আপস রফার ভান করে সময় চাওয়ার কথাটা এসেছে আমার মাথায়।'

'দেখা যাক,' আবার কাঁধ ঝাঁকাল কোনালি।

তিন

দিনটা বয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়ে গেছে ট্রিবুসেট। কারও হাতে তেমন কোন কাজ নেই। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন কি হয় দেখার জন্যে অপেক্ষার পালা চলছে ওদের—ক্রমশ থমথমে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে পরিবেশটা।

শাড়ি ছেড়ে ট্রাউজার আর শার্ট পরেছে সোহানা। কেন, তা কেউ জিজ্ঞেস করেনি ওকে।

কখন যেন আবার ভাব হয়ে গেছে বেনেদেতার সাথে রবিনের। দু'জনের কেউই সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে কাছাকাছি আসেনি, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের অদৃশ্য চাপে ওরা সবাই আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারও সাথে কারও কোন মনোমালিন্য নেই, ওরা সবাই যেন একই পরিবারের লোকজন—পরস্পরকে বোঝে, মেনে চলে, ক্ষমা দেয়, ভালবাসে।

কিছু যে একটা ঘটতে যাচ্ছে, সবাই তা জানে। সোহানার সাথে পরামর্শ করে

নিয়ে বেনেদেতা সহ অন্যান্যদের হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল রবিন। বলল, 'সরাসরি সংঘর্ষ বাধলে লড়ার জন্যে একটা ক্রস বো আর একটি মাত্র বুলেটসহ পিস্তলটাই আমাদের সম্বল। বেনেদেতা, গিলটি মিয়া হাঁটতে পারবে?'

'পারবে মানে? রীতিমত হাঁটছে সে,' বলল বেনেদেতা। 'এখানে আসতে চাইছিল, সোহানা রাগ করবে বলাতে ভয়ে আর এগোয়নি।'

'গুড,' বলল রবিন। 'গিলটি মিয়া আর মিস জুডিকে নিয়ে কেবিন ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে যাও তুমি। এখানে কি ঘটে বলা যায় না, তাড়াহুড়োর সময় ওদের দু'জনকে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে। দ্বিতীয় ট্রাকটায় কি আছে জানি না, কিন্তু ভাল কিছু যে নেই সে-ব্যাপারে আমি এবং সোহানা একমত।'

একটু পর রওনা হয়ে গেল তিনজন, সাথে বেশ কিছু মলোটভ ককটেল নিয়ে গেল ওরা।

রবিন আর সোহানা নজর রাখছে ব্রিজের উপর। দুই প্রফেসর, কোনালি আর জনসন ওজন করা বোল্ডারগুলো ট্রিবুসেটের কাছে সাজিয়ে সুদৃশ্য একটা পিরামিড তৈরি করছে।

নদীর ওপারের লোকজন পাথরের আড়াল-আবডাল থেকে উঠে এসেছে, তাদের আনাগোনায় জ্যান্ত হয়ে উঠেছে পাহাড়তলীটা। অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করছে কেউ কেউ, সিগারেট ফুঁকছে, গল্পগুজবে মেতে আছে ওপারের পরিবেশে সেই টান টান উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই আর, ঢিল পড়ে ঝুলে গেছে যেন।

লোকগুলোকে গুনল রবিন, তারপর নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্যে সোহানাকে বলল, 'তেত্রিশজনের বেশি হচ্ছে না।'

'পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত গুনেছি আমি,' বলল সোহানা। 'ওদের ক্যাম্পে আরও পাঁচ-সাতজন থাকতে পারে।'

'তার মানে কমপক্ষে চল্লিশজন ওরা,' গম্ভীর মুখে বলল রবিন। 'আর এদিকে আমরা সক্ষম পুরুষ মাত্র তিনজন। তার মধ্যে জনসনকে বাদ দাও, ভীতুর ডিম সে।'

নিঃশব্দে একটু হাসল সোহানা। দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের। 'হাসছ কেন?' জানতে চাইল সে।

'হাসছি বেনেদেতা আর আমাকে গুনতির মধ্যে ধরছ না দেখে,' বলল সোহানা। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, বিপ্লব ঘটিয়ে একটা সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে যাচ্ছেন একজন প্রবীণ রাজনীতিক, এবং তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে বেনেদেতা। যে-কোন বিপদের জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এ-পথে পা বাড়িয়েছে সে। সুতরাং তাকে গুনতির বাইরে রাখতে পারো না তুমি। প্রয়োজনের সময় পুরুষদের মতই বাধা দেবে সে শত্রুপক্ষকে। আর আমার কথা যদি বলো, আমি একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর সাথে জড়িত, যে কোন বিপদে পড়লে কি করতে হবে সে-সম্পর্কে বিশেষ ট্রেনিং নেয়া আছে আমার।'

'তাই নাকি?' ক্ষীণ একটু ঠাট্টার সুরে বলল রবিন। 'আমি তো ভেবেছিলাম, শখের গোয়েন্দা তোমরা, চেয়ারে বসে বুদ্ধির মার-প্যাঁচ চর্চা করো। আচ্ছা, বলো তাহলে, তুমি শত্রুপক্ষের লোক হলে এই পরিস্থিতিতে কি করতে?'

একটু ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'ব্রিজের খুব একটা ক্ষতি করতে পারিনি আমরা। বড় ফাঁকটা পূরণ করতে পারলেই এপারে লোক পাঠাতে পারবে ওরা, তবে গাড়ি পাঠাতে পারবে না। আমি হলে কি করতাম? এপারে এসে খাদের কিনারায় ছড়িয়ে দিতাম লোকজনকে, এখন যেখানে আমরা রয়েছি। আমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ব্রিজটাকে পুরোপুরি মেরামত করতে বেগ পেতে হবে না ওদেরকে। ব্রিজ মেরামত করে এপারে অন্তত কয়েকটা জীপ নিয়ে আসতাম, সেগুলোকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি উঠে যেতাম মাইন পর্যন্ত—তার মানে, আমরা সেখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছুবার আগেই রাস্তা ধরে পৌঁছে যাবে জীপগুলো। রাস্তার দুটো প্রান্ত ওরা দখল করে নিলে ফাঁদে আটকা পড়ব আমরা, কোনদিকে পিছু হটার উপায় থাকবে না।'

'হুঁ,' বলল রবিন। 'ঠিক তাই করবে ওরা, আমিও ভেবেছি।' গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুলো সে। 'আরে, দেখছ, মেঘ জমছে আকাশে।'

ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়গুলোর মাথার দিকে তাকাল সোহানা। প্রকাণ্ড একটা কালো থাবার মত দেখা যাচ্ছে মেঘটাকে, এরই মধ্যে খুব উঁচু শৃঙ্গগুলোকে ঢেকে ফেলেছে, বিশাল সব আঙুলের মত শাখা পাক খেতে খেতে নেমে আসছে মাইনের মাথার দিকে। 'তার মানে তুষার পড়বে,' বলল ও। 'আমাদের খোঁজে এয়ার-সার্চের যাও বা ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা ছিল তাও এখন আর নেই। রানা...,' শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল সোহানা।

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'সাংঘাতিক বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা।'

দাঁত দিয়ে একটা ঘাসকে চিরে দু'ফালি করছে সোহানা, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে।

মেঘের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বলল রবিন, 'নিচের দিকে নামছে মেঘটা, তার মানে আমাদের জন্যে খারাপ নাও হতে পারে। ঘন কুয়াশায় সুবিধে হবে আমাদের।'

চারঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আর এক ঘণ্টা পর বরগুয়িজকে চাইবে শত্রুরা। ঝপ্ করে নেমে এসে ঘন কুয়াশা ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে চারদিক। একই সময়ে একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ শুনে উঠে বসল সোহানা আর রবিন। ট্রাকগুলোর পিছনে ঝকঝকে গাড়িটাকে থামতে দেখল ওরা। বিরাট একটা মার্সিডিজ সেলুন কার। 'কে এল আবার?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

সুবেশী এক লোককে গাড়ি থেকে নামতে দেখছে সোহানা। মাঝারি গঠনের লোকটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করছে ও। দৃঢ়, বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ব্রিজের দিকে হাঁটছে সে। মুখটা চারকোনা, কার্নিসওয়ালা টুপির নিচে ছোট করে ছাঁটা চুলের কিনারা দেখা যাচ্ছে। ক্লিনশেভ। 'লীডার লোকটার বস্ বোধহয়,' বলল সোহানা। 'কর্তাদের কেউ একজন, সন্দেহ নেই।'

'ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে।'

ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে বিশালদেহী লীডারের সাথে কথা বলছে নবাগত বস্, তার হাত-ঝাপটা মারার ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কথায় কথায় ধমক মারছে সে লীডারকে। একটু পর দেখল ওরা, কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে লীডারের,

তর্কে বা যুক্তিতে হেরে গেছে সে। এর একটু পর বুক টান করে সিধে হলো আবার সে, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত একের পর এক হুকুম দিতে শুরু করল নিজের লোকজনকে।

সাথে সাথে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল নদীর ওপারে। গল্পগুজব করছিল, সিগারেট ফুঁকছিল যারা তারা সবাই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে। চারজন লোক প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, যেন ভূতে তাড়া করেছে ওদেরকে। দ্বিতীয় ট্রাকটার কাছে গিয়ে থামল ওরা। টানাটানি করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্রাক থেকে নামিয়ে ফেলল ভারী তেরপলটা। চিৎকার করে কি যেন বলল বসকে লীডার লোকটা। খাদের এদিকে একবার তাকাল বস্, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ধীর পায়ে, নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে মার্সিডিজের কাছে ফিরে গেল সে।

আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল সোহানা, 'সন্ধি ভাঙতে যাচ্ছে ওরা।'

'এখন?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল রবিনের কণ্ঠস্বর।

এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল সোহানা, তারপর ঝট্ করে দু'হাত দিয়ে ধরল লোডেড ক্রস বো-টাকে, টেনে আনল নিজের সামনে।

কর্কশ অট্টহাসির মত গর্জে উঠল মেশিনগান, বাতাস কেটে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। 'ট্রিবুসেটের কাছে যাও তুমি।' অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বসের পিঠে লক্ষ্যস্থির করল সোহানা, তারপর আস্তে করে চাপ দিল ট্রিগারে। ব্যর্থ হয়েছে দেখে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল ও। রি-লোডের জন্যে মাথাটা পাথরের আড়ালে নামিয়ে নিচ্ছে; এই সময় ট্রিবুসেটের ছোট বাহুর সাথে মাটির সংঘর্ষের শব্দ ঢুকল কানে।

আবার যখন মাথা তুলল সোহানা, দেখল, ট্রিবুসেটের লক্ষ্যও ব্যর্থ হয়েছে—পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে ব্রিজের রেডিমেড একটা দীর্ঘ অংশ। ছয়জন লোক বইছে সেটাকে, ইতিমধ্যে ব্রিজে উঠে পড়েছে তারা। এই ছয়জনকে অনুসরণ করে পুরোদমে ছুটে আসছে একদল সশস্ত্র লোক। একটা ক্রস বো'র বোল্ট দিয়ে ওদের কিছুই করা যাবে না, ওদিকে ট্রিবুসেট রি-লোড করারও সময় নেই—আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্রিজ পেরিয়ে এপারে চলে আসছে শত্রুরা।

ঘাড় ফিরিয়ে রবিন, জনসন এবং কোনালির দিকে তাকাল সোহানা, চেঁচিয়ে উঠল, 'রিট্রিট! রাস্তা ধরে—ক্যাম্পে!' তারপর মাথা নিচু করে ব্রিজের দিকে ছুটল ও, হাতে লোডেড ক্রস বো।

প্রথম লোকটা এরই মধ্যে ব্রিজ পেরিয়ে চলে এসেছে এপারে; প্রতিপক্ষের খোঁজে একবার এদিক, একবার ওদিক তাকাচ্ছে, বাগিয়ে ধরা সাব-মেশিনগানের নলটাও ঘুরছে সেই সাথে। ডাইভ দিয়ে একটা পাথরের আড়ালে পড়ল সোহানা। লক্ষ্যস্থির করে শুয়ে আছে ও, লোকটা আরও কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। দ্রুত ঘন হয়ে উঠছে কুয়াশা, দূরত্ব আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর সোহানার মনে হলো বিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে লোকটা, সাইটে চোখ রেখে ট্রিগারে চাপ দিল ও।

বুকের ঠিক মধ্যিখানে ফুটো করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল বোল্টটা। ছেড়ে

দেয়া ইস্পাতের মত সাব-মেশিনগান ধরা হাত দুটো খাড়া হয়ে গেল দুই কানের পাশে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল সে, আওয়াজের বদলে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। সটান পড়ে গেল শরীরটা, মরণ খিঁচুনির টান পড়ল সাব-মেশিনগানের ট্রিগারে। লোকটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল সোহানার দৃষ্টি ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে সশস্ত্র দলটা। উঠে আসছে রাস্তা ধরে। ঘাড় ফিরিয়ে নেবার আগে শেষবার দেখল সোহানা, রাস্তার উপর পড়ে থাকা শরীরটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে চলেছে সাব-মেশিনগানটা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল সোহানা।

চার

ছোট কুঠারটা দিয়ে বরফের দেয়াল খুঁড়ছে রানা। দেড় ঘণ্টা আগে জোসেফ মিলারের মাথা থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে নিয়েছে সে ওটা। অস্তিত্ব রক্ষার একটা হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করা জিনিসটা এখন সাংঘাতিক উপকারে লাগছে।

বরফের দেয়াল ঘেঁষে পুরানো কাপড়ের বস্তার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে লোপেজ, কার্নিসের কিনারা থেকে নিরাপদ দূরত্বে। মিলারের প্রাণহীন শরীর থেকে সব কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে সেগুলো দিয়ে ভালভাবে মুড়ে রেখেছে লোপেজকে রানা।

সামনে বিপজ্জনক একটা রাত। শত চেষ্টা করলেও প্রাণ রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। তবু হাল ছেড়ে দিয়ে বসে নেই ও। সবচেয়ে আগে দরকার একটা আশ্রয়। খোলা জায়গায় রাতটা কাটালে আর কোন সকাল দেখার সুযোগ হবে না ওদের।

এই পরিবেশে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল আশ্রয়ের ছবিটা কল্পনা করে আপন মনে তিক্ত হাসল রানা। ঢাকায় চলে গিয়েছিল মনটা এক লাফে। শুয়ে পড়েছিল নিজের ঘরের সেই পরিচিত গদিমোড়া খাটে। লেপটা টেনে নিচ্ছিল গায়ের ওপর—এমনি সময়ে আবার এক লাফে ফিরে এসেছে সে বাস্তবে।

ঢালু কার্নিসটাকে ঢেকে ফেলেছে কুয়াশা। ঝুর ঝুর করে তুষার পাত শুরু হয়েছে খানিক আগে। বরফ খুঁড়ে গর্ত করার কাজে একটু বিরতি দিল রানা, লোপেজের দিকে ঝুঁকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়া কাপড়ের হুডটা আবার তুলে দিল তার মুখে। এখনও জ্ঞান আছে লোপেজের। চোখের পাতা থেকে জমাট বাঁধা তুষার সরিয়ে দিল রানা, কিন্তু তবু চোখ মেলতে পারল না সে। শ্বাস বইছে, কিন্তু খুব ধীরে। সময় বয়ে যাচ্ছে, কথাটা মনে পড়তেই দ্রুত সিধে হলো আবার রানা, ছোট কুঠারটা তুলে নিয়ে ভাঙতে শুরু করল বরফের দেয়াল।

জীবনে কখনও এত শীত লাগেনি লোপেজের। হাত এবং পায়ে কোন সাড়া নেই তার। দাঁতের সাথে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত। আবার যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কখনও আর জ্ঞান ফিরে আসবে না, জানে সে। সেজন্যেই চাইছে বারবার

ফিরে আসুক বুকের ব্যথাটা। এই ব্যথাই ওকে তবু যাহোক একটু গরম করে তুলছে, জ্ঞান হারাতে বাধা দিচ্ছে। বিপদটা সম্পর্কে রানাও তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বারবার আঘাত করেছে গালে, বক্তব্যটা যাতে ঠিকমত কর্ণকুহরে গিয়ে পৌঁছায়।

কুঠারটা গিয়ে ঘ্যাচ করে মিলারের ঘাড়ের উপর গেঁথে যাবার পর দীর্ঘ একটা সময় শক্ত কাঠ, স্থির হয়ে ছিল রানা, দড়িটাকে মুঠোয় ধরে রেখে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল ও এই বুঝি কিনারা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল লাশটা, সাথে লোপেজকে নিয়ে। ছুরি চালিয়ে দড়ির কতটুকু ক্ষতি করেছে মিলার তাও তখনও জানতে পারেনি ও।

এরপর তুষারের আরও গভীরে আইস-অ্যাক্সটা ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল রানা। ওর উদ্দেশ্য ছিল নিজের শরীর থেকে দড়িটা খুলে আইস-অ্যাক্সের সাথে বাঁধবে। কিন্তু তুষারের পাতলা স্তরের নিচেই শক্ত জমাট বাঁধা বরফে এক হাত দিয়ে আইস-অ্যাক্সটাকে যথেষ্ট গভীরে ঢোকাতে পারল না ও।

বিকল্প উপায় খেলল মাথায়, টেনে বের করল আইস-অ্যাক্সটা। লোপেজ, এবং মিলারের ওজন টেনে কার্নিসের কিনারার দিকে নামাতে চেষ্টা করছে ওকে, শুধু পায়ের উপর ভর দিয়ে পিচ্ছিল বরফের উপর দাঁড়িয়ে রানা। পিছলে যাবার ভয়ে প্রথমে দুটো গর্ত করল আইস-অ্যাক্সটা দিয়ে। গর্ত দুটোয় পা তোলার সময় শরীরটা উঁচু হলো একটু, দড়িতে টান পড়ে নড়ে উঠল মিলারের লাশটা। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু হলো রানার···এখন যদি ছিঁড়ে যায় দড়িটা!

এরপর একটা বৃত্ত রেখা ধরে বরফ খুঁড়তে শুরু করল রানা। মাঝখানটা সমতল রেখে চারপাশের বরফ খুঁড়ে গোল একটা গভীর খাল কাটল ও, তারপর অতি সতর্কতার সাথে দড়িটা কোমর থেকে খুলে একটা ফাঁস তৈরি করল, বৃত্তের মধ্যবর্তী দ্বীপে পরিয়ে দিল সেটা।

কার্নিসের কিনারার দিকে যেতে এখন আর কোন বাধা নেই ওর, কিন্তু বরফে পা ঠুকে, আড়মোড়া ভেঙে শরীরের রক্ত চলাচলটা আবার শুরু করিয়ে নেবার জন্যে কিছুটা সময় দেরি করল ও। এতক্ষণ সাংঘাতিক বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল ও। কিনারার কাছে পৌঁছে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল জ্ঞান হারিয়েছে লোপেজ, মরা মানুষের মত ঝুলছে দড়ির শেষ প্রান্তে, মাথাটা চিবুকে ঠেকে আছে, দড়ির শেষ প্রান্তে শরীরটা দুলছে বাতাসে।

মিলার যেখানে ছুরি চালিয়েছিল সেখানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে দড়িটা। কোমর থেকে ছোট একটা দড়ি টেনে নিয়ে ছুরি চালানো জায়গাটার উপরে এবং নিচে দুটো গিঁট বাঁধল রানা। এরপর দড়ি ধরে তুলে আনল লোপেজের ভারী শরীরটা।

পতনের ফলে প্রচণ্ড ঝাঁকিতে বুক এবং বগলের নিচে চোট লেগেছে লোপেজের, মাংস কেটে ভিতরে এঁটে বসেছে দড়ি। পরীক্ষা করে দেখল রানা, চিড় ধরেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে বুকের হাড় ভাঙেনি। কিন্তু ডান বগলের নিচে নার্ভ সেন্টারটা সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে, বেঢপভাবে ফুলে উঠেছে জায়গাটা।

গরম কাপড়ে লোপেজকে ঢেকে তার মাথার কাছে বোকার মত বসে ছিল

রানা। পিঠে ঠেকে আছে বরফের উঁচু দেয়াল, সামনে কার্নিসের কিনারা, পায়ের কাছে অচেতন গাইড, মাথার উপর দেয়ালে জমে উঠেছে দুই তলা বাড়ির সমান উঁচু তুষারের স্তূপ, যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। চারদিকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে সাদা তুষার, দেয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসছে বাতাসের একটানা গর্জন। গ্লেসিয়ার বেয়ে আবার নেমে যাওয়া অসম্ভব। মৃত্যু-ফাঁদ পাতা অজেয় সামনের পথটাও চেনে না সে। গুটি গুটি পায়ে সামনে এগিয়ে আসছে রাত্রি।...কি করব এখন আমি? অদ্ভুত একটা আচ্ছন্নভাব ধীরে ধীরে গ্রাস করছে রানাকে, অসহায় বোধ ক্রমশ বাড়ছে, সেইসাথে একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ছে ও, ঝিমুচ্ছে, ঘোরের মধ্যে মাঝে মধ্যে ভাবছে, কি করব এখন আমি?

চোখ মেলল একবার রানা। একটু যেন নড়ে উঠল লোপেজের ঠোঁট দুটো। চমকে উঠে মাথাটা তুলল রানা। চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু ক্ষীণ একটা অস্ফুট শব্দ বেরোল ওর গলা থেকে, 'লোপেজ?'

আবার একটু নড়ে উঠল ঠোঁট দুটো লোপেজের। জ্ঞান ফিরে এসেছে তার। কিন্তু চোখ মেলার শক্তি নেই। কিছু বলতে চাইছে সে, কিন্তু শব্দ বেরুচ্ছে না।

সেই আচ্ছন্ন ভাবটা ফিরে এল আবার। চোখ দুটো বুজে গেল রানার। ঝিমুচ্ছে। বাতাসে দুলছে মাথাটা। ঢলে পড়ে যাচ্ছে শরীরটা। অচৈতন্যের অতল তলে দ্রুত নেমে যাচ্ছে রানা। ক্ষীণ একটু চেতনা এখনও রয়েছে ওর, বুঝতে পারছে এই শেষ, চিরঘুমের কোলে ঢলে পড়ছে সে—আপন মনে একটু হাসল, ক্ষোভ আর দুঃখের একটা ঢেউ বয়ে গেল মনের ভিতর...মারটা শেষ পর্যন্ত খেতে হচ্ছে প্রকৃতির কাছে, এবং অসহায় ভাবে...প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করল ও...ফাঁকা, শূন্য লাগছে ফেলে আসা জীবনটা, মনে পড়ছে না কারও কথা, একটা মুখও দেখতে পাচ্ছে না ও...বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠল এই ভেবে যে দুনিয়ার প্রত্যেকে একা, কেউ আসলে কারও নয়। এবং ঠিক তখনই এক জোড়া চোখ দেখতে পেল ও, কুঁচকে ওঠা কাঁচা-পাকা ভুরুর ভিতর থেকে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নিমেষে শিরদাঁড়া একটু খাড়া হয়ে উঠল রানার। চোখ মেলে তাকাল চারপাশে। দৃষ্টি ফিরে এল লোপেজের উপর। ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল তার। কিন্তু এবারও কোন শব্দ বের হলো না গলা থেকে। তবে কি বলতে চায় লোপেজ, তা যেন এবার নিজে থেকেই বুঝতে পারছে রানা। 'বাঁচার চেষ্টা করো,' এটা ছাড়া আর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না তার।

চিন্তাশক্তি তেমন জোরাল নয়, তবু ভাবতে চেষ্টা করছে রানা—কি করা যায় এখন? কট্টর বুড়ো তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে-কোন বিপদে হার মেনে নেয়া অপরাধ। যেমন করে হোক অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে ওকে। কিন্তু এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে কি করার আছে তার?

এই জায়গায় একটা নিরুপদ্রব রাতও কাউকে যদি কাটাতে হয়, সকাল পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সামনের রাতটা আসছে ভীষণ এক দুঃস্বপ্নের মত। বাতাসের বেগ বাড়লে বুড়োর চোখ রাঙানোকে তোয়াক্কা না করে নির্ঘাত ধসে পড়বে তুষারের স্তূপটা, জ্যান্ত বরফ চাপা পড়বে ওরা। একটা আশ্রয়

দরকার। কিন্তু আশ্রয় কোথায়?

দূর বোকা, নিজেকে তিরস্কার করল রানা। গোটা সমস্যাটাকে একসাথে না দেখে, ভাগ ভাগ করে দেখলেই তো উপায় বেরিয়ে যায়। আগের কথা আগে ভাব। সবচেয়ে আগে কি দরকার?

শক্তি, এবং অনুভূতি।

ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে শরীর। হাত-পা অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। কি করলে এই সমস্যার সমাধান হয়? রক্ত চলাচল শুরু হলেই অনুভূতি ফিরে আসবে।

আর সব সমস্যা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজে নেমে পড়ল রানা। অবশ হাত দিয়ে পায়ের পাতা, আঙুল, গোড়ালি, হাঁটু এপিঠ-ওপিঠ, উরু—নিয়ম করে ডলতে শুরু করল ও।

এক ঘণ্টা পর বেশ একটু শক্তি এবং অনুভূতি ফিরে পেল রানা। তবে কেন যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা। কি একটা জরুরী কাজ করা উচিত, কি করছে না সে— এই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে পরবর্তী সমস্যাটাকে নিয়ে পড়ল ও। চিন্তাশক্তি আগের চেয়ে অনেক জোরাল, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ওর ভিতর। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তে চাইছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, লড়াইয়ের কৌশলটাও ঠিক করে ফেলেছে সে।

সাবধানে ঢালু কার্নিসের কিনারার কাছে চলে এল রানা। লাশের মাথার পিছন থেকে বের করল ছোট কুঠারটা। পাতটা থেকে রক্ত আর হলুদ পদার্থ মুছে নিয়ে আবার ফিরে এল বরফের দেয়ালের কাছে।

সেই থেকে বরফের দেয়াল খুঁড়ছে রানা। সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এই কাজ আর কাউকে করতে দেখলে তাকে বদ্ধ পাগল ভাবত রানা।

ছোট্ট কুঠারটা দিয়ে বরফ খুঁড়ে একটা টানেল তৈরি করতে চাইছে ও।

রাত একটু বাড়তেই মাতামাতি শুরু হয়ে গেল বাতাসের। এখনও অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছে রানা। প্রথম দমকা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেল ও, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকাল চারদিকে। একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে কঠিন বরফ খুঁড়ছে ও। কুঠারটা ছোট এবং ভোঁতা, চুলোর জন্যে কাঠ চেরার উপযুক্ত, তাই এত খেটেও সুবিধে করতে পারেনি ও। যতটুকু খুঁড়েছে ও, ভিতরে কোন রকমে জায়গা হবে দু'জনের। উপায় কি, ভাবল ও, এর ভিতরই মাথা গুঁজতে হবে।

টেনে হিঁচড়ে গুহার পিছনের দেয়ালের কাছে নিয়ে এসে রাখল লোপেজকে রানা। তারপর বেরিয়ে গিয়ে সুটকেস তিনটে নিয়ে এল; গুহার প্রবেশ মুখে পাশাপাশি খাড়া ভাবে সাজিয়ে একটা পাঁচিল দাঁড় করাল। আর কিছু না হোক, গড়িয়ে আসা তুষার অন্তত বাধা পাবে এতে।

ব্যস, আর কিছু করার নেই আমার, ভাবল রানা। একটা আশ্রয় দরকার ছিল, তার ব্যবস্থা সে করেছে— অবশ্য এটাকে যদি আশ্রয় বলা যায়। যাই হোক, শেষ এইটুকুই করার ছিল তার—এরপর আর কিছু করার কথা ভাবতে পারছে না সে।

সেই আচ্ছন্ন ভাবটা আবার ফিরে আসছে। আবার চোখ রাঙাচ্ছে বুড়ো। কিন্তু ভ্রূকুটিতে কাজ হচ্ছে না আর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বাড়ি খাচ্ছে দু'সারি দাঁত। সাড়া

নেই হাত-পায়ে। একমাত্র লোপেজের জানা আছে পথটা, কিন্তু তার কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা, ভাবছে রানা—বৃথা? হ্যাঁ। সত্যিই কি? মাথা ঝাড়া দিয়ে ঝিমুনি ভাবটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল রানা। ঘোরের মধ্যে চিন্তা করছিল, হঠাৎ একটা ছেদ পড়েছে চিন্তায়। চোখ মেলে তাকাল ও। লোপেজের ঠোঁট জোড়া আবার নড়ছে।

কি বলতে চাইছে লোপেজ? মাথাটা নামিয়ে ওর ঠোঁটে কান ছোঁয়াল রানা। উঁহুঁ, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। অসাড় হয়ে গেছে লোপেজের পেশীগুলো। হঠাৎ আরেকটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মনটা এই জন্যে খুঁত খুঁত করছিল, বুঝতে পারল সে। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে এসেছে লোপেজের, আবার তা শুরু হলেই চোখ মেলতে পারবে, কথা বলতে পারবে, উঠে বসতে পারবে। এবং লোপেজ যদি সুস্থ হয়ে ওঠে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে…ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে যেন রানা।

প্রথমে নিজের হাত-পা আচ্ছামত ডলে নিল ও। তারপর কাপড় চোপড় সব খুলে নিল লোপেজের; শুরু করল ম্যাসেজ।

অমানুষিক খাটছে রানা। প্রায় এক ঘন্টা পর ব্যথায় গোঙাতে শুরু করল লোপেজ। কিন্তু থামল না রানা, নির্মম ভাবে ডলে যাচ্ছে সে নগ্ন শরীরটা। খানিক পর ছটফট করতে শুরু করল লোপেজ। যন্ত্রণায় চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার। ফুলে উঠেছে গলার রগগুলো, কাতর কণ্ঠে চিৎকার করছে সে, মাফ চাইছে।

বরফ হয়ে ওঠার আগেই কপাল থেকে হাত দিয়ে মুছে নিচ্ছে রানা ঘামের ফোঁটাগুলো। পকেট হাতড়ে দুটো কোকা বিস্কিট বের করল ও। নিজের মুখে পুরল একটা, অপরটা লোপেজকে দিল, 'নাও, চিবাও এটা।'

চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে লোপেজ। তার মুখে চাপড় মারল রানা। 'এ্যাই, ঘুমাবে না। কোকা চিবাও।' একটা হাত দিয়ে তার মুখটাকে ফাঁক করে ধরল রানা, বিস্কিটটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল লোপেজের শ্বাস প্রশ্বাস। আবার চোখ মেলল ও। বিস্কিটটা চিবাচ্ছে সে। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে।

'এবার?' ঝিমুনি ভাবটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে একটু হাসল রানাও।

'অনেকক্ষণ থেকে বলতে চেষ্টা করছিলাম তোমাকে…'

'কি?'

'ম্যাসেজ করে আমাকে সুস্থ করে তোলো,' বলল লোপেজ। 'শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই যে কথাটা মনে এসেছে তোমার, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ।'

'এখন কি হবে? এখান থেকে বেরিয়ে গিরিপথে পৌছুতে পারব আমরা?'

দুর্বল একটু হাসল লোপেজ। 'আমার আশা ছেড়ে দাও। পারবে কি পারবে না, সব এখন নির্ভর করছে তোমার নিজের ওপর।'

'প্রলাপ বকছ তুমি।'

বাঁ হাত তুলে ডান হাতটা দেখাল লোপেজ। 'না। আমার এই হাতটা গেছে, রানা। বগলের নিচে থেকে আঙুল পর্যন্ত কোন সাড়া পাচ্ছি না।' উদ্বেগ আর আতঙ্ক

ফুটে উঠল লোপেজের চোখে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানা। বলল, 'বগলের নিচেটা ফুলে আছে, দেখেছি। কখন থেকে অসাড় লাগছে?'

'জ্ঞান ফেরার পর থেকেই।'

'এত ম্যাসেজ করলাম। একটুও ব্যথা পাওনি?'

বিস্মিত হলো লোপেজ। 'তাই নাকি, ম্যাসেজ করেছ? জানতেই পারিনি।'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। নিরাশায় ছেয়ে গেল মনটা। এবং এর সাথে সাথে আবার আচ্ছন্ন ভাবটা গ্রাস করে ফেলল ওকে।

'রানা!' বাঁ হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মারল ওকে লোপেজ। 'চোখ খোলো, আমার দিকে তাকাও।'

অনেক চেষ্টা করে চোখ খুলল রানা। 'কিছু বলছ?'

'ম্যাসেজ দরকার তোমার,' দ্রুত বলল লোপেজ। 'এক হাত দিয়ে যতটা পারি···শোনো, নিরাশ হবার কিছু নেই। এখনও আশা আছে আমাদের। বিশ্বাস করো, তোমার ওপরই নির্ভর করছে এখন সব। তুমি রুখে দাঁড়ালে প্রকৃতিকে হারিয়ে দেব আমরা, জানি আমি।'

'আমি! আমি কি করব?' বিদ্রূপের সুরে একটু হাসল রানা।

'কি করতে হবে সব আমি বলে দেব,' উঠে বসে বলল লোপেজ। রানার শরীরটা ডলতে শুরু করল এক হাত দিয়ে। 'শুধু হাতটা নয়, বুকেও প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি আমি—ওখানেও কোন সাড়া নেই। বোধহয় ফেটে গেছে দু'একটা পাঁজর। তা নইলে তোমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপাতাম না। শোনো, আমার কথামত যদি প্রতিটি কাজ করতে পারো,' ব্যাকুলতা ফুটে উঠল লোপেজের চেহারায়, 'এ যাত্রা হয়তো বেঁচে যাব আমরা।'

'তাই নাকি!' ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে আছে লোপেজের দিকে রানা, হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ওর মুখটা। 'লাগছে, ছেড়ে দাও—প্লীজ, লোপেজ!'

মিনতি বা প্রতিবাদে কান দিল না লোপেজ। আরও দশ মিনিট পর, রানার চোখের কোণে পানি বেরিয়ে এসেছে দেখে ক্ষান্ত হলো লোপেজ, 'উঠে বসো। বের করো স্টোভটা। আগুন জ্বালো।' কি করতে হবে বলে দিচ্ছে সে।

অসাড় হয়ে যাওয়া আঙুল দিয়ে সুটকেসটা খুলে স্টোভ বের করা এবং আগুন জ্বালা—এইটুকু কাজে একটা ঘণ্টা লাগল রানার। সংকোচের প্রতিক্রিয়া কী ভয়ঙ্কর, বোঝা যাচ্ছে না এখন। ম্যাসেজ করার একটু পরই আবার থেমে যাচ্ছে রক্ত চলাচল, গোটা শরীর অনুভব শক্তি হারিয়ে ফেলছে। স্টোভটা জ্বলছে বটে, কিন্তু আলো এবং উত্তাপের পরিমাণ খুবই কম—তবে একেবারে অচল হয়ে পড়েনি ওরা এটুকু প্রমাণ করছে আগুনটা। আত্মবিশ্বাস একটু বাড়ল রানার। লোপেজের কথায় এখন আর সে বিদ্রূপ করে হাসছে না।

কয়েকটা পেরেক বরফে গাঁথতে বলল লোপেজ। চাদরের ফালি দিয়ে পর্দা তৈরি করে স্টোভটাকে ঘিরে ফেলা হলো। ভাগ্যগুণে বাতাসটা আসছে পিছন থেকে বরফের দেয়ালের মাথার উপর দিয়ে, তাই অপেক্ষাকৃত অনুকূল আশ্রয় বলা

যায় গুহাটাকে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড দমকা বাতাস ছুটে এসে ঢুকে পড়ছে গুহার ভিতর, সাথে করে আনছে তুষারের মেঘ। নুয়ে পড়ছে আগুনের শিখাগুলো।

'বাতাসের লক্ষণ ভাল নয়,' গম্ভীর দেখল লোপেজকে রানা। 'দেয়ালের ওপর জমে ওঠা তুষারের স্তূপ কতক্ষণ সহ্য করবে বাতাসের এই চাপ? তাছাড়া, কাল সকালে আবার যখন রওনা হব আমরা, এই বাতাসকে ঠেলেই পাহাড়ে চড়তে হবে আমাদেরকে।'

'সকালের মধ্যে বাতাসটা দিক বদলাতেও পারে।'

'প্রার্থনা করো তাই যেন হয়,' বলল লোপেজ। 'এবার স্টোভে একটা ক্যান চাপাও। বরফ গলাবার চেষ্টা করো। পেটে গরম কিছু পড়া দরকার আমাদের।'

দুই ক্যান পানি তৈরি করতে এক ঘণ্টার উপর লেগে গেল রানার।

'না,' আবার রানা ঝিমুচ্ছে দেখে দ্রুত বলল লোপেজ। 'ঘুমাবে না।'

চোখ মেলে তাকাল রানা। বলল, 'তবে এসো কথা বলি, একজন আরেকজনকে জাগিয়ে রাখি।' মাথাটা একটু তুলে কান পেতে বাতাসের গর্জন শুনল ও। 'কথা বলতে হলে গলা ছেড়ে চিৎকার করতে হবে—ভালই হবে সেটা। কি কথা বলব আমরা?'

পাগড়িটা নেড়েচেড়ে কান দুটো ঢেকে নিয়ে বলল লোপেজ, 'রবিন আমাকে বলেছে তুমি নাকি স্যাবর জেট চালাবার ট্রেনিং নিয়েছ। এয়ারফোর্সে ছিলে বুঝি?'

শুরু হলো কথাবার্তা। এক যুগ ধরে কথা বলার পর জানতে চাইল রানা, 'ক'টা বাজে?'

রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে তুলে কিছুক্ষণ পর বলল লোপেজ, 'দশটার কিছু বেশি।'

শিউরে উঠল রানা। 'সূর্য উঠতে আরও নয় ঘণ্টা!'

কড় মড় করে ভেঙে ওর হাড়ের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে যেন শীত। সরু গুহার ভিতর ইস্পাতের বর্শার মত ঢুকছে বাতাস, পোশাক ভেদ করে, এমন কি রবিনের দেয়া লেদার জ্যাকেটটা ভেদ করে বিদ্ধ করছে ওকে। কাল সকালে ওরা বেঁচে থাকবে কিনা ভাবছে ও। সভ্যতার আরও কাছে এবং বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থায়ও খোলা জায়গায় রাত কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে এবং পড়েছে ও।

'না,' আবোল তাবোল চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ো না,' রানার মনের কথা যেন গড় গড় করে পড়তে পারছে লোপেজ। 'আমার সুটকেসে চামড়ার দুটো ব্যাগ আছে, বের করো। একটা আমাকে দাও, একটা তুমি নাও। পা দুটো ব্যাগে ভরে রাখলে ঠাণ্ডা থেকে কিছুটা বাঁচবে।'

রানার অসাড় আঙুলগুলো একহাতে ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনল লোপেজ। সুটকেস খুলে চামড়ার ব্যাগ দুটো বের বরল রানা।

'তুমি না বলেছিলে এখানে একবার এসেছ এর আগে?' জানতে চাইল রানা।

'এর চেয়ে অনেক অনুকূল পরিবেশে,' বলল লোপেজ। 'অনেক বছর আগের কথা, তখন আমি ছাত্র। এই শৃঙ্গ জয় করার একটা অভিযান ছিল সেটা—এখান

থেকে আমাদের ডান দিকের শৃঙ্গটা।'

'অভিযান সফল হয়েছিল?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লোপেজ। 'তিনবার চেষ্টা করেছিল ওরা। খুব সাহসী একদল ফ্রেঞ্চ ছিল ওরা। তৃতীয়বার মারা যায় দলের একজন, তারপরেই হাল ছেড়ে দেয় ওরা।'

'ওদের সাথে তুমি ভিড়লে কিভাবে?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল রানা।

বাঁ কাঁধটা একটু ঝাঁকাল লোপেজ। 'ছাত্রদের অভাবের কথা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার—পোর্টারদেরকে ভাল পারিশ্রমিক দিত ওরা। তাছাড়া, মেডিকেলের একজন ছাত্র হিসেবে সরোচ সম্পর্কে আগ্রহ ছিল আমার। তবে, হ্যাঁ—প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, ছিল বটে ওদের সাথে। ভেড়ার পশম লাগানো আন্ডার-বুট, ক্র্যাম্পন লাগানো মোটা চামড়ার ওভার-বুট, পাখির পালক ভর্তি জ্যাকেট, শক্ত তাঁবু, নাইলনের লম্বা দড়ি—এবং ইস্পাতের বড় বড় পিটন পাথরে রেখে হাতুড়ি দিয়ে যত খুশি ঠোকো, বাঁকবে না একচুল।' দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে লোপেজের। রানার মনে হলো, ক্ষুধার্ত একজন লোক কোন্ কালে একবার অঢেল কোর্মা-পোলাও খেয়েছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করছে।

'গিরিপথটা পেরোতে পেরেছিলে তোমরা?'

'ওদিক থেকে,' বলল লোপেজ। 'ওটা অনেক সহজ পথ। ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে এদিকটা দেখে আঁতকে উঠেছিলাম, খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে এদিক থেকে চড়তে চেষ্টা করিনি আমরা। গিরিপথের মাথার দিকে একটা ক্যাম্প ছিল আমাদের—ক্যাম্প থ্রী। খুব ধীর গতিতে উঠেছিলাম আমরা, প্রতিটি ক্যাম্পে কয়েকদিন বিরতি নিয়েছিলাম।'

'পাহাড়ে চড়ার অদ্ভুত একটা নেশা আছে কিছু লোকের,' বলল রানা। 'এক আধটু আমারও ছিল। কিন্তু সে নেশা আজ ঘুচে গেছে আমার। জানি না এখান থেকে ফিরতে পারব কিনা, যদি পারি, জীবনে কখনও আর পাহাড়ে ধারে কাছে ঘেঁষব না আমি।'

'ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রী দলের ওরা সবাই জিওলজিস্ট ছিল,' বলল লোপেজ। 'শখ করে পাহাড়ে চড়তে আসেনি ওরা। চারদিক থেকে অনেক পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। পরে প্যারিস থেকে ছাপা ওদের একটা ম্যাপ দেখেছিলাম আমি—পরে জেনেছিলাম এদিকে ওরা বেশ কয়েকটা মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছিল।'

'পেয়েই বা কি লাভ! এত উঁচুতে উঠে কাজ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'এখন হয়তো সম্ভব নয়,' বলল লোপেজ। 'কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো—কে জানে?'

সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কথা বলার পরও ঘড়ির কাঁটাকে বিশেষ নড়তে না দেখে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে গান গাইতে শুরু করে দিল রানা। প্রথমে একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করল ও, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার···,' তারপর লোপেজের

বোঝার সুবিধের জন্যে একটা ইংরেজি গান ধরল ও।

রানা থামতে খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল লোপেজ। তারপর রানাকে ভীষণ ভাবে চমকে দিয়ে শুরু করল সে, 'দুরোগম গেরি কান-তার মোরু দুসতরো পারাবার হে-ই…'

উচ্চারণে অনেক ভুল, কিন্তু গোটা কবিতাটা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে কোথাও আটকাল না সে। অদ্ভুত, অদ্ভুত স্মরণশক্তি তো লোকটার। ভাবল রানা।

তারপর একটা স্থানীয় গান গেয়ে শোনাল লোপেজ। সে থামতেই বাঁ দিক থেকে বজ্রপাতের মত বিকট একটা সংঘর্ষের আওয়াজ হলো, মুহূর্তের জন্যে বাতাসের একটানা গর্জন পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল সেই শব্দে।

চমকে উঠল রানা। 'কিসের শব্দ?'

'তুষার-স্তূপ ধসে পড়ছে,' দ্রুত বলল লোপেজ। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। বরফের দেয়াল অনুসরণ করে গুহার ছাদে গিয়ে স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'এসো, প্রার্থনা করি, এদিকের স্তূপটা যেন ধসে না পড়ে—তাহলে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে আমাদের।'

'ক'টা বাজে?'

'মাঝরাত।'

'তোমার হাতের কি অবস্থা?'

'স্মরণ করিয়ে দিলে বলে মনে পড়ছে আরও একটা হাত আছে আমার,' গম্ভীর হয়ে বলল লোপেজ। 'বেঁচে যদি যাই-ও, হাতটা বোধহয় হারাতে হবে আমাকে, রানা।'

'বুক…পাঁজরের কি অবস্থা?'

'কিছুই অনুভব করছি না,' বলল লোপেজ। 'লক্ষণ খারাপ। রানা, কাপড়ের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বুকটা যতটা জোরে পারো ঘষে দাও আমার।'

আধঘণ্টা পর যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল লোপেজ, আবার সে ব্যথাটা অনুভব করছে বুকে।

রাত দুটোর ঠিক পরপরই গুহার উপরের তুষার স্তূপ ধসে পড়ল। রানা এবং লোপেজ, দুজনেই ভয়ঙ্কর আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শরীরের ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে রক্ত, স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তুষারের বিশাল স্তূপে চিড় ধরার কড় কড় শব্দ কানে ঢুকতেই একটু নড়ে উঠল লোপেজ, তারপরই ঢলে পড়ল পিছন দিকে। পরমুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। দু'জনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিচ্ছে কেউ যেন। গুহার দেয়ালে ঠকাঠক ঠুকে যাচ্ছে ওদের মাথা। ধসে পড়ছে জমে ওঠা তুষার। শুকনো পাউডারের মত গুড়ো বরফের একটা মেঘ হুড়মুড় করে ঢুকছে গুহার ভিতর। খক খক করে কাশতে শুরু করল ওরা, নাক এবং গলার ভিতর ছুরি চালাচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, যেন আগুন ধরে গেছে নাকের ফুটো আর কণ্ঠনালীর ভিতর।

বিস্ফোরণের শব্দে হুঁশ ফিরে পেয়েছে লোপেজ। একটা হাত দিয়ে যুঝছে সে। তুষারের ঢেউ ক্রমশ ঢেকে ফেলছে ওকে। পা বেয়ে হাঁটু, সেখান থেকে পেট, তারপর বুক পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল ওর। সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে নাড়ছে সে হাতটাকে। চিৎকার করে বলল, 'নিজের চারপাশের জায়গা খালি রাখার চেষ্টা

করো!’

গোঙানির একটা শব্দ বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে, দুর্বলভাবে এদিক সেদিক হাত দুটো নাড়ল, কিন্তু ঝপ করে শরীরের দু’পাশে আবার পড়ে গেল হাত। ভাগ্য ভাল, ওদের কাঁধ পর্যন্ত উঠে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তুষারের ঢেউ। একটানা অনেকক্ষণ ধরে ভরাট গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মত অনেকদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল গুরু গুরু আওয়াজ; তারপর অকস্মাৎ অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করল ওরা। একটানা কানের পর্দা কাঁপানো আওয়াজে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওদের কান, যে সেটা কখন থেমে গেছে টেরই পায়নি। নিস্তব্ধতা তাই প্রচণ্ড উচ্চকিত লাগছে ওদের কাছে, নাড়া দিয়ে যাচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয়কে।

‘কি ঘটল বুঝতে পারছ কিছু?’ বিড় বিড় করে জানতে চাইল রানা। কিসে যেন আটকে গেছে হাত দুটো ওর, টেনেও ছাড়াতে পারছে না। আতঙ্কে ছটফট করে উঠল ও, শরীরটাকে মোচড় দিয়ে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

‘এই, স্থির হও—নড়ো না!’ চেঁচিয়ে উঠল লোপেজ। ছোট্ট, বন্ধ জায়গাটায় অস্বাভাবিক গম গম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

আস্তে আস্তে নড়ছে লোপেজ। অনুভব করছে ওর চারপাশের তুষার খসখসে, জমাট বাঁধা নয়। বাঁ হাতটাকে টেনে তুষারের নিচে থেকে তুলে আনতে পারল ও। মুখের সামনে থেকে তুষার তুলে গুহার দেয়ালে সেগুলো চেপে ধরছে। নিজেকে মুক্ত করতে খুব বেশি সময় নিল না লোপেজ। তারপর রানাকে মুক্ত করল ও।

পকেট হাতড়ে দিয়াশলাই খুঁজছে লোপেজ। চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে রানা।

ভিজে দিয়াশলাইটা কোন কাজে এল না। ‘তোমার কাছে একটা লাইটার আছে না?’

‘আছে,’ বলল রানা; কিন্তু সেটা বের করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে, উত্তর দিয়েই যেন খালাস, চোখ বুজে ঢুলছে সে আবার।

‘লাইটারটা বের করো, রানা,’ কনুই দিয়ে গুঁতো মারল লোপেজ।

যন্ত্রের মত নির্দেশ পালন করছে রানা। পকেট হাতড়ে লাইটারটা বের করল ও। মুঠোটা মেলে ধরল।

‘উঁহুঁ,’ বলল লোপেজ। ‘তোমাকেই জ্বালতে হবে ওটা।’ রানাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চাইছে সে, কাজের মধ্যে থাকলে ঝিমুনি ভাবটা সুবিধে করতে পারবে না।

বিনা প্রতিবাদে লাইটারটা জ্বালল রানা। চোখ ধাঁধানো আগুনের শিখা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নিজের চারদিকে তাকাল লোপেজ। আগুনের শিখাটা একটুও কাঁপছে না দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। বরফে চাপা পড়ে গেছে তারা।

সামনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোপেজ। গুহার প্রবেশ মুখটা ছিল ওখানে। জমাট বাঁধা কঠিন বরফের নিশ্ছিদ্র দেয়াল দেখা যাচ্ছে সেখানে এখন।

‘রানা!’ রানার কানে মুখ ঠেকিয়ে চিৎকার করে ডাকল লোপেজ।

‘চেঁচিয়ো না।’

‘শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কি বলেছিলাম, মনে আছে তোমার?’

'ধ্যেৎ!' ঢুলছে রানা। বিড় বিড় করছে।

'তোমার ওপর নির্ভর করছে সব,' রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে যত জোরে সম্ভব চিৎকার করছে লোপেজ। 'বরফের নিচে চাপা পড়ে গেছি আমরা! শুনতে পাচ্ছ? তুমি যদি কিছু না করো, দম আটকে মারা যাব আমরা।'

'ঠিক আছে,' নিস্তেজ গলায় বলল রানা, যেন মরতে একটুও আপত্তি নেই ওর।

এভাবে হবে না, বুঝতে পেরে কি করা উচিত দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে লোপেজ। ছোট কুঠারটা খুঁজে বের করতে হবে। বরফ খুঁড়ে ভাঙতে হবে কংক্রিটের মত শক্ত দেয়ালটাকে। কতটুকু ভাঙতে হবে, জানা নেই ওর। গুহা মুখ থেকে কার্নিসের কিনারা পর্যন্ত যদি খোঁড়ার প্রয়োজন হয়, অমানুষিক পরিশ্রমের ব্যাপার হবে সেটা। একটি মাত্র হাত দিয়ে তার দ্বারা সম্ভব নয় এ কাজ।

'রানা!' বরফে অসাড় আঙুল ছড়িয়ে হাতড়াচ্ছে লোপেজ। 'শুনতে পাচ্ছ?'

ছোটখাট এটা সেটা জিনিস ঠেকছে লোপেজের হাতে। একধারে সরিয়ে রাখছে সে সব। প্রতিটি জিনিস এখন ওদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করবে। কুঠার পেয়ে পুলক অনুভব করল সে। এই জিনিসটাই এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছে ওদেরকে, ভবিষ্যতেও এর সাহায্যে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে ওদেরকে।

নিঃশব্দে কখন যেন ঢলে পড়ে গেছে রানা। একটা লাশের মত বেঢপ ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে সে দেয়াল ঘেঁষে। ওর গালে চাপড় মারতে শুরু করল লোপেজ।

অস্ফুটে বলল রানা, 'কেন কষ্ট দিচ্ছ?'

খানিকপর রানার শরীর ডলতে শুরু করল লোপেজ। সেই সাথে একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে সে। 'চোখ খোলো, ইউ ব্লাডি ফুল! সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে! রানা, লক্ষ্মী ভাই আমার, ওঠো।'

ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে···লাগছে···'

ছাড়ল না লোপেজ। 'চোখ মেলো।'

চোখ খুলল রানা। 'চেঁচাচ্ছিলে কেন?' উঠে বসতে চেষ্টা করল ও।

উঠে বসতে সাহায্য করল ওকে লোপেজ। বিপদের কথাটা ব্যাখ্যা করার জন্যে মুখ খুলতেই তাকে বাধা দিল রানা, বলল, 'জানি, কি করতে হবে এখন তাই বলো। জলদি।'

'দেয়াল ভেঙে পথ তৈরি করে বেরোতে হবে এখান থেকে···'

দ্রুত জানতে চাইল রানা, 'কুঠারটা কোথায়?'

'এই যে।'

কুঠারটা নিয়ে তুষারে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। সামনের বরফের দেয়ালটা ভাঙতে শুরু করল। তুষার জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেলেও পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠেনি এখনও, দেয়ালের গায়ে দ্রুত একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলছে রানা। কিন্তু ওপারে বেরুবার জন্যে সুড়ঙ্গটাকে কত লম্বা করতে হবে, বুঝতে পারছে না ও। তুষার যদি কার্নিসের কিনারা পর্যন্ত জায়গা দখল করে নিয়ে থাকে? সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে দেখা যাবে ঝপ্ করে নেমে গেছে বরফের খাড়া গা কয়েকশো ফিট

নিচে।

চিন্তাটাকে দূর করে দিয়ে সুড়ঙ্গটাকে আরও লম্বা করতে শুরু করল রানা। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা বরফের টুকরোগুলোকে এক হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিচ্ছে লোপেজ, উঁচু করে রাখছে একধারে, সেদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এভাবে বেশিক্ষণ চললে এই জঞ্জাল রাখার জায়গা হবে না।'

হাঁপাচ্ছে রানা। ঘামছে। সেই ঘাম বরফ হয়ে যাচ্ছে বগলের নিচে, মুখ ভর্তি চুলের ডগায়, কপালে। জবাব দিল না ও। আলো নিভিয়ে অনুভূতি এবং স্পর্শের সাহায্য নিয়ে কাজ করছে অন্ধকারে।

গর্তের ভিতর ঢুকে পড়েছে রানা। কাঁধের কাছে তুলছে কুঠারটা, গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে আঘাত করছে বরফের ধারে। এখনও সে ধসে পড়া তুষারের অপর দিকে পৌঁছাতে পারেনি। হঠাৎ সে কুঠারটা একপাশে নামিয়ে রেখে বলল, 'আইস-অ্যাক্স।'

রানার হাতে আইস-অ্যাক্সটা ধরিয়ে দিল লোপেজ। রানা সেটাকে শক্ত করে ধরে বরফের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ঢুকিয়ে দিল। ছোট কুঠারের হাতলটা লম্বা, সুড়ঙ্গের ভিতর সেটা নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না। তাই আইস-অ্যাক্সটা দিয়ে চাপ দিচ্ছে ও, শুধু পেশীর জোরে বরফের ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করছে সেটাকে। হঠাৎ হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল সামনে কুঠার ধরা হাতটা; গর্ত থেকে বেরিয়ে গেছে আইস-অ্যাক্স। হিম বাতাস যেন ঝিরঝিরে স্বর্গীয় শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল রানার শরীরে। এখন বুঝতে পারছে ও, কি রকম গুমোট আর ভারী হয়ে ছিল গুহার ভিতরের পরিবেশটা। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে একপাশে কাত হয়ে লোপেজের গায়ের উপর পড়ে গেল ও। বুকটা ঘন ঘন উঠছে আর পড়ছে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল লোপেজ ওকে, গড়িয়ে সরে গেল রানা।

একটু পর লোপেজ গর্তের বাইরে থেকে মাথাটাকে টেনে নিয়ে বলল, 'দুই মিটার জায়গায় তুষার পড়েছে। বেরিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না আমি,' বলল রানা।

খানিক চিন্তাভাবনা করল লোপেজ। তারপর বলল, 'কিন্তু এই জায়গাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। বাতাসের ধাক্কা খেতে হচ্ছে না, ঠাণ্ডাও কম। বাইরে এর চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। আমাদেরকে শুধু গর্তের মুখটা পরিষ্কার রাখতে হবে। আরেকটা তুষার ধসেরও সম্ভাবনা নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এ ব্যাপারে তুমিই ওস্তাদ।'

প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে রানা, ঘামের ধারা কাপড়ের নিচে বরফ হয়ে যাচ্ছে এখন। পোশাক খুলতে রানাকে সাহায্য করল লোপেজ। তারপর এক হাত দিয়েই রানার সম্পূর্ণ শরীর ডলতে শুরু করল সে।

আবার পোশাক পরে জানতে চাইল রানা, 'তোমার অবস্থা কি?'

'হাতটার আশা ছেড়ে দিয়েছি,' বলল লোপেজ। 'ধরে নিয়েছি ওটা নেই। বুকে আর পাঁজরে ব্যথাটা অনুভব করছি এখনও।'

'তুষার স্তূপটা ধসে গিয়ে ভালই হয়েছে,' বলল রানা। 'তা নাহলে এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকতাম আমরা।'

'এবং জানতেও পারতাম না কখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি।' বলল লোপেজ। 'দ্বিতীয়বার তা আর ঘটতে দেয়া চলবে না, রানা। আচ্ছন্ন ভাবটাকে যেভাবে হোক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। সকাল হতে তিন ঘণ্টা বাকি আর—এসো কথা বলি আর গান ধরি।'

আনন্দ নয়, প্রাণের দায়ে গান ধরল ওরা।

পাঁচ

ভোর হতে আধঘণ্টা বাকি, গর্তের মুখটাকে কেটে বড় করতে শুরু করল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে একটানা তীব্র বাতাসের স্রোতের মুখে পড়ল ওরা। পায়ের নিচে এবং চারধারে শুধু তুষার আর তুষার, কখনও জলোচ্ছ্বাসের মত লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, কখনও ঢেউ-এর মত ফুলে উঠছে চাপ খেয়ে, কখনও ঝাঁক ঝাঁক পাখির মত হঠাৎ ডানা মেলছে শূন্যে। সম্পূর্ণ অচেনা একটা জগৎ! চারদিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। দিনের আলো ফুটেছে ইতিমধ্যে, অথচ দশ গজের ওপারে দৃষ্টি চলে না। বাতাস যেন শরীর ফুটো করে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'তোমার বুকের ব্যথা কেমন অনুভব করছ?' হাতের কথাটা জিজ্ঞেস করে লোপেজকে আর বিরক্ত করতে চাইছে না রানা।

অতি দুঃখেও একটু হাসল লোপেজ। 'আসলে তুমি হাতের কথা জানতে চাইছ, তাই না? অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, রানা। ওটা আছে বলে মনেই হচ্ছে না। বুকের ব্যথাটা টের পাচ্ছি এখনও।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদল করল সে। 'একটা কথা মনে গেঁথে নাও, রানা। গিরিপথে আজই পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। হয় আজ, না হয় কোনদিনই নয়। আরেকটা রাত এই পাহাড়ে বাঁচতে পারব না আমরা।'

বুকে আঙুল ঠুকে হাসল রানা, বলল, 'মাসুদ রানা, অ্যাট ইওর সার্ভিস। শুধু বলো কি করতে হবে আমাকে।'

উপর দিকে তাকাল লোপেজ। 'দেয়ালের ওপরটা দেখছ, আবার একটা তুষার স্তূপ তৈরি হচ্ছে। তবে এখনও বিপজ্জনক কিছু নয়। দেয়ালটা এখানেই টপকাতে পারব আমরা। তুমি ছোট কুঠারটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে ধাপ তৈরি করো।'

কুঠারটা নিয়ে বরফের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বরফ খুঁড়ে পা রাখার জন্যে খোপ তৈরি করতে শুরু করল ও।

গুহায় ঢুকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে সুটকেসে ভরে নিচ্ছে লোপেজ। কিছু জিনিস হারিয়ে গেছে তুষারের নিচে, কিছু অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে দিল সে। অভিযানের এই শেষ পর্যায়ে একান্ত প্রয়োজনে লাগবে যেগুলো শুধু সেগুলো ভরল সুটকেসে। আইস-অ্যাক্স দিয়ে খোঁচা মেরে বরফের প্লাস্টার ভাঙল সে সুটকেসগুলোর গা থেকে।

পনেরো ফিট উঁচু দেয়াল। যতটা উঁচুতে হাত গেল ততদূর পর্যন্ত ধাপ তৈরি

করল রানা, তারপর খানিকটা উপরে উঠে পিটনের সাথে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আবার বরফে গর্ত করতে শুরু করল। লোপেজের কথা মনে রেখে প্রতিটি খোপ যথেষ্ট গভীর এবং প্রশস্ত করে তৈরি করছে ও। ঝাড়া এক ঘণ্টা লাগল কাজটা শেষ করতে। সন্তুষ্ট বোধ করল ও, ভাবল, ধাপ বেয়ে উঠে যেতে কোন অসুবিধেই হবে না লোপেজের।

দড়ি টেনে সুটকেসগুলো উপরে তুলে নিল রানা। এরপর উঠতে শুরু করল লোপেজ। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়েছে সে। অপর প্রান্তটা টান করে ধরে আছে রানা, কিন্তু তবু উঠতে শুরু করে জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে মনে হলো এটাকে তার। রানা যেভাবে কেটেছে খোপগুলো, স্বাভাবিক অবস্থায় কারও কোনরকম সাহায্য ছাড়াই দৌড়ে উঠে যেতে পারত সে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক নয়। ডান হাতটার কাছ থেকে কোন সাহায্য তো পাওয়া যাচ্ছেই না, শরীরের পাশে মরা সাপের মত ঝুলে থেকে সেটা বরং অস্বস্তি এবং অসুবিধেই সৃষ্টি করছে। দস্তানা পরা হাতের আঙুলগুলো নগ্ন বরফে পুড়ছে, হাতটা মাথার উপর তুলতেই টান পড়ছে বুকে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে তার চোখমুখ। অসম্ভব ক্লান্ত আর দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে উঠল লোপেজ, হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানার পায়ের কাছে।

বাতাস এখানে তীব্র ঝড়ের বেগে সগর্জনে নেমে আসছে গিরিপথ থেকে, বয়ে নিয়ে আসছে পাউডারের মত তুষার কণার বিশাল সব মেঘগুলোকে। পাগড়ির চূড়া থেকে বুটের ডগা পর্যন্ত ধবধবে সাদা হয়ে গেছে রানা। নিরবচ্ছিন্ন বাতাসের আর্তনাদ কানের জন্যে মহা একটা অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। লোপেজের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, যতটুকু সম্ভব বাতাসের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে তাকে ও। দু'হাত দিয়ে ধরে লোপেজকে উঠে বসতে সাহায্য করল। 'কি করব এখন? কোন্‌দিকে এগোব? নাকি এখানেই থাকতে চাও?'

'বাঁচার ইচ্ছা এখনও অনুভব করতে পারছি,' চোখ মেলে একটু হাসতে চেষ্টা করল লোপেজ। ঠোঁটের নিচে জমে ওঠা বরফের পাতে চিড় ধরল, হাত দিয়ে ঘষা দিয়ে সেটাকে ফেলে দিল সে। 'বাকি পথটা তেমন কঠিন নয়, রানা। ঢাল বেয়ে উঠে যেতে হবে শুধু মাথায়, তারপর নেমে চলে যাব ওপারে।' এইটুকু কথা বলার পরিশ্রমেই সাংঘাতিকভাবে হাঁপাতে শুরু করল সে। 'অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, রানা। পথের নির্দেশটা বলছি, মনে গেঁথে নাও।'

একটা কোকা বিস্কিট দিল লোপেজকে রানা। বলল, 'চিবাও।' লোপেজের কোমরের দড়িটা পরীক্ষা করল ও, তারপর দুটো সুটকেস দু'হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করার চেষ্টা করল। সুটকেস দুটো খুলে সব জিনিস একটা সুটকেসে ভরল, সেটা ঝুলিয়ে নিল নিজের কাঁধে। তীব্র প্রতিবাদ করতে চাইছে লোপেজ, কিন্তু গলায় জোর পাচ্ছে না সে। খালি সুটকেসটাকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল বাতাস, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা ওদের পিছনের বিক্ষুব্ধ ঝড়ের ভিতর।

বাতাসের সাথে ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াল লোপেজ, রানার পিছনে অনুসরণ করতে শুরু করল। কাঁধ এবং মাথাসহ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে আছে

পায়ের দিকে, মুখটাকে বাতাসের চাপ থেকে রক্ষার চেষ্টা করছে। চাদরের হুডটা দিয়ে মুখের নিচের অংশ মুড়ে নিয়েছে সে, কিন্তু চোখ দুটোকে বাঁচাবার কোন উপায় করতে পারেনি। লাল হয়ে ফুলে উঠেছে চোখের চারপাশ। নিজের অজান্তে একবার মাথাটা উঁচু করতেই মুখের ভিতর সরাসরি বাড়ি মারল বাতাস, দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হলো, কেউ যেন তার সোলার প্লেক্সাসে ঘুষি মেরেছে। দ্রুত মাথা নামিয়ে হাঁপাতে শুরু করল সে।

খুব বেশি খাড়া নয় ঢালটা। মনে মনে একটা হিসেব কষতে চেষ্টা করছে লোপেজ। এক হাজার ফিট আরও উপরে উঠতে হবে ওদেরকে, এবং ধরা যাক ঢালটা উঠে গেছে ত্রিশ ডিগ্রী···কিন্তু জ্যামিতির সূত্র চর্চা করার মত ধৈর্য এবং সচেতনতা নেই তার, সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল সাথে সাথে।

নিপুণ ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় রয়েছে তার প্রতিটি অঙ্গ চালনার মধ্যে। প্রতিটি গর্ত গভীর করে খুঁড়ছে সে, তার আগে সামনের জায়গাটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে আইস-অ্যাক্স দিয়ে। বাতাসের ধারাল নখর ক্ষতবিক্ষত করছে ওকে। মাথা নামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আছে ও, নিঃশব্দে লড়ে চলেছে। সামনে দশ গজের বেশি দৃষ্টি চলে না, তবে পাহাড়ের পাশের এই ঢালটাই ওদেরকে গিরিপথের উপরে নিয়ে যাবে বলে মোটামুটি নিশ্চিত একটা ধারণা করছে সে। অভিযানের এই শেষ অংশটা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেনি লোপেজ ওকে। উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে অনেক বছর আগে কি দেখেছে আজ আর তার খুঁটিনাটি মনে নেই।

আরও দ্রুত উঠে যেতে পারে রানা, কিন্তু লোপেজ ওকে পিছু টেনে রেখেছে। লোপেজের জন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর। অসমসাহসী একজন লোক, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি ওকে হারিয়ে দিয়েছে। ডান হাতটা ফিরে পাচ্ছে না সে। শেষবার ঝাড়া এক ঘণ্টা ম্যাসেজ করেও সাড়া ফিরিয়ে আনতে পারেনি ও। রক্ত চলাচল একেবারেই থেমে গেছে। ফ্রস্ট-বাইট শুরু হয়ে গেছে আঙুলে। তার বুকের ব্যথাটাও ভীতিকর। শুধু যদি মাংস থেঁতলে গিয়ে থাকে; তাহলে তেমন কিছু নয়। কিন্তু পাঁজরে যদি চিড় ধরে থাকে, এই ঠাণ্ডায় তার পরিণতি জঘন্য কিছু না হয়ে পারে না। হঠাৎ নিজের ভুলটা ধরতে পারল রানা। প্রতিশোধটা প্রকৃতি নেয়নি, লোপেজ আহত হবার জন্যে দায়ী মিলার। নিজেকে অপরাধী মনে হলো রানার। মিলারকে এই অভিযানে সাথে আনতে চায়নি লোপেজ। যুক্তি দেখিয়ে ও-ই রাজী করিয়েছিল তাকে।

এক ঘণ্টা পর একটু নরম এলাকায় পৌঁছুল ওরা। ঢালটা এখানে প্রায় সমতল। তুষারের ঢেউগুলো ছুটে এই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। যত এগোচ্ছে ওরা, তত বেশি গভীরে ঢুকে যাচ্ছে ওদের পা। মাথা তুলে উপর দিকে তাকাল রানা, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখছে। তুষার ঝড়ের উদ্দাম ঘুরপাক ঘিরে রেখেছে ওদেরকে, দূরে দৃষ্টি চলে না, কিছুই নেই দেখার। লোপেজ কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এখানে অপেক্ষা করো। খানিকদূর এগিয়ে দেখে আসি আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝপ্ করে বসে পড়ল লোপেজ। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে পায়ের উপর বসে সেজদার ভঙ্গিতে তুষারে কপাল ঠেকাল। কোমর থেকে দড়িটা

খুলে লোপেজের পাশে রাখল রানা, তারপর সামনে এগোল। কিছুটা এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ও। দেখল সমতল তুষারের উপর গভীর একসার গর্ত সৃষ্টি করেছে তার পদক্ষেপগুলো, ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার সামনে এগোতে শুরু করল ও। পায়ের তৈরি গর্ত অনুসরণ করে লোপেজের কাছে ফিরে আসতে কোন অসুবিধে হবে না।

আরেকটা কোকা বিস্কিট মুখে পুরে ধীরে ধীরে চিবাচ্ছে লোপেজ। বাঁ হাতের আঙুলগুলো অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে, তাই দস্তানাটা খুলে ফেলল সে, চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল সেগুলো। মুখের ভিতরটা ছাড়া শরীরের আর সব জায়গা, এমন কি হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে তার। সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। অনেক আগেই থেমে গেছে ঘড়ির কাঁটা দুটো। বরফের দেয়াল টপকাবার পর কতক্ষণ ধরে কতটা এগিয়েছে ওরা, জানার কোন উপায় নেই। ঠাণ্ডায় শরীরের সাথে সাথে মনটাও অবশ হয়ে গেছে তার। মনে হচ্ছে একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা এগিয়েছে ওরা, অথবা মাত্র মিনিট কয়েক আগে রওনা হয়েছে। কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এই রকম একটা ভাব জাগছে তার মনে। উপলব্ধি করছে, এই ঠাণ্ডা আর নিষ্প্রাণ পাহাড়ে চিরকাল হাঁটার শাস্তি দেয়া হয়েছে তাকে।

কোকার প্রতিক্রিয়া শুরু হতে উঠে দাঁড়াল লোপেজ। রানা যেদিকে গেছে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল সেদিকে। বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে দম আটকে এল তার, দ্রুত বাঁ হাতটা তুলে চোখ আর নাক ঢাকল সে। অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করছে আঙুলের উল্টো পিঠ সবুজ হয়ে গেছে, উড়ন্ত তুষারে ধারাল কণা লেগে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে চামড়া, মাংসের ভিতর পর্যন্ত কেটে রক্ত বের করে এনেছে কয়েক জায়গায়।

রানার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তলপেটে আতঙ্কের একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো। বাতাসের দিকে পিছন ফিরল সে। ভাবছে, রানা যদি তাকে খুঁজে না পায়—কি হবে? প্রশ্নটা নিয়ে মাথা বেশি ঘামাবার চেষ্টা করল না সে। কোকার প্রতিক্রিয়ায় চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে তার। ধীরে ধীরে আবার বসল সে তুষারের উপর। কিন্তু এবার বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল তাকে বাতাস। ফিরে এসে এই অবস্থায় দেখতে পেল তাকে রানা।

কাঁধে রানার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠল লোপেজ। 'মুভ, ম্যান!' তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চেঁচাচ্ছে রানা। 'এভাবে পড়ে থাকলে ফ্রিজড্ হয়ে যাবে তুমি।'

টেনে টুনে লোপেজকে বসাল রানা। 'বাঁ হাতটা দাও, ম্যাসেজ করে দিই।' ম্যাসেজ শুরু করল রানা, কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছে না লোপেজ। সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে আঙুলগুলো।

আধ ঘণ্টা পর ব্যথা বোধ করল লোপেজ। 'আর কষ্ট দিয়ো না,' মিনতির সুরে বলল সে।

দস্তানাটা হাতে পরিয়ে দিল রানা, বলল, 'নাক, কপাল আর কান দুটো ডলো এবার।' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার। 'দুশো মিটার পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি। তুষার ওদিকে কোমর পর্যন্ত গভীর, সামনে আরও বেশি। ও-পথে

যেতে পারব না আমরা। ঘুরে যেতে হবে।'

নিরাশার একটা ঢেউ জাগল লোপেজের শরীরে। এর কি শেষ নেই? টলতে টলতে নিজের পায়ে দাঁড়াল সে, রানা দড়ি বাঁধা শেষ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ওকে অনুসরণ করে তির্যক ভাবে ডান দিকে এগোল। বাতাসের ধাক্কা লাগছে এখন পাশ থেকে, ঢালের উপর লম্বালম্বি ভাবে এগোচ্ছে ওরা। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে শরীরের ভার চাপিয়ে তীব্র বাতাসে কিছুটা হেলান দিয়ে থাকতে হচ্ছে ওদেরকে।

ঝুরঝুরে নরম তুষারের গভীর এলাকাগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে রানা। বারবার নিচের দিকে নেমে যেতে হচ্ছে ওকে; খারাপ হয়ে যাচ্ছে মনটা। অবশেষে এক জায়গায় এসে দেখল ঢালটা ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করেছে, এবং বরফের উপর তুষারের স্তর এখানে তেমন গভীর নয়। আবার ওরা বাতাসের প্রচণ্ড স্রোতের মুখোমুখি হলো।

প্রায় অচেতন অবস্থায়, ঘোরের মধ্যে রয়েছে লোপেজ। প্রচুর সময় নিয়ে একটা পায়ের সামনে আরেকটা পা ফেলছে সে। মাঝে মধ্যে সাবধানে মাথা তুলছে, সামনে সাদা তুষারে ঢাকা অস্পষ্ট একটা চলমান মূর্তি দেখে চিনতে পারছে রানাকে। খানিকপর দুনিয়ার আর সব কিছু বেমালুম ভুলে গেল সে। একটাই কাজ তার, সেটাই সে করে যাচ্ছে, রানাকে নজরবন্দী রেখে দড়িটা ঢিল দিয়ে রাখতে হবে। হুমড়ি খেয়ে অনেকবার পড়ে গেল সে। দড়িতে টান অনুভব করে প্রতিবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। লোপেজ আবার উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে সে। তারপর আবার উঠছে। শুধু উপরে উঠছে।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল—দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল লোপেজ। আইস-অ্যাক্সটা তুলে উপর দিকটা তাকে দেখাল রানা। হতাশার সুরে বলল, 'পাথর—আবার আমরা পাথরের ওপর চলে এসেছি।' চকচকে পিচ্ছিল বরফের পাতলা প্লাস্টার মোড়া পিঠ-উঁচু পাথরে খোঁচা মারল আইস-অ্যাক্স দিয়ে। অসংখ্য চিড় ধরে ফেটে গেল প্লাস্টারটা। নগ্ন পাথরে আবার আঘাত করল ও। পাথরের কালচে ছাল খসে ছড়িয়ে পড়ল সাদা তুষারের উপর। 'পচা, ভঙ্গুর পাথর—সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

অচল মাথাটাকে খাটাতে চেষ্টা করছে লোপেজ। 'অনুমান করতে পারো, কতদূর এর বিস্তার?'

'কে জানে, অনুমান করা সম্ভব নয়,' বলল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাতাসের দিকে পিছন ফিরল ও। ওকে অনুকরণ করল লোপেজও। 'এই পাথর বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়,' আবার বলল রানা। 'গ্লেসিয়ারের ওপারে এই ধরনের পাথরের ওপর দিয়ে আসার সময় শক্তি ছিল আমাদের, ওখানে তুষার ঝড়ের কবলেও পড়িনি আমরা। এখানে সে-চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।' হাত দুটো প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের সাথে ঘষছে রানা।

'বিচ্ছিন্ন একটা পাথুরে এলাকা হতে পারে এটা,' বলল লোপেজ। 'বেশি দূর তো আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা।'

ঝুঁকে পড়ে আইস-অ্যাক্সটা তুলে নিল রানা। 'এখানে দাঁড়াও। দেখে আসি।'

আবার লোপেজকে রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে রানা।

বাতাসের হুঙ্কারকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে বরফের গায়ে আইস-অ্যাক্স গাঁথার শব্দ, তুষার ঝড়ে মোড়া পেট-উঁচু পাথরের অদৃশ্য মাথা থেকে সাদা তুষারে ছিটকে এসে পড়ছে বরফ আর পাথরের টুকরো, দেখতে পাচ্ছে লোপেজ। রানা টানছে বুঝতে পেরে দড়ি ছাড়তে শুরু করল সে। বাতাসের ক্রমাগত ধাক্কায় ঢিল হয়ে গেল হুডের বাঁধন, মুখে বাতাসের প্রচণ্ড চড় খেলো সে। একহাত দিয়ে হুডটাকে ধরতে যাচ্ছে, এমনি সময় পড়ল রানা। অস্পষ্ট একটা চিৎকার শুনল লোপেজ, মুখ তুলে তাকাল। উপরে তুষার ঝড়ের নারকীয় তাণ্ডব চলেছে; সেখান থেকে বেঢপ একটা মূর্তি দ্রুতবেগে গড়িয়ে নেমে আসছে তার দিকে। খপ্ করে দড়িটা ধরল সে, ঘুরল, ঝপ্ করে হাঁটু গেড়ে বসল ঝাঁকিটা সামলে নেবার জন্যে। অদম্য পতন রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রানা, প্রথমে ডিগবাজি, তারপর ড্রপ খেতে খেতে লোপেজের পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে। দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়তে হড়কে একহাত এগিয়ে গেল লোপেজ।

দড়ি টান করে ধরে আছে লোপেজ। গড়িয়ে ঢালের আরও নিচে রানা নেমে যাবে না বুঝতে পেরে ঢিল দিল সে দড়িতে। রানাকে নড়তে দেখছে সে। গড়ান দিয়ে উঠে বসল ও, দু'হাত দিয়ে বাঁ পা-টা ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল। পিছন দিকে বেঁকে গেছে পিঠটা ওর, আকাশের দিকে মুখ তুলে অসহ্য ব্যথাটা সহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'কি হয়েছে, রানা?' চেঁচিয়ে উঠল লোপেজ। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে তার। রানা যদি পা ভেঙে থাকে, আর কোন আশা নেই। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও কপালে ঘাম দেখা দিল তার। দ্রুত নেমে যাচ্ছে সে রানার দিকে।

মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল রানা। লোপেজ দেখল, ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির প্রতিটি রোঁয়ার ডগায় বসে রয়েছে একটা করে বরফের বিন্দু। দু'বার চেষ্টা করে কথা বলতে ব্যর্থ হলো রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি দুটো। পিঠটা মোচড় খাচ্ছে ওর। 'পা…পা-টা ভেঙে গেছে আমার!' ওর কণ্ঠে করুণ চাপা কান্নার মত সুর।

ছ্যাঁৎ করে উঠল লোপেজের বুকটা। কাতরাচ্ছে রানা, ওর দিকে বোকার মত কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। রানার বাঁ পা-টা ধরে ধীরে ধীরে টেনে লম্বা করতে শুরু করল। চোখ বুজে ছটফট করছে রানা, দুই চোখের কোণে বেরিয়ে আসা পানির ফোঁটা দুটো বরফ হয়ে যাচ্ছে।

পা ঢাকা ট্রাউজারটা ছিঁড়ে গেছে। ওর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত টিপে টিপে পরীক্ষা করল লোপেজ। রক্ত লেগে চটচট করছে তার আঙুলগুলো। রানার যন্ত্রণা কাতর মুখের উপর আনন্দে পাগলের মত হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সে। মাতালের মত মাথা দোলাচ্ছে সে। 'ভাঙেনি, রানা! তোমার পা ভাঙেনি—শুধু মাংস উড়ে গেছে খানিকটা।'

মুহূর্তের জন্যে পায়ে একটুও ব্যথা অনুভব করল না রানা। 'সত্যি? ঠিক…?'

উত্তর না দিয়ে পাগলের মত হাসছেই লোপেজ। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই বুঝতে পেরে রানাও যোগ দিল তার সাথে। বিচিত্র এক বরফের জগতে তুষার

ঝড়ের মাঝখানে বসে হাসতে হাসতে চোখে পানি বের করে ফেলল ওরা।

ছয়

'ওই পাথর বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব,' ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বলল রানা। 'ভাল আবহাওয়াতেও কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

'কতদূর গেছে পাথরটা?'

'যতদূর দৃষ্টি চলে। বেশিদূর নয় হয়তো, কিন্তু দূরত্ব যাই হোক, পেরোনো যাবে না। ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে, লোপেজ, আরেক দিক থেকে চেষ্টা করতে হবে।'

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মাংসের ভিতর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে লোপেজ, চিনচিনে একটা অনুভূতি ছাড়া কোন ব্যথা বোধ হচ্ছে না তার। একটু পর বলল, 'অসম্ভব, রানা। এই আবহাওয়ায় আবার গ্লেসিয়ারের ভিতর দিয়ে যাওয়া···নাহ্! তার চেয়ে গিরিপথে ওঠার আশা ছেড়ে দেয়া ভাল।'

'গ্লেসিয়ারের এপারেই হয়তো কোন পথ পেয়ে যেতে পারি,' বলল রানা। মাথা ঘুরিয়ে পাথরটার উপর চোখ রাখল ও, যেটা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়েছে। 'একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই—ওটা টপকানো অসম্ভব।'

'তোমার ক্ষতটা বাঁধতে হবে,' বলল লোপেজ। 'ছেঁড়া মাংসে ফ্রস্ট-বাইট শুরু হলে পা-টা হারাতে হবে তোমাকে। সুটকেসটা খুলতে সাহায্য করো আমাকে।'

সুটকেস খুলে চাদর বের করা হলো। দু'জন মিলে অনেক কষ্টে ছিঁড়ল সেটাকে, একটা লম্বা ফালি দিয়ে ট্রাউজার সহ ক্ষতটা পেঁচিয়ে বাঁধা হলো।

'বোঝা হালকা করো, রানা,' বলল লোপেজ। 'স্টোভটা রাখো। খানিকটা প্যারাফিন নাও। আর কিছু দরকার নেই আমাদের। গ্লেসিয়ার পর্যন্ত যদি ফিরে যেতে হয়, এতকিছু বহন করার শক্তি থাকবে না আমাদের। স্টোভটা নিতে বলছি এইজন্যে যে কোথাও যদি বরফের একটা দেয়াল পাই সেখানে স্টোভটা জ্বেলে গরম পানি খাবার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।'

প্যারাফিনের বোতলটা পকেটে ভরে নিল রানা। ইলেকট্রিকের তারের সাথে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল স্টোভটা। হঠাৎ পাগলের মত হাতড়াতে শুরু করল লোপেজ, চারদিকে তুষার ছড়িয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছে সে। 'আইস-অ্যাক্সটা কোথায়!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। 'রানা—কোথায় সেটা?'

'তাই তো! দেখছি না কোথাও···'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল ওদের দৃষ্টি ঝাপসা, ধূসর অন্ধকারে, যেখানে উন্মত্ত আক্রোশে ঘুরপাক খাচ্ছে তুষার-ঝড়। তলপেটে একটা শূন্যতা অনুভব করল লোপেজ। আইস-অ্যাক্সটার অমূল্য অবদান পরিমাপ করা সম্ভব নয়, ওটা ছাড়া এ পর্যন্ত আসতে পারত না ওরা। এবং ওটা ছাড়া, ভাবছে লোপেজ, গিরিপথে

পৌঁছানো ওদের কারও পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। মুখ নামিয়ে বাঁ হাতটার দিকে তাকাল সে, থরথর করে কাঁপছে সেটা, চেষ্টা করেও কাঁপুনিটা থামাতে পারছে না। অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তার, বুঝতে পারছে সে। শরীর এবং মন দুটোই তাদের আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু রানা অন্য রকম ভাবছে। 'কিছু এসে যায় না, লোপেজ,' বলল ও। 'এই বজ্জাত পাহাড় আমাদেরকে খুন করার কম চেষ্টা করেছে? এখনও পারেনি, তাই না? এতদূর যখন আসতে পেরেছি, বাকিটাও উতরে যেতে পারব—এ বিশ্বাস আমার আছে। আর তো মাত্র পাঁচশো ফিটের ব্যাপার—শুনতে পাচ্ছ, মাত্র পাঁচশো ফিট!'

কিন্তু আশার কোন আলো দেখছে না লোপেজ। 'তোমার ওপরই ভরসা করেছিলাম আমি, রানা। কিন্তু পায়ে চোট খেয়েছ তুমি। পারবে? সিনসিয়ারলি বলছি, জানি না! হ্যাঁ, মাত্র পাঁচশো ফিট—কিন্তু তার আগে আবার আমাদেরকে নিচে নামতে হবে, রানা।'

'তাতে কি? আমাদের নেমে যাওয়াটাও তো ওপরে ওঠার একটা রাস্তা, তাই না?'

আত্মবিশ্বাস ভাল জিনিস, ভাবছে লোপেজ, কিন্তু কোন কোন সময় তা হাস্যকর এবং বোকামির লক্ষণও প্রকাশ করে—এখন যেমন করছে।

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং উন্মত্ত আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে আবার রানা। জানে লাভ নেই, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে অনুসরণ করে যাচ্ছে লোপেজ।

যে পথ দিয়ে এসেছে ওরা, সেটাকে অনুসরণ করে ফিরে যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না রানার। কিন্তু ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে সামনের পদচিহ্নগুলো—একবার যদি পথ হারায় ও, ভাবছে রানা, এই ঝড়ের মধ্যে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনও। যেখানে পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিয়েছিল ওরা সেখানে পথ-চিহ্ন এতই অস্পষ্ট যে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো রানা। টলতে টলতে ওর পাশে এসে থামল লোপেজ।

'তোমার পায়ের কি অবস্থা?'

'ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে, টের পাচ্ছি না কিছু,' বলল রানা। 'কাঠের মত শক্ত লাগছে শুধু। তোমার কি অবস্থা?'

'বলতে পারছি না,' বিড় বিড় করে বলল লোপেজ। 'কিছুই অনুভব করছি না আমি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি কেন? ফিরে যাবার শখ মিটে গেছে তোমার?'

হাসতে গিয়ে নাকের দু'পাশে টান টান একটা ভাব অনুভব করল রানা। বলল, 'আমি চাই দড়ি নেড়ে পিছন থেকে গাইড করো আমাকে তুমি। একবার টানলে বাঁ দিকে যাব, দু'বার টানলে ডান দিকে যাব। পারবে?'

'করার যখন কিছুই থাকে না তখন বোধহয় সব পারা যায়।'

'গুড,' বলল রানা। আবার এগোতে শুরু করল ও।

এদিকের তুষারে কোন গর্ত নেই, তাই এগোনো একটা কঠিন কাজ। আইস-অ্যাক্সটা নেই যে সেটা দিয়ে পরীক্ষা করে নেবে সামনে তুষার ঢাকা কোন চিড় বা

ফাটল আছে কি না। ঝুঁকি নিয়ে এগোচ্ছে ও, এছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আবার যদি পেরোতে হয় গ্লেসিয়ারটা, ভাবছে ও, চিড় বা ফাটলের ফাঁক এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। এগোবার কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারটা ছাড়া মানসিক দিক থেকে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে ও। শারীরিক এবং মানসিক, দু'দিক থেকেই ভেঙে পড়েছে লোপেজ, তার এই কাহিল অবস্থা দেখে একটা দায়িত্ব বোধ সওয়ার হয়েছে ওর কাঁধে। এবং নেতৃত্ব দিতে হবে জেনে আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে মাথাটা, সেটাকে খাটাতেও কসুর করছে না রানা।

মনে হচ্ছে ঝড়ের তাণ্ডব আগের চেয়ে একটু যেন কম। রানা আশা করল, এবার বোধ হয় থেমে যাবে। কিন্তু তার কোন দৃষ্টিগোচর লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। গ্লেসিয়ারের কিনারায় পৌঁছে অসংখ্য বরফের স্তম্ভ দেখতে পেল ওরা। ভেতর ভেতর নৈরাশ্যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল রানা। উপরে ওঠার কোন পথ পায়নি ওরা।

তুষারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোপেজ। বন্ধ চোখের পাতা কুঁচকে উঠল তার, দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে নেমে এল নাকের দু'পাশ দিয়ে। 'এখন?' জানতে চাইল সে। কিন্তু কোন উত্তর সে আশা করছে না রানার কাছ থেকে। জানে, দেবার মত কোন উত্তর নেই।

লোপেজের পাশে ধপ্ করে পড়ল রানা। আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে হাঁপাচ্ছে। শক্ত কাঠ হয়ে ওঠা পা-টা ওর সামনে নিঃসাড় পড়ে আছে। 'আশ্রয়ের খোঁজে গ্লেসিয়ারের খানিকটা ভিতরে যাব আমরা। ভিতর দিকে বাতাস এতটা জোরাল হবে না।' রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল ও, তারপর হাত তুলে কানে ঠেকাল সেটাকে। 'দুটো বাজে—সন্ধ্যা হতে এখনও চার ঘণ্টা। অপচয় করার মত সময় নেই আমাদের হাতে, কিন্তু তবু পানি গরম করার জন্যে কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে—অন্তত গরম একটু পানি না খেলেই নয়।'

'এখন মাত্র দুপুর!' বিড় বিড় করে বলল লোপেজ। 'অথচ ভাবছিলাম শত শত বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বরফের পাহাড়ের।'

ঝড়ের ধাক্কায় গোড়া থেকে সটান পড়ে গেছে অসংখ্য বরফের স্তম্ভ, একটার গায়ে একটা পড়ে শত সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। শুধু বড় বড় খণ্ডগুলোকে পাশ কাটিয়ে আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে এগোচ্ছে রানা। লুকিয়ে থাকা ফাটল আর চিড়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। দু'বার ঝপ্ করে কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল ও তুষারের নিচে। একটা হাত দিয়ে যতটা পারল সাহায্য করল দুর্বল লোপেজ, প্রায় একার চেষ্টাতে দু'বারই উঠে পড়ল রানা। শেষ পর্যন্ত যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। মাথা সমান উঁচু একটা অর্ধবৃত্তের মত পাঁচিল; মোটামুটি একটা ত্রিকোণ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাতাস থেকে রেহাই পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল ওদের। অসাড় আঙুল দিয়ে স্টোভটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে সেটায় আগুন ধরাতে এক যুগ সময় লেগে গেল রানার। গরম পানি খেয়ে ঢেকুর তুলল রানা, অনুভব করল পেট থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উষ্ণতা। অদ্ভুত পরিতৃপ্ত মনে হলো নিজেকে ওর।

'এখান থেকে গিরিপথটা কত উঁচু হবে?'

ঝিমুনি ভাবটা ছুটে গেল লোপেজের। 'সাতশো ফিট, সম্ভবত।'
'হ্যাঁ, ফিরে আসার পথে আমরা বোধহয় দুশো ফিটের মত নিচে নেমেছি।' একটা হাই তুলল রানা। জ্যাকেটটা টেনে আরও ভালভাবে জড়িয়ে নিল গায়ে, আধবোজা চোখে তাকাল লোপেজের দিকে।
ফাঁকা, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে নৃত্যরত আগুনের শিখার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে লোপেজ। ক্লান্তিতে নিচে নেমে আসছে চোখের পাতা।
এইভাবে বরফের আশ্রয়ে শুয়ে থাকল ওরা, ওদের চারদিকে হুঙ্কার ছেড়ে দাপাদাপি করছে তুষার ঝড়। থামার কোন লক্ষণ নেই।

দুঃস্বপ্ন দেখছে রানা।
অন্ধকার একটা খাদ। বিছানাসহ নেমে যাচ্ছে সে। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল ওর। বুঝতে পারছে। খাদের তলায় পৌঁছুলেই মারা যাবে সে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ও। বালিশের নিচে থেকে একটা ছুরি টেনে নিয়ে বিছানাটাকে আঘাত করছে ও। কিন্তু তবু পতন রোধ হচ্ছে না, দ্রুত গতিতে নেমেই যাচ্ছে বিছানাটা। তোষকের কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে সাদা পালক, ওর চোখের সামনে পাক খেতে খেতে উড়ছে সেগুলো। আর্তচিৎকার করে উঠে চোখ মেলল রানা। দেখল স্বপ্নের মধ্যে সাদা পালক মনে করছিল যেগুলোকে সেগুলো আসলে তুষারের কণা, বাতাসে ভর করে ওর চোখের সামনে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। আরও দূরে দৃষ্টি চলে গেল ওর। সামনে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ারের বিশাল গম্ভীর দুর্গম ব্যাপ্তি। আশ্চর্য, বরফের উপর শুয়ে রয়েছে ও অথচ একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না ওর। আবার চোখ জোড়া জুড়িয়ে আসতে চাইছে ঘুমে। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি অনুভব করছে ও—কিন্তু বুঝতে পারছে আবার যদি ঘুমায় ও, সে-ঘুম আর কখনও ভাঙবে না।
পরিবেশে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু কি সেটা, তা বুঝতে পারছে না ও। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করল, থেমে গেছে তুষাড় ঝড়। সটান উঠে বসল ও। মুখ তুলল আকাশের দিকে। বিশাল মেঘের অসংখ্য বাহিনী দুদ্দাড় দৌড়ে পালাচ্ছে···মেঘ নয়, কুয়াশা ওগুলো, বুঝতে পারছে ও। এখানে সেখানে নিমেষের জন্যে দেখা যাচ্ছে খুদে এক আধ ফালি ম্লান নীলচে আকাশ।
ঘাড় ফিরিয়ে লোপেজের দিকে তাকাল ও। মাথা পড়ে আছে কাত হয়ে একধারে, মুখটা বরফের উপর চেপে বসে আছে। বোধহয় বেঁচে নেই সে। গড়ান দিয়ে কাছে চলে এল রানা। মাথা নামিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল ভাল করে। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। মাথায় হাত দিয়ে নাড়া দিল ও। এমনভাবে দোল খেল সেটা, রানার মনে হলো ঘাড় ভেঙে গেছে লোপেজের। 'অ্যাই, লোপেজ, ওঠো,' শুকনো, খসখসে আওয়াজ বেরিয়ে এল ওর গলার ভিতর থেকে। 'ওঠো, উঠে পড়ো···ওঠো···' কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে তাকে ও।
নড়ছে না লোপেজ। মারা গেছে? বুঝতে পারছে না রানা। শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। নাকের সামনে অসাড় আঙুল রেখে কিছুই টের পাচ্ছে না ও। পালস দেখার জন্যে হাতটা ধরল।
পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে মাত্র একবার সন্দেহ হলো রানার ঠাণ্ডা চামড়ার নিচে

শিরাটা বোধহয় এখনও থির থির করছে। বেঁচে আছে লোপেজ, কিন্তু মৃত্যুর দুয়ার থেকে বড়জোর এক পা দূরে রয়েছে সে।

প্যারাফিন শেষ হয়ে যাওয়ায় নিভে গেছে স্টোভটা। বোতলে সামান্য একটু প্যারাফিন পেল রানা, শেষ ফোঁটাটা পর্যন্ত ঢালল ও, তারপর জ্বালল স্টোভ, খানিকটা পানি গরম করে লোপেজের মাথাটা ধুয়ে দিল। আশা করছে উত্তাপ পেয়ে কোনভাবে যদি লোপেজের মাথার অসাড় অবস্থাটা কেটে যায়। পর পর দু'বার মাথায় গরম পানি পড়তে দুর্বলভাবে নড়ে উঠল লোপেজ, অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

দ্বিগুণ উৎসাহে লোপেজের মুখে চাপড় মারছে রানা। 'উঠে পড়ো এবার। এতটা এসে হাল ছেড়ে দিতে পারো না! ওঠো।' দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে টেনে তুলল লোপেজকে ও, কিন্তু ছেড়ে দিতেই হুড়মুড় করে আবার পড়ে গেল সে। আবার তাকে টেনে তুলল রানা, এবং শরীরের ঠেক দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। 'হাঁটতে হবে তোমাকে। ঘুমালে চলবে না।' পকেট হাতড়ে সর্বশেষ কোকা বিস্কিটটা বের করে আনল ও, ঠেলে সেটা ঢুকিয়ে দিল লোপেজের মুখের ভিতর। 'চিবাও,' তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে বলল রানা। 'চিবাও, আর হাঁটো।'

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে লোপেজ, কিন্তু পুরোপুরি সচেতনতা ফিরল না তার। তবে ঘোরের মধ্যেও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ভঙ্গিতে পা দুটোকে নাড়তে পারছে সে। রক্ত চলাচল আবার শুরু করাবার জন্যে তাকে ধরে বারবার সামনে-পিছনে হাঁটাতে শুরু করল রানা। সেইসাথে কথা বলে যাচ্ছে ও। লোপেজকে কিছু বোঝাতে চাইছে তা নয়। বাতাস থেমে যাওয়ায় কবরের যে নিস্তব্ধতা নেমেছে সেটাকে ভাঙার জন্যে। 'সন্ধ্যা হতে দু'ঘণ্টা বাকি। তার আগে গিরিপথে পৌছুতে হবে আমাদেরকে! তার অনেক আগে। এবার স্থির হয়ে দাঁড়াও, বেঁধে নিই দড়িটা।'

বাধ্য ছেলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোপেজ, মৃদু একটু দুলছে শুধু। তার কোমরের চারদিকে পেঁচিয়ে দড়িটা বেঁধে দিল রানা। 'আমাকে অনুসরণ করবে তুমি। পারবে? পারবে আমাকে অনুসরণ করতে?'

মাথাটা একটু কাত করল লোপেজ। চোখ দুটো আধবোজা হয়ে আছে।

'গুড,' বলল রানা। 'তাহলে এসো।'

গ্লেসিয়ার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, এগোচ্ছে পাহাড়ের ঢালটার দিকে। কুয়াশা-মুক্ত পরিবেশ, গিরিপথের মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। দূরত্ব মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক গজ। নিচে অখণ্ড একটা সাদা মেঘের সাগর শেষ বিকেলের চোখ ধাঁধানো কিরণ লেগে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে বেশ শক্ত হবে, পা ফেলে হেঁটে যাওয়া সম্ভব।

সামনের বরফ মোড়া ঢালটার দিকে তাকাল রানা, তুষার ঝড়ে আড়াল হয়ে থাকায় যা দেখতে পায়নি হঠাৎ এখন তা চাক্ষুষ করে পুলক অনুভব করল ও। বরফ মোড়া পাথরের একটা লম্বা প্যাসেজ সরাসরি সোজা উঠে গেছে গিরিপথের দিকে। আশা করল ও, প্যাসেজে তুষারের গভীরতা খুব বেশি হবে না, এবং উঠে যেতেও বিশেষ বেগ পোহাতে হবে না। দড়ি ধরে সেদিকে এগোল ও। লোপেজের অবস্থা

বোঝার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার।

এই ঠাণ্ডা নরকে কেন তাকে আবার নিয়ে এল রানা? ভাবছে লোপেজ। গরমের মধ্যে কি আরামে ঘুম দিচ্ছিল সে, মেরে ধরে ঘুম থেকে জাগিয়ে এই ঠাণ্ডা পাহাড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কি মানে থাকতে পারে! লোকটা পাগল, নাকি শয়তান ভর করেছে ওর কাঁধে? তাকে সাথে নিয়ে এই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন সে? কেন? অনেক চেষ্টা করেও কারণটা স্মরণ করতে পারছে না লোপেজ। আবছাভাবে শুধু মনে পড়ছে একটা কার্নিস থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল সে, ঝুলছিল দড়ির শেষ মাথায়⋯সেই অবস্থা থেকে তার প্রাণ রক্ষা করেছে এই লোকটা। যথেষ্ট, তাই না? ভাবছে সে।⋯লোকটার উদ্দেশ্য ছাই পাঁশ যাই হোক, একে বিশ্বাস করা যেতে পারে। কেউ যদি একবার তোমার প্রাণ বাঁচায়, পরে এক-আধটু বেগার খাটিয়ে নেবে সে তোমাকে দিয়ে⋯এই-ই নিয়ম। এতে মনে করার কিছু নেই। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম থেকেই এই লোকটার সাথে আছে সে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত এর সাথেই থাকা উচিত তার।

এই ভেবে অনুসরণ করে চলেছে রানাকে লোপেজ। জানে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে।

রানার আহত পা-টা যেন রাবারের তৈরি, অনুভূতিহীন। সামনেটা চোখে দেখে নিয়ে পা-টা ফেলতে হচ্ছে। বেখেয়াল বশত দেখে নিতে ভুল করলেই উঁচু কোথাও ধাক্কা খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠছে সেটা—ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে রানা। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে লোপেজও। বারবার দড়ির শেষ প্রান্তে ফিরে এসে তাকে টেনে তুলে দু'পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে রানা। আহত পা-টা যথেষ্ট দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওকে, তার চেয়ে বেশি দেরি করিয়ে দিচ্ছে লোপেজ। তবে মন্থর গতিতে হলেও এগোচ্ছে ওরা, এবং গিরিপথটা ক্রমশ কাছে আরও কাছে চলে আসছে। উঠতে যখন আর মাত্র দুশো ফিট বাকি, এই সময় শেষবারের মত হাঁটু ভেঙে পড়ল লোপেজ। দড়ি গুটিয়ে নিয়ে ফিরে আসছে তার দিকে রানা, কিন্তু নড়ছে না লোপেজ। ঠাণ্ডা এবং অসম্ভব ক্লান্তি প্রচণ্ড শক্তিশালী একজন লোকের প্রাণশক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে, বরফের উপর অসহায়ভাবে শুয়ে আছে সে, নড়াচড়া করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

চারপাশ ফুলে ওঠা লাল চোখে চেতনার একটু ঝিলিক দেখা গেল, অতি কষ্টে ঢোক গিলল লোপেজ, রানার চোখে আধবোজা চোখ রাখল সে, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল তার, অস্পষ্ট কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল গলার ভিতর থেকে, 'তুমি যাও, রানা। আমার দ্বারা সম্ভব নয়—আমি পারব না। আমাকে ফেলে চলে যাও তুমি⋯যেভাবে হোক গিরিপথের ওপারে তোমাকে পৌঁছুতেই হবে।'

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানা লোপেজের দিকে।

'ইউ ব্লাডি ফুল,' গালাগালি শুরু করল লোপেজ 'দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করো না। গড ড্যাম [illegible] গেট দ্য হেল আউট অফ হিয়ার।' সবটুকু শক্তি একত্রিত করে চেঁচিয়ে উঠলে [illegible] লোপেজের কথাগুলো অস্পষ্ট কোনমতে শুনতে পাচ্ছে রানা।

চেঁচিয়ে ওঠার ভয়ঙ্কর [illegible] লোপেজের জন্যে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি হয়ে

গেল, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

নিঃশব্দে আরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর ঝুঁকে পড়ল লোপেজকে কাঁধে তুলে নেবার জন্যে।

কাজটা কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার মত লাগছে রানার কাছে। ঢালটা ক্রমশ নেমে গেছে, একটু অসতর্ক হলেই পিছলে যাবে পা। বাঁ পা-টা কাঠ হয়ে আছে, ওটা থাকা না থাকা সমান। এসবের চেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা। তবু ওকে এখানে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবল না রানা। এবং কিভাবে তা ও নিজেও ভাল বলতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত অসীম ধৈর্য আর প্রাণান্তকর প্রয়াসে লোপেজকে কাঁধে তুলে নিল ও। সুঠামদেহী লোপেজের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে ওর পিঠ, এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ছে—এই অবস্থায় একটা পায়ের সামনে আরেকটা পা রাখল ও।

তারপর আরেকটা পা।

এইভাবে এক পা এক পা করে উঠে যাচ্ছে সে পাহাড় বেয়ে উপর দিকে। নাকের ফুটো দিয়ে হিম বাতাস ঢুকে গলার ভিতরটা শুকিয়ে ফেলছে ওর। ওজনের ভারে উরুর পেশী টনটন করছে, খ্যাচ্ করে ব্যথা লাগছে। পাথরের মত ভারী শক্ত বাঁ পায়ে ব্যথা নেই, কিন্তু তবু একটা উৎকট ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করছে সেটা, কারণ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধনুকের মত বাঁকা করে সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হচ্ছে সেটাকে। তবে ওটার ওপর শরীরের ভর চাপালে আশ্চর্য স্থির ভাবে খাড়া থাকে। লোপেজের হাত দুটো মরা সাপের মত ঝুলছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে রানার পায়ের পিছনে ধাক্কা খাচ্ছে সে-দুটো। সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করছে রানা, কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র। একটু পর, এখন, ধাক্কার স্পর্শ আর অনুভব করছে না ও। দুনিয়ার কিছুই আর অনুভব করতে পারছে না।

শরীরটা মারা গেছে ওর, জ্বলছে শুধু মনের ভিতর ইচ্ছাশক্তির একটা উজ্জ্বল, উত্তপ্ত কণা, সেটাই টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। তুষার, বরফ, আকাশ—কিছুই দেখছে না ও। ওর দু'পাশের পর্বত শৃঙ্গগুলো সম্পর্কে কিছুই জানছে না। জানে না নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হাঁটছে এখন।

একটা পা এগোচ্ছে সহজেই—ওটা তার ভাল পা। অপর পা-টা একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করার ভঙ্গিতে পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে এগোচ্ছে, স্থির হবার জায়গা খুঁজছে। এটা কঠিন লাগছে ওর, কারণ পা-টা অসাড়, মাটির সাথে যোগাযোগ টের পাচ্ছে না ও। ধীরে, অতি ধীরে ভর দাও। হ্যাঁ—হয়েছে, এটা ভাল পা-টা। মনে মনে নিজেকে বোঝাচ্ছে ও, বিশ্লেষণ করছে পদক্ষেপগুলোকে।

তারপর গুনতে শুরু করল ও। এক পা…দুই পা…তিন… চার…এগারো পর্যন্ত গোনার পর হিসাবে ভুল করে ফেলল ও। আবার শুরু করে মাত্র আট পর্যন্ত উঠল। এরপর আর চেষ্টা করল না। শুধু এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। একটা পা-কে পাশ কাটিয়ে আরেকটা পা সামনে বাড়ছে, এটুকু জেনেই তৃপ্ত ও।

মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে এসেছে চলার গতি। ভাল পা-টা তুলছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, পাথরে ফেলছে, তারপর শরীরের ওজন চাপাচ্ছে সেটার উপর—প্রচুর সময় লাগছে এইটুকু কাজে।

এরপর আহত পা-টা।

তোলো…আগে বাড়াও…মাটির সাথে ঘষা দিয়ে জায়গা খোঁজো…স্থির করো…ভর দাও…থামো। একটু বিরতি নিচ্ছে রানা, তারপর আবার ভাবছে, ভাবনার সাথে সাথে এগোচ্ছে…তোলো…আগে বাড়াও…মাটিতে ফেলো…স্থির করো…ভর দাও…থামো…বন্ধ চোখের গায়ে কিসের যেন উজ্জ্বলতা অনুভব করছে ও। চোখ খুলে অপলক সূর্যের দিকে তাকাল।

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। তীব্র জ্বালা করে উঠে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল চোখ দুটো আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে দিগন্তরেখার কাছে রূপালী একটা রেখা দেখে নিয়েছে ও, বুঝতে পারছে ওটা একটা সাগর।

আবার চোখ খুলল রানা। সবুজ উপত্যকায় চোখ রেখে দেখছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারকোনা সাদা রঙের অনেক বাক্স—ওগুলো বাড়ি-ঘর। উপত্যকার অপর দিকে আবার পাহাড়ের পাদদেশ দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে এই সাদা শহরটাই কি আলটিমিরোস?

শুকনো হলুদ পিচবোর্ডের মত খসখসে জিভটা বের করে ঠাণ্ডায় ফেটে যাওয়া ঠোঁটটা চেপে ভিজিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। 'লোপেজ,' ফিস ফিস করে উঠল সে। 'লোপেজ, আমরা চূড়ায় পৌঁছে গেছি!'

শুনতে পাবার অবস্থায় নেই লোপেজ। প্রকাণ্ড মরা একটা মাছের মত ঝুলছে সে রানার চওড়া কাঁধে।

সাত

'উফ্!' ব্যথায় কুঁচকে উঠল ঘামে ভেজা সিনর বরগুয়িজের মুখ। দু'টুকরো হয়ে যাওয়া হ্যাক-স ব্লেডটা পড়ে গেল হাত থেকে। চোখের সামনে তুলে আঙুলের ক্ষতটা দেখছেন তিনি। চিকণ ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। দুটো হাতই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তাঁর। মানুষ চালাতে পারি আমি, কিন্তু মেশিন চালানো আমার কম্ম নয়, ভাবছেন তিনি।

রড কেটে ইতিমধ্যে দশটা বোল্ট তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলোকে চোখা করার সাধ্য তাঁর নেই। তবে কেউ যদি একটি ঘণ্টা ব্যয় করে, এগুলো ব্যবহার করার উপযোগী করে তুলতে পারবে।

কেবিন ক্যাম্পে নির্বাসিত হয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। এ যেন নিজের অক্ষমতাকে আবিষ্কার করা—যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, কোনো মূল্য নেই তাঁর। তিনি বুড়ো হয়েছেন, দুর্বল, এবং তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু একটু শান্ত হয়ে একথাও আবার ভেবেছেন যে তিনি তো ম্যান অভ অ্যাকশন নন, আসলে তিনি ম্যান অভ আইডিয়াজ। এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি, তাই তাঁর কোন ভূমিকা নেই—কিন্তু একবার প্রশাসন যন্ত্রের মাঝখানে বসতে পারলে আবার তাঁর বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন নিজের

যোগ্যতা।

নদীর দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে কান খাড়া হয়ে উঠল তাঁর। মেশিনগানের শব্দ না! কান পাতলেন তিনি। কিন্তু পাহাড়ী বাতাসের হা হা বিলাপ ছাড়া কিছু শুনতে পাচ্ছেন না এখন আর। গম্ভীর হয়ে ভাবছেন, শত্রুরা বোধহয় ব্রিজ পেরিয়ে এপারে চলে আসার জন্যে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে। এখন কি করবে রবিন?

অত্যন্ত দক্ষ একজন পাইলট ছেলেটা, ভাবছেন তিনি। হয়তো একটু নীরস টাইপের—কিন্তু তাঁর ধারণা ভুলও হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রবিন হয়তো একজন মিশুক এবং বিবেচক মানুষ। যাই হোক, ওকে তাঁর ভালই লাগে। ভবিষ্যতে যদি সুযোগ আসে, ছেলেটাকে কাজে লাগাবার কথা ভাবা যাবে।

একটা কেবিনে ফিরে এসে শেলফ থেকে সুপের একটা ক্যান বেছে নিলেন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে। গরম সুপে শেষ চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় ভাইঝির গলা শুনতে পেলেন তিনি। ডাকছে তাকে বেনেদেতা।

কোটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। চারদিকে গাঢ় কুয়াশা, বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় রয়েছেন জানাবার জন্যে গলা ছেড়ে সাড়া দিলেন তিনি। একটু পরই কুয়াশার ভিতর আবছাভাবে নড়তে দেখলেন তিনটে মূর্তিকে। মিস জুডি এবং বেনেদেতাকে চিনতে পারছেন, কিন্তু বেনেদেতার কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে কে ও? কেউ আহত হয়েছে বুঝতে পেরে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। দ্রুত পা বাড়ালেন ওদের দিকে।

ওরা তিন জনই হাঁপাচ্ছে।

'গিলটি মিয়া,' বলল বেনেদেতা। 'আঘাত পেয়েছে ও।'

'আঘাত পেয়েছে মানে? কোথায়? কিভাবে?'

'কাঁধে গুলি লেগেছে—মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ ব্যথা করতে শুরু করেছে ক্ষতটা।'

গিলটি মিয়াকে [illegible] [illegible] শুরিজ। বেনেদেতা হাত ধরে থামাল মিস জুডিকে। [illegible] তাকালেন বেনেদেতার দিকে, কথা বলতে পারছেন না। [illegible] চোমাঙ্কের সেই উজ্জ্বলতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

থেমে থেমে এগোচ্ছে ওরা। কেবিনে ঢুকে শুইয়ে দেয়া হলো গিলটি মিয়া আর মিস জুডিকে।

[illegible] হয়ে দাঁড়িয়ে বেনেদেতা [illegible] কাকার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আসার সময় মেশিনগানের [illegible] আওয়াজ পেয়েছি আমি।'

'আমিও [illegible] [illegible] গুরিজ। একটু থেমে জানতে চাইলেন, [illegible] এপারে [illegible] ওরা?'

[illegible] আসতে [illegible] একটু [illegible] বেনেদেতার। একটা ঢোক গিলল [illegible] এখানে [illegible] থাকা দরকার আমাদের [illegible] বোল্ট তৈরি করতে পেরেছ [illegible]

'কিন্তু চোখা করা হয়নি। একা আমি [illegible]

'চলো, আমিও হাত লাগাচ্ছি।'

গ্রাইন্ডস্টোন মেশিনটা চালাচ্ছে বেনেদেতা, সিনর বরগুয়িজ বোল্টগুলোকে ছুঁচাল করছেন। ঘুরন্ত পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে লোহার বোল্ট থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। সেদিকে চোখ রেখে বৃদ্ধ বললেন, 'তোর কি মনে হয় বল তো?'

প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও বেনেদেতা বুঝতে পারল প্রশ্নটা। বৃদ্ধকে অভয় দানের জন্যে মিথ্যে কথা বলল সে, 'শেষ পর্যন্ত টিকে যাব মনে হচ্ছে। ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' কাজ শেষ হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'রাস্তাটা দেখতে যাচ্ছি আমি। ওদের দিকে লক্ষ্য রেখো তুমি।'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে সায় দিলেন সিনর বরগুয়িজ। বাইরে বেরিয়ে এসে দুই সারি কেবিনের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে বেনেদেতা। আরও গাঢ় হয়ে গেছে কুয়াশা, সামনেটা ভাল দেখতে পাচ্ছে না সে। নিজের কোটটার দিকে তাকিয়ে দেখল উলের রোঁয়াগুলোর মাথায় পানির কণা জমেছে। ঠাণ্ডার প্রকোপ যদি আরও বাড়ে, ভাবছে সে, তাহলে তুষার পড়বে।

ছমছম করে উঠল শরীরটা। ভৌতিক নিস্তব্ধতা চারদিকে। পাথর থেকে টুপ-টাপ দু'এক ফোঁটা পানি পড়ছে, তাছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সাদাটে মেঘের জগতে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে নিজেকে।

খানিকদূর এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে উঠে এল বেনেদেতা, উঁচু-নিচু কঠিন পাথরের উপর দিয়ে এগোচ্ছে এখন। দূর থেকে বিশাল কেব্‌ল্ ড্রামটাকে দেখে মনে হলো কুয়াশার ভিতর শূন্যে ঝুলছে সেটা।

প্রকাণ্ড রীলটার সামনে থামল সে। তারপর সেটাকে পাশ কাটিয়ে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল, ঝুঁকে পড়ে তাকাল নিচের রাস্তার দিকে। কুয়াশায় ঢাকা রাস্তার শরীর দেখা যায় কি যায় না। অসহায়, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, কি করতে হবে জানে না।

ফোঁস করে ঘাড়ের কাছে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বেনেদেতার বুক, ঝট্ করে ঘুরে চিৎকার করে উঠতে যাবে, দেখল ঠিক পিছনেই কখন যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে গিলটি মিয়া।

'তুমি!'

বেনেদেতাকে ছাড়িয়ে গিলটি মিয়ার দৃষ্টি নেমে গেছে নিচের রাস্তার দিকে। 'ব্যতা-বেদনা বিলকুল গায়েব হয়ে গেচে,' কাঁধের ক্ষতটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে একগাল হাসল সে। 'আমি অন্য কতা ভাবচি। আগুন—ফায়ার, ফায়ার। প্যারাফিনের বোতলগুলো এইখেনে নিয়ে আসা দরকার।' ইশারায় একটা বোতলের আকার দেখাল সে, তারপর ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করল নিচের দিকে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা বেনেদেতার। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে গিলটি মিয়ার বক্তব্য। শত্রুদেরকে শুধু প্রকাণ্ড ড্রামটার সাহায্যে নয়, আগুন ছুঁড়েও প্রতিহত করার কথা ভাবছে সে।

খাওয়ার ভঙ্গিতে মুখে হাত তুলল গিলটি মিয়া। 'জুডি বেগম খেতে ডাকচে।'

কেবিনে ফিরে এসে মিস জুডিকে দেখে হেসে ফেলল বেনেদেতা। একটু বিশ্রাম পেয়েই আবার তাজা হয়ে উঠেছেন বৃদ্ধা। মুখে রঙ এবং সেই চাপা

উত্তেজনার ছাপ ফিরে এসেছে অনেকটা। স্টোভ জেলে সুপ গরম করছেন তিনি। আর অনর্গল কথা বলছেন সিনর বরগুয়িজের সাথে। সেন্ট্রাল কর্ডিলেরায় তাঁর স্বেচ্ছা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের শাখার জন্যে কতবড় বাড়ি, ক'জন লোক তাঁর দরকার তার একটা ধারণা দিতে চাইছেন তিনি।

'সিনর গিলটি মিয়া, এসো,' বললেন বৃদ্ধ বরগুয়িজ, 'গলায় একটা স্লিং বেঁধে তোমার হাতটা আটকে দিই।'

দ্রুত খেয়ে নিল ওরা। স্লিংয়ে হাতটা আটকানো থাকায় সেটা আর বিশেষ নড়াচড়া করছে না, ফলে ধকল পোহাতে হচ্ছে না—কাঁধটাকে, দিব্যি সুস্থ মানুষের মত দৌড় ঝাঁপ দিয়ে কাজে নেমে পড়েছে গিলটি মিয়া। প্যারাফিন ভর্তি বোতলগুলো নিয়ে আবার রওনা হয়ে গেল ওরা। মিস জুডি এবং সিনর বরগুয়িজও ওদের সাথে আসতে চাইলেন, কিন্তু বেনেদেতো রাজী হলো না।

কেব্‌ল্ ড্রামের কাছে ফিরে এসে বোতলগুলো নামিয়ে রাখল ওরা। পা ঝুলিয়ে কিনারায় বসল বেনেদেতো, এক হাত দূরে তার পাশে বসেছে গিলটি মিয়া। কেউ কথা বলছে না। বাতাসের তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়েছে, এবং একটু একটু করে ক্রমশ আরও বাড়ছে। কুয়াশার ভারী পর্দা দোল খাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে সরে যাচ্ছে এদিক সেদিক। মাঝে মধ্যে অনেক দূর, সেই রাস্তার বাঁক পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ওরা, আবার কখনও ওদের মাত্র কয়েক ফিট নিচের রাস্তাটাও দেখতে পাচ্ছে না। কোথাও এতটুকু শব্দ বা নড়াচড়া নেই।

তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে না ধরে নিয়ে কেবিনে ফিরে আসার কথা ভাবছে, এমনি সময় ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এল পাহাড়ের নিচের দিক থেকে। ঢোক গিলে দ্রুত উঠে দাঁড়াল বেনেদেতো। আশঙ্কায় শুকিয়ে গেছে কলজে। শত্রুরা তাড়া না করলে পিছু হটবে না রবিনরা।

পায়ে লেগে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ ওটা। ভাবছে গিলটি মিয়া। উঠে দাঁড়িয়েছে সে-ও। কে আসছে? নিজেদের লোক, নাকি দুশমন? দু'দলের যে-কেউ আসতে পারে।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুটো বোতল তুলে নিল বেনেদেতো। নিঃশব্দে তার হাত থেকে একটা বোতল নিল গিলটি মিয়া। রবিনের লাইটারটা কোটের পকেট থেকে বের করল বেনেদেতো। পকেট থেকে গিলটি মিয়াও দিয়াশলাই বের করে তৈরি।

এক একটা সেকেন্ড যেন এক একটা যুগ। আবার কয়েক যুগ পরে শব্দ পেল ওরা। এবার পরিষ্কার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। রাস্তা ধরে দৌড়ে উঠে আসছে কে যেন। এই সময় বাতাসে উড়ে সরে গেল কুয়াশার ভারী একটা স্তর, আবছাভাবে বাঁকের কাছে একটা মূর্তি দেখতে পেল ওরা। দৌড়ে আসছে। আরও কাছে চলে এল মূর্তিটা। চিনতে পারল ওরা।

'কি ঘটেছে ওখানে?' উত্তেজনায়, আতঙ্কে রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল বেনেদেতো।

চমকে উঠল জনসন। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ঝট্ করে মাথার উপর তাকাল। ভয়ের একটা শিহরণ জেগে উঠছে তার শরীরে, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে ঢোক

গিলল সে। ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, খক খক করে কাশতে শুরু করল। 'ব্রিজের এপারে চলে এসেছে ওরা,' কাশি থামতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। আবার কেশে উঠল সে। 'আর সবাই আমার পিছনেই আছে…একটু আগে পরে সবাই একসাথে দৌড়ুতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু যদি…'

'আগে তুমি উঠে এসো এখানে,' বলল বেনেদেতা।

মুখ তুলে পনেরো ফিট উপরে দাঁড়ানো বেনেদেতার আবছা কাঠামোর দিকে তাকাল জনসন। 'রাস্তা ঘুরে ওদিক দিয়ে আসছি আমি,' বলল সে, তারপর হন হন করে উঠতে শুরু করল রাস্তা ধরে।

ওদের কাছে জনসন এসে পৌঁছুবার আগেই আরেকজনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বলা যায় না কে আসছে। দ্রুত শুয়ে পড়ল গিলটি মিয়ার পাশে বেনেদেতা। দু'জনের হাতেই একটা করে বোতল। কুয়াশার ভিতর কাছে আসতে চেনা গেল কোনালিকে। কোনালির ঠিক পিছনেই রয়েছে রবিন। 'সোহানাদি কোতায়?' উঠে বসল গিলটি মিয়া।

• 'তাই তো!'

'ইদিকে,' চিৎকার করে দিক নির্দেশ দিল গিলটি মিয়া, 'ড্রামের কাচে।'

শুধু মুখ তুলে তাকাল রবিন আর কোনালি, থামলও না, কথাও বলল না। রাস্তা ধরে উঠে আসছে ওরা।

প্রথমে জনসন, তারপর রবিন আর কোনালি যোগ দিল ওদের সাথে। পাঁচ মাইল পাহাড়ী পথ ছুটে পেরিয়ে এসে সাংঘাতিক হাঁপিয়ে গেছে ওরা। অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করে রয়েছে গিলটি মিয়া। ওদের একটু বিশ্রাম হতেই জানতে চাইল সে, 'কি ঘটেচে?'

'হঠাৎ ওরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে,' বলল রবিন। 'ট্রাক থেকে ব্রিজের একটা রেডিমেড অংশ নামিয়ে কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে সোহানা আমাদেরকে পালিয়ে আসতে বলল এখানে। আর কোন দিকে তাকাবার সময় পাইনি, তিনজনে ছুটে চলে এসেছি।'

'সোহানাদি?'

'দৌড়ে সামনে এগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল, এইটুকু দেখেছি আমি। সে বোধহয় ওদের একজনকে খুন করেছে। একটা চিৎকার শুনেছি আমি। শেষবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছি ব্রিজের এপারে চলে এসেছে ওরা। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সোহানার জন্যে দাঁড়াতে পারিনি। তবে চিন্তার কিছু নেই, এসে পড়বে এক্ষুণি।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল গিলটি মিয়া। তবু জানতে চাইল, 'সোহানাদি জখম হয়নি তো?'

'আরে না!'

'তার মানে,' বলল বেনেদেতা, 'সোহানার পিছু পিছু আসছে পিশাচদের দলটা।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রবিন। 'শত্রুরা প্রথমে নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাববে। সবচেয়ে আগে ওরা ব্রিজটাকে মেরামত করবে, তারপর জীপ ছুটিয়ে

রওনা হবে মাইনের দিকে, আমরা পৌঁছুবার আগেই পৌঁছে যাবে সেখানে ওরা।' চোখ তুলে প্রকাণ্ড কেব্‌ল্ ড্রামটার দিকে তাকাল সে। 'ওদেরকে ঠেকাবার এইটাই একমাত্র সম্বল আমাদের।'

'আর কিছু প্যারাফিন ভর্তি বোতল আচে,' স্মরণ করিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

'ও হ্যাঁ,' একটু উৎসাহী হলো রবিন। 'বেনেদেতা, তোমার কাকা আর মিস জুডি এখানে আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না—ওঁদেরকে এখুনি মাইনের দিকে পাঠিয়ে দাও। বলবে পিছন দিকে কোন গাড়ি বা পায়ের আওয়াজ পেলে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হবে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। গাঢ় কুয়াশা নেমেছে।'

কিন্তু বেনেদেতা নড়ছে না।

'কি হলো, বেনেদেতা?' জানতে চাইল রবিন।

'এখানে থাকব আমি,' বলল বেনেদেতা। 'লড়ব।'

'আমি যাচ্ছি,' বলল জনসন। উঠে দাঁড়িয়ে এগোল সে, প্রায় সাথে সাথে তাকে গ্রাস করল কুয়াশা।

সবাই বুঝল, ভয় পেয়ে এখান থেকে সরে গেল জনসন। কিন্তু সেজন্যে কেউ তাকে দোষ দিতে পারল না। ভয়ে কুঁকড়ে আছে ওরা নিজেরাও।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভাঙল গিলটি মিয়া, 'সোহানাদি কোতায়?' উঠে দাঁড়াল সে। রবিনের একটা কাঁধ খামচে ধরল সে। 'ব্যাপার কি, সিনর রবিন? সোহানাদিকে কোতায় রেকে এসেচো?'

পাথরের একটা ফাটলে শুয়ে আছে সোহানা। সামনে, ওর মাথা থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে বুট পরা এক জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। স্তব্ধ, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাতাস আর সময়। শুকনো গলাটা খুস খুস করছে সোহানার, কাশিটাকে দমিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও। নাকের পাশটা কুঁচকে উঠল ওর, সাংঘাতিক চুলকাচ্ছে জায়গাটা।

এক নিমেষে শত্রুরা ব্রিজের এপারে চলে আসায় রাস্তায় ফিরে আসার সুযোগ পায়নি সোহানা। আর কয়েকটা সেকেন্ড পেলেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে আড়ালে পৌঁছে যেতে পারত ও, সেখান থেকে রাস্তা ধরে উঠে যেতে পারত ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু খোলা জায়গাটায় বেরুতে গিয়েই চোখের কোণ দিয়ে কয়েকজন লোককে রাস্তায় দেখতে পেয়েছে ও, দ্রুত পিছিয়ে এসে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত গা ঢাকা দেবার জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে। তখনই কুয়াশা ভেজা পাথরে পিছলে গিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পায় ও। পতনের শব্দটা নিজের কানেই প্রচণ্ড লেগেছিল ওর, ব্যথায় মুখ বিকৃত করে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এসে ঝাঁঝরা করে দেবে শরীরটাকে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। লোকজনের হৈ চৈ শুনে বুঝতে পেরেছিল তার ধারণাটাই সত্য হতে যাচ্ছে, খাদের কিনারা ধরে ছড়িয়ে পড়ছে শত্রুরা, পজিশন নিয়ে ব্রিজের দিকে এগোবার সম্ভাব্য সমস্ত পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

আসলে কুয়াশার জন্যেই দেখতে পায়নি ওকে তারা।

ক্রস বো-টা এখনও রয়েছে ওর কাছে। কয়েক মুহূর্ত আগে এটা দিয়ে একজন লোক খুন করেছে ও। লাশটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর চেঁচামেচি এখান থেকে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। লোকগুলোর মনের অবস্থা অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না। কুয়াশার আড়াল থেকে শব্দহীন মৃত্যু যে-কোন মুহর্তে যে-কোন দিক থেকে ছুটে আসতে পারে—এই ভয়ে চাপা কণ্ঠে পরস্পরকে সতর্ক থাকার জন্যে বলছে ওরা।

পায়ের ব্যথাটা একটু একটু করে বাড়ছে। উঠে দাঁড়ালে শরীরের ভর সইতে পারে কিনা সন্দেহ। এই সময় একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে এসে ঠিক ওর নাকের কাছে থামল। ওকে লক্ষ্য করে কেউ ছুঁড়েছে ভেবে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। পর মুহূর্তে চোখের কোণ দিয়ে দেখল ওর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক, তাকিয়ে আছে ব্রিজের দিকে।

লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোহানা, হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আছে একটা পাথর। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল লোকটা, তারপর হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার ভিতর।

আটকে রাখা দমটা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ছাড়ল সোহানা। পাথরটা ছেড়ে দিয়ে মুঠোয় ভরল বোল্ট তিনটে, অপর হাতে নিল ক্রস বো-টা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের মাঝখান দিয়ে উপরের দিকে, ব্রিজ থেকে দূরে সরে আসতে শুরু করল। ক্রস বো এবং মুঠো থেকে মাথা বের করে থাকা বোল্টগুলোর অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ্য করল ও—সাবধান হয়ে কোন লাভ নেই, পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে টং-টং আওয়াজ তুলছেই বারবার। অকস্মাৎ আবার আরেকটা নুড়ি পাথরকে গড়িয়ে যেতে দেখে আঁতকে উঠল ও, সরে গিয়ে দুটো বোল্ডারের মাঝখানের অপ্রশস্ত ফাঁকে ঢুকে পড়ল দ্রুত। তিন সেকেন্ড পর ঠিক চোখের সামনে এসে দাঁড়াল বুট পরা পা জোড়া! শুকনো গলাটা মারাত্মক খুস খুস করছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে সোহানা কাশিটাকে চেপে রাখার জন্যে।

শক্ত পাথরে বুটের ডগা ঠুকছে লোকটা, ধুলো আর পাথর-কুচি এসে লাগছে সোহানার মুখে, নাকের দুই পাশ কুঁচকে উঠছে বারবার। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, নড়ছে না, তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে সোহানা। হঠাৎ আরেক জোড়া বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে শুনতে পেল ও।

সেফটি ক্যাচ অন করার ধাতব শব্দটা বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ির মত লাগল। মুখের সামনে দাঁড়ানো লোকটা দুর্বোধ্য, সম্ভবত স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন বলল। একটি মাত্র প্রশ্নবোধক শব্দের সুর লক্ষ করে সোহানা অনুমান করল লোকটা নবাগতের পরিচয় জানতে চাইছে।

'বাস্কো,' নবাগতের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল সোহানা। এ সেই প্রকাণ্ডদেহী লীডার।

নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। একটা কথাও বুঝল না সোহানা। তারপর হঠাৎ কি কারণে যেন প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল বাস্কো। ফট ফট করে ইংরেজি ছাড়তে শুরু করেছে সে। 'আমি যা বলছি তাই শোনো, উঠতে শুরু করো পাহাড়ে। প্যাসেঞ্জারদের কাউকে পাবে না এদিকে।'

লোকটা কি বলল তার একটা বর্ণও বুঝল না সোহানা।

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা বেঁটে সেক্রেটারি,' হুঙ্কার ছাড়ল আবার বাঙ্কো। 'ওর জন্যেই তো এই অবস্থা, তা নাহলে বরগুয়িজকে এতক্ষণে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলতাম। কে কি বলেছে ভুলে যাও—সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও মাইনের দিকে—জলদি!'

বাধ্য ছেলের মত তর্ক না করে পা বাড়াল লোকটা। ক্রমশ উপর দিকে উঠে যাচ্ছে তার বুট জুতোর শব্দ, শুনতে পাচ্ছে সোহানা। বাঙ্কোও আরেকদিকে চলে গেল দ্রুত। ধীরে ধীরে আবার নিঃশ্বাস ছাড়ল সোহানা।

এখন কি করা যায় ভাবছে ও। বাঙ্কো পাহাড়ের উপরে লোক পাঠালেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ব্রিজের কাছে পাহারায় থাকবে। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া উপরে উঠে লাভ নেই, রবিনকে কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না সে। তারচেয়ে ব্রিজের কাছাকাছি থেকে দেখা যাক এদের কোন ক্ষতি করা যায় কিনা।

ক্রল করে পিছিয়ে ফাটল থেকে বেরিয়ে এল ও, আবার নামতে শুরু করল নিচের দিকে। ব্রিজের দিক থেকে হৈ-চৈ এবং লোহা আর কাঠে বাড়ি লাগার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওখানে আলো এবং লোকজন খুব বেশি, তাই আবার দিক পরিবর্তন করল সোহানা। একা একজন সশস্ত্র লোককে আড়ালে পেতে চায় ও।

ট্রিবুসেটের দিকে এগোচ্ছে সোহানা। মাঝে মাঝে থামছে, গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়ে সামনে কিছু নড়ে কিনা দেখতে চেষ্টা করছে। কাছাকাছি পৌঁছে হাসির আওয়াজ পেল ও। ট্রিবুসেটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক, কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটাকে দেখে হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। আরও একটু এগিয়ে একটা বোল্ডারের আড়ালে থামল সোহানা। ক্রস বো-টা কক করল।

এই সময় বাঙ্কোর কণ্ঠস্বর পেল ও। কড়া সুরে ধমক মারছে সে। হাসি থামিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো লোকগুলো। 'সোয়ান, সোয়ান' করে হাঁক ছাড়ল বাঙ্কো।

আড়াল থেকে বেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে আরেকটা বোল্ডারের আড়ালে থামল সোহানা। ট্রিবুসেটটা পাহারা দিচ্ছে অল্প বয়সী একজন ছোকরা। বাঙ্কো তাকে রেখে চলে গেছে অন্যদিকে।

ব্রিজের দিক থেকে আলো এসে উজ্জ্বল করে রেখেছে মাথার উপরের কুয়াশা, তার আভায় গার্ডটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সোহানা। ট্রিবুসেটের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না সে। বয়স কম বলেই হোক অথবা বাঙ্কোর ভয় দেখানো কথাতেই হোক, সাংঘাতিক উত্তেজনায় অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চরকির মত ঘুরছে, সেফটি ক্যাচ অন করা সাব-মেশিনগানটা দু'হাত দিয়ে বাগিয়ে ধরে আছে। একটু কিছু দেখলেই ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়বে সে।

কোন শব্দ হবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না সোহানা। অপেক্ষা করছে তাই। কিন্তু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে ও। এখনও একা রয়েছে ছোকরা, একটু পর এ সুযোগ হয়তো থাকবে না। দু'বার ছোকরার বুক লক্ষ্য করে ক্রস বো তাক করল ও, কিন্তু নিজের কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে দু'বারই নামিয়ে নিল সেটা।

অবশেষে উত্তেজনা কমে এল ছোকরা গার্ডের। তার আশপাশে কুয়াশায় কেউ লুকিয়ে নেই ধরে নিয়ে শান্ত হলো সে। এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল ট্রিবুসেটটার উপর। সেটার দিকে ঝুঁকে ভাল করে দেখছে। হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে সাব-মেশিনগানটাকে, কাঁধে আটকানো লেদার স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলছে সেটা। দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কি ঢুকল কিছুই টের পেল না সে। দশ গজ দূর থেকে ছুঁড়েছে বোল্টটা সোহানা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ট্রিবুসেটের দীর্ঘ বাহুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছোকরা, বুক ভেদ করে কাঠের ভিতর অর্ধেকটা গেঁথে গেছে বোল্টটা। সোহানা পাশে এসে দাঁড়ানোর আগেই মারা গেছে সে।

তিন মিনিট পর পাথরের আড়ালে বসে লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো পরীক্ষা করছে সোহানা। সাব-মেশিনগানটা ছাড়াও পুরো তিন ম্যাগাজিন ভর্তি অ্যামুনিশন, একটা লোডেড পিস্তল এবং একটা চওড়া পাতের ছুরি পেয়েছে ও। সন্তুষ্ট চিত্তে আপনমনে হাসছে ও, ভাবছে—কয়েকটা ধারাল দাঁত গজিয়েছে তার, কপালে খারাবি আছে শত্রুদের।

আট

ঠাণ্ডা কুয়াশায় ভৌতিক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রবিন, কোনালি, গিলটি মিয়া এবং বেনেদেতা। ড্রামের সামনে বসে কাঠের চাকতিটায় হাত বুলিয়ে সেটা পরীক্ষা করছে জনসন। এই কাঠের টুকরোটাই ড্রামের নিচে ঠেক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সরিয়ে নিলেই গড়াতে শুরু করবে ড্রামটা। প্রয়োজনের সময় টেনে সরিয়ে নিতে কতটা গায়ের জোর লাগবে বুঝে নিতে চাইছে জনসন।

'রাস্তায় কাউকে দেখলেই কিছু করে বসো না কেউ,' বলল রবিন। 'আমার সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করবে। কুয়াশায় চিনতে অসুবিধে হবে সোহানাকে।'

নিজেকে এবং গিলটি মিয়াকে অভয় দেবার জন্যে সবাই ওরা বলেছে, শত্রুদের হাতে ধরা পড়েনি সোহানা। অথচ মনে মনে প্রত্যেকে ভাবছে ওরা, ধরা বা মারা না পড়লে এত দেরি হচ্ছে কেন সোহানার? উঠে আসছে না কেন সে?

মিস জুডিকে নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল। বুড়ির একই জেদ, মাইনে যাবেন না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবার সাথে লড়বেন তিনি। শেষ পর্যন্ত গিলটি মিয়া গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করিয়েছে তাঁকে। সিনর বরগুয়িজ অবশ্য নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেছেন।

সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল জনসন। 'কোথায় তারা?' হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল সে। 'চলে এসে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছে না কেন?'

'এই আস্তে!' বলল রবিন।

'এখনও কেন আসছে না ওরা বলো তো?' নিচু গলায় জানতে চাইল জনসন।

'ওদের কোন তাড়া নেই, জানে কোথাও পালিয়ে যেতে পারব না আমরা,' বলল রবিন। তাকাল বেনেদেতার দিকে। 'ক্যাম্প থেকে ওদেরকে প্রতিরোধ করা

সম্ভব বলে মনে করো তুমি, বেনেদেতা?'

'অসম্ভব,' বলল বেনেদেতা। 'রাস্তাটা ব্লক করতে পারলেও সাথে সাথে মাইনের দিকে ছুটতে হবে আমাদেরকে।'

'তাহলে ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে,' দৃঢ় স্বরে বলল রবিন। জনসনের দিকে তাকাল ও। 'যাও, জনসন, কেবিনগুলো ভিজিয়ে রাখো প্যারাফিন দিয়ে—সবগুলো। এদিকে গোলাগুলি বা হৈ-চৈ হলেই আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত চলে গেল আবার জনসন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কোনালি হঠাৎ বলল, 'কি জঘন্য একটা পরিবেশ, তাই না? দুটো দল আমরা পরস্পরকে খুন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছি, অথচ কেউ আমরা কাউকে চিনি না পর্যন্ত। যুদ্ধের অবশ্য এই-ই ধারা, সন্দেহ নেই,' মুচকি একটু হাসল সে। 'কিন্তু, তবু এ বড় সাংঘাতিক বিদঘুটে পরিস্থিতি, যাই বলো। মধ্য বয়স্ক দু'জন প্রফেসর, একজন বেসামরিক পাইলট, একজন আহত গোয়েন্দা, এবং দু'টি অল্প বয়েসী মেয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি···'

রবিন তার হাত চেপে ধরল, 'চুপ!'

কানে দুটো শির শির করে উঠল কোনালির। ফিস ফিস করে বলল, 'কি?'

'কি যেন শুনলাম।'

'শুয়ে পড়ো সবাই,' নিচু গলায় বলল বেনেদেতা।

নিঃশব্দে কিনারায় শুয়ে পড়ল ওরা।

'আমিও কি যেন শুনেছি,' বলল গিলটি মিয়া।

কিন্তু কুয়াশায় আধো ঢাকা রাস্তার উপর কিছুই নড়তে দেখছে না ওরা। আর কোন শব্দও নেই। শুধু বাতাসের একটানা হা-হুতাশ শোনা যাচ্ছে।

তারপর অস্পষ্টভাবে এল একটা গাড়ির গিয়ার বদলানোর আওয়াজ। অস্পষ্ট, কিন্তু শুনতে পেল ওরা সবাই।

'ট্রাক কিংবা জীপ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রবিন, 'আমরা তৈরি তো?'

'ড্রামটাকে গড়িয়ে দেব আমি,' বলল কোনালি। 'তোমার কাছ থেকে সিগন্যাল পেলেই।' উঠে দাঁড়াল সে, ছুটে চলে গেল ড্রামের কাছে।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে মলোটভ ককটেলের সলতেগুলোয় আগুন ধরাচ্ছে গিলটি মিয়া। বেনেদেতা দেখল, দুটো হাতই থরথর করে কাঁপছে তার। কম-ভেজা সলতেগুলোয় ভাল ভাবে আগুন ধরতে প্রচুর সময় লাগছে। নিচের রাস্তা থেকে এই কুয়াশায় আগুন দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু কিনারা থেকে একটু সরিয়ে নিল বেনেদেতা বোতলগুলো।

যেন কঠিন পরিশ্রম করে উঠে আসছে গাড়িটা, ধীর গতিতে; ক্রমশ বাড়ছে ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ। খানিক পর পর দু'বার থেমে গেল সেটা, সেলফ-স্টার্টারের শব্দ পেল ওরা। হাই অলটিচ্যুডের উপযোগী সুপারচার্জড ইঞ্জিন নয় এটা, ঢালু রাস্তা ধরে ঘণ্টায় ছয় কি সাত মাইলের বেশি এগোতে পারছে না। তবে হাঁটার গতিবেগের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত উঠছে গাড়িটা, সন্দেহ নেই।

রাস্তার বাঁকের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কিন্তু গাঢ় কুয়াশায় অতদূরে দৃষ্টি

যাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বাড়ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ, তারপরই আবার চুলের কাঁটার মত বাঁক নেবার সময় কমে আসছে।

'গাড়ি কি দুটো.' বেনেদেতার মনে হলো দুটো ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে সে।

কেউ উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। দুটো হোক বা দশটা, কিছু এসে যায় না—জানে ওরা।

হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ড্রামের পাশে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে কোনালি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে কিনারায় শুয়ে থাকা ওদের তিনজনের দিকে।

রাস্তার শেষ মাথায় ক্ষীণ একটু আলো দেখছে রবিন। বিশ সেকেন্ড পর ঘোলাটে দুটো হেডলাইট দেখা গেল। প্রথম গাড়িটা বাঁক নিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। রাস্তার ধারের একটা পাথর বেছে রেখেছে সে, গাড়িটা সেখানে এলেই সিগন্যাল দেবে কোনালিকে।

কর্কশ ঘড় ঘড় আওয়াজ করে থেমে গেল গাড়িটা। জীপ, নাকি ট্রাক—বোঝা যাচ্ছে না এখনও। সেলফ স্টার্টারের শব্দ হলো, আবার এগিয়ে আসছে গাড়িটা। ওটার পিছনে আরও দুটো ঘোলাটে আলোর চোখ দেখা যাচ্ছে।

পাথরটার কাছে চলে এসেছে গাড়িটা। একটা জীপ, লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করার আগে দেখতে পেল রবিন।

'নাউ! নাউ! নাউ!'

ঝুঁকে পড়ে প্যারাফিন ভর্তি দুটো বোতল তুলে নিচ্ছে রবিন, নিচে থেকে একটা বিস্মিত চিৎকার ভেসে এল। ধুপ ধাপ আওয়াজ তুলে দ্রুত গড়িয়ে নামছে ড্রামটা। কিনারার কাছে পৌঁছে ছোট একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে মন্থর হলো গতি, তারপরই লাফ দিয়ে পাথরটাকে টপকে ঝপাৎ করে খসে পড়ল নিচে।

প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে বুঝল রবিন, একেবারে সরাসরি গিয়ে ধাক্কা মেরেছে ড্রামটা জীপের গায়ে। নিচ থেকে তীব্র একটা আর্তনাদ ভেসে এল সেই মুহূর্তে। হাতের জ্বলন্ত বোতলটা ছুঁড়ে দিল সেদিকে রবিন বাতাসের ডিগবাজি খেতে খেতে আরও দুটো বোতলকে অনুসরণ করে নেমে যাচ্ছে সেটা।

পনেরো ফিট উপর থেকে খসে জীপের নাকের উপর পড়েছে ভারী ড্রামটা, সামনের দিকটা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সাথে সাথে মারা গেছে ড্রাইভার। গিলটি মিয়ার ছুঁড়ে দেয়া বোতলটাই শুধু ঠিক মত লক্ষ্যে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো সামনের বিধ্বস্ত সীটে বসে থাকা আরোহীর পাশে। বুম করে বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, আবার চিৎকার করে উঠল লোকটা, এবং মাঝপথে গলায় আটকে গেল সেটা। সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে তার, দু'হাত দিয়ে খামচে ধরেছে নিজের মুখটা পিছনের সীট থেকে লাফ দিয়ে নেমে রাস্তা ধরে নিচের দিকে দৌড়াচ্ছে দু'জন লোক, জীপটাকে অনুসরণরত ট্রাকটার দিকে ছুটছে

জীপ নয়, এবার ওদের লক্ষ্য ট্রাকটা গিলটি মিয়া, বেনেদেতা এবং রবিন একের পর এক মলোটভ ককটেল ছুঁড়ছে জীপের কাছ থেকে বেশ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাকটা। গরু ছাগলের মত গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে সেটার পিছনে অনেক লোক।

পর পর দুটো রাইফেলের আওয়াজ হলো। কিন্তু এদিকে কোন বুলেট আসেনি। ট্রাকের উইন্ডস্ক্রীন লক্ষ্য করে একটা বোতল ছুঁড়ল রবিন। ড্রাইভারের মাথার উপর ছাদে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো সেটা। খোলা জানালা দিয়ে আগুনের শিখা ভিতরে ঢুকছে দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ড্রাইভার। গিলটি মিয়ার ছুঁড়ে দেয়া আরেকটা বোতল ট্রাকের গায়ে গিয়ে ভাঙল। হুপ্ করে জ্বলে ওঠা আগুনের আলোয় দেখল রবিন উন্মত্ত ব্যস্ততায় ট্রাক থেকে নামার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে শত্রুদের মধ্যে।

খপ্ করে বেনেদেতার একটা হাত ধরে ফেলল রবিন। 'আর নয়, চলো এবার!' ও থামতেই বুম করে বিকট একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। সেই সাথে বিশাল একটা আগুনে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল জীপটা। নিঃশব্দ হাসছে সেদিকে তাকিয়ে রবিন। 'প্যারাফিন নয়—ওটা পেট্রল, পুড়ছে। এসো।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রবিন আর বেনেদেতাকে অনুসরণ করল গিলটি মিয়া। কোনালির সাথে মিলিত হলো ওরা, তারপর কুয়াশার ভিতর দিয়ে ছুটল চারজন। ক্যাম্পের দিকে আগুনের একটা বিশাল আভা দেখতে পাচ্ছে ওরা। পাশাপাশি আরেকটা, তারপর আরও একটা।

প্রফেসর জনসন তার অগ্নিসংযোগের দায়িত্ব পালন করছে।

হাঁটতে গেলেই প্রচণ্ড ব্যথা লাগে পায়ে, তাই জুতো খুলে ফেলে দিয়েছে সোহানা। হাঁটু অবধি ট্রাউজার কেটে আহত জায়গাটায় প্যাড বেঁধে নিয়েছে। হাঁটার সময় ব্যথা লাগছে এখনও, কিন্তু সহ্য করা যাচ্ছে এখন।

বাস্কোর সাথে সেই সেক্রেটারির আবার বিরোধ দেখা দিয়েছিল, যার ফলে নিজের লোকজনদেরকে রাস্তা থেকে ডেকে নিতে বাধ্য হয়েছে বাস্কো। সেক্রেটারির নির্দেশই বহাল হয়েছে। একটু পরই একটা জীপ এবং একটা ট্রাক ব্রিজ পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে, এবং লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে গেছে রাস্তা ধরে উপরের দিকে।

নির্জন রাস্তার ধার ঘেঁষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠছে সোহানাও। ক্রস বো এবং সাব-মেশিনগান; দুটোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, কিন্তু ক্রস বো-টাকে ফেলে দিতেও মন চাইছে না—এটা একটা বোবা হাতিয়ার, বোল্ট দুটোকে কাজে লাগাবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতে।

সম্ভাব্য সাবধানতা অবলম্বন করে এগোচ্ছে সোহানা। মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছে ও, চাইলেই একলাফে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিতে পারবে।

কতক্ষণ ধরে হাঁটছে খেয়াল নেই ওর, হঠাৎ কয়েকটা বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ আর বড়সড় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ও। উপরের পাহাড়ের দিকে আগুনের একটা আভা মত দেখছে, কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না চোখের ভুল কিনা।

পায়ের শব্দে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। দ্রুত সরে গিয়ে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। কুয়াশায় পাঁচ হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। স্যাঁত করে চলে গেল লোকটা ওর একেবারে তিন হাত দূর দিয়ে। দৌড়ে নামছে লোকটা, ব্রিজের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ব্যাপার কি? রাস্তায় আবার ফিরে এসে হাঁটতে শুরু করেছে

সোহানা, ভাবছে।

আধঘণ্টা পর পিছনে ইঞ্জিনের আওয়াজ। আবার গা ঢাকা দিল সোহানা। একটা জীপ উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। সন্ত্রাসবাদীদের দলীয় সেক্রেটারিকে ড্রাইভারের পাশে বসে থাকতে দেখল বলে মনে হলো ওর, কিন্তু গুলি করার কথা মাথায় ঢোকার আগেই অনেকটা এগিয়ে গেল গাড়ি।

রাস্তায় উঠে এসে হাঁটার গতি আরও দ্রুত করতে চেষ্টা করল ও। পাঁচ মাইল দৌড়ে নেমে গিয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তার মানে কেবিন ক্যাম্পে বিপদে পড়েছে শত্রুরা, ভাবছে সোহানা। গিলটি মিয়া, মিস জুডি—ওদের সবার কথা মনে পড়ে গেল ওর। কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে লোকগুলো ওদেরকে, ভাবতেই প্রচণ্ড একটা আক্রোশে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শরীরটা ওর।

আরও একটু পর বুঝতে পারল ও, চোখের ভুল নয় উপরে কোথাও আগুন জ্বলছে, উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ হয়ে উঠেছে দু'জায়গার কুয়াশা। আগুনের বড় আভাটার উৎস ক্যাম্প এবং ছোটটার উৎস রাস্তা—ধরে নিল ও। কেব্‌ল্ ড্রাম এবং মলোটভ ককটেলের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। ভাবছে, বেশ ভালভাবেই তাহলে কাজে লাগাতে পেরেছে ওগুলো রবিন।

সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করে রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নিচু পাথরের মাঝখান দিয়ে ঘুরপথে এগোচ্ছে এবার সোহানা। বিরাট একটা চক্কর দিয়ে ক্যাম্প ছাড়িয়ে আরও কিছুটা উঠে গিয়ে তারপর আবার রাস্তায় ফিরে আসার ইচ্ছা ওর। বেশ কিছুটা উঠেও গিয়েছিল ও, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আবার পিছিয়ে এল ছোট আগুনটার দিকে। এখানেই সেক্রেটারি লোকটা এসেছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

কুয়াশায় দেখার উপায় নেই ঠিক কি ঘটেছে, তবে শোরগোল আর ছুটোছুটি লক্ষ্য করে বুঝতে পারছে সোহানা রাস্তাটা সম্পূর্ণ ব্লক হয়ে গেছে। আরও সামনে থেকে দেখার জন্যে সাবধানে এগোচ্ছে ও, এইসময় আহত পা-টা আবার পিছলে গেল ভিজে পাথরে। পড়ে গেল সোহানা। ধপ করে শব্দ হলো একটা। সেই সাথে হাত থেকে ছুটে গিয়ে পাথরের গায়ে বাড়ি খেল ক্রস বো-টা, ধাতব শব্দে ছ্যাঁৎ করে উঠল কলজে।

প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হয়েছে সোহানার। তবে পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে এখনও। দাঁতে দাঁত চেপে অসহ্য ব্যথা সহ্য করছে আর অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছে কখন ওকে আবিষ্কার করে হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠবে।

রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে ছুটোছুটি করছে ওরা, যথেষ্ট শব্দ করছে নিজেরাই, অন্য কোন শব্দ ওদের কানে ঢুকল না। ব্যথাটা একটু একটু করে কমছে। শব্দ শুনে বুঝতে পারল সোহানা, আরও একটু এগিয়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল জীপটা। উঠে দাঁড়াতে গেল ও, কিন্তু পরমুহূর্তে আতঙ্কের একটা হিম-শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে—পাথরের বিদঘুটে একটা ফাটলে আটকে গেছে ওর হাত। সাবধানে হাতটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল ও, পাথরে লেগে ধাতব শব্দ তুলল হাতে ধরা সাব-মেশিনগানটা, সাথে সাথে হাতটাকে স্থির করে ফেলল ও। আটকে গেছে হাতটা, উঠছে না। এবার খুব সাবধানে নিচের দিকে নামাচ্ছে

হাতটা ও। কোথাও ঠেকছে না সেটা, একেবারে ফাঁকা নিচের দিকটা।

অন্য সময় হলে হাসি পেত সোহানার। সেই বানরটার মত হাস্যকর দশা হয়েছে ওর—সরু-গলার বোতলে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা জলপাই মুঠো করে ধরেছে, তারপর হাতটাকে বের করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, পারছে না কিছুতেই। সাব-মেশিনগানটাকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়, মারাত্মক একটা আওয়াজ হবে। তাহলে উপায়?

ওজনের টানে টন টন করছে হাতটা। নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছে ওর। এই সময় কাছাকাছি থেকে ইংরেজিতে একজন লোক বলল, 'ভুল করেছেন আপনি। আমার পদ্ধতিটাই ঠিক ছিল।' কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল সোহানা—প্রকাণ্ডদেহী বাঙ্কোর। 'আপনার কথা শুনতে গিয়ে একটা জীপ, একটা ট্রাক এবং দু'জন লোককে হারাতে হলো।'

রূঢ় কঠিন গলায় বাঙ্কোর সঙ্গী বলল, 'ছাগলের মত কথা বলো না। ভুল তুমি প্রথম থেকেই করে চলেছ একের পর এক। এরা একদল নিরীহ প্লেন-যাত্রী মাত্র, অথচ চারটে দিন তোমাকে ঠেকিয়ে রেখেছে ব্রিজের ওপারে—এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? বেনো যখন প্লেনটা ল্যান্ড করায় তখন তোমার মাইনে থাকার কথা, অথচ সেখানে তুমি ছিলে না। সবশেষে ট্রাক আর জীপ নিয়ে রওনা হলে বটে, কিন্তু বিপদের ব্যাপারে মোটেই সতর্ক ছিলে না—এবং তার পরিণতি হলো···যাই হোক, এখন থেকে দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছি আমি, যা বলব শুধু তাই করে যাবে তুমি।' কথা শেষ করে হন হন করে হেঁটে চলে গেল সেক্রেটারি। অলস ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করল বাঙ্কো।

দুঃখে, নিজের উপর রাগে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা। শত্রুদের দুই মাথাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছুই করতে পারল না ও।

অসহায় ভাবে শুয়ে শত্রুদের তৎপরতা দেখছে ও। আগুনে বিধ্বস্ত ট্রাকটার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধল ওরা জীপটাকে। জীপটা পিছিয়ে আসছে, টেনে আনছে ট্রাকটাকে। রাস্তা থেকে সেটাকে সরিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে এল সেক্রেটারির জীপটা। এবার আগুনে পোড়া অবশিষ্ট গাড়ি আর ড্রামটাকে সরাচ্ছে ওরা।

ওরা যেখানে কাজ করছে সেখান থেকে ছয় গজ দূরে শুয়ে আছে সোহানা। দু'ঘন্টা লাগল রাস্তাটা পরিষ্কার করতে। কিন্তু সোহানার মনে হলো দুই যুগ ধরে ঠায় এই জায়গায় শুয়ে আছে ও।

মিস জুডি এবং সিনর বরগুয়িজকে রাস্তায় পেয়েছে ওরা, তখনও পৌঁছুতে পারেননি খনির কাছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার পর মুখ শুকিয়ে গেছে বৃদ্ধ রাজনীতিকের, গম্ভীর হয়ে গেছেন তিনি, একটা কথাও বলেননি কারও সাথে। কিন্তু মিস জুডি থোড়াই পরোয়া করেন এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা গা-ঢাকা দিয়ে থেকো, সামনে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলব আমি। বোঝাবার চেষ্টা করে দেখব, কাজ না হলে কি আর [illegible] না হয় মেরেই ফেলবে, তার বেশি তো আর কিছু নয়।'

কেউ ভাল করে কান দেয়নি তাঁর কথায়। সবাই যে যার নিজের চিন্তায় বুঁদ

হয়ে আছে। জীবনের অবসান একটা অবধারিত ঘটনা, কিন্তু কেউ অকালে মরতে চায় না। অথচ, জানে ওরা, সময় না হতেই অন্যায়ভাবে, গায়ের জোরে মেরে ফেলা হচ্ছে ওদেরকে। একটা অভিমান, একটা ক্ষোভ, একটা অক্ষম রাগ অনুভব করছে সবাই, কিন্তু এর বিরুদ্ধে করার কিছু নেই কারও।

ওদেরকে খানিকটা পিছনে রেখে দ্রুত উঠে এসেছে মাইনের কাছে রবিন আর বেনেদেতা। কেবিন তিনটের সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল ওরা।

'এখানে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ঠেকানো অসম্ভব,' বলল বেনেদেতা।

'তবু দেখা যাক কি করা যায়।'

একটা কেবিনে ঢুকে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক তাকাল রবিন। কাঠের দেয়াল ছুঁয়ে দেখল—কাগজের মত ফুটো করে ঢুকবে বুলেট, সন্দেহ নেই—ভাবছে ও। এখানে আশ্রয় নেবার কোন মানেই হয় না, তারচেয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়া অনেক ভাল। খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা লেগে মরতে হলেও এখানে থাকবে না সে। বেনেদেতা চিৎকার করছে শুনে ছুটে বেরিয়ে এল ও কেবিন থেকে।

একটা কাগজ মেলে ধরে কি যেন পড়ার চেষ্টা করছে বেনেদেতা ম্যাচ জেলে। উত্তেজিতভাবে রবিনের দিকে তাকাল সে, বলল, 'রানা রেখে গেছে এটা—লিখেছে, আমাদের জন্যে একটা টানেল বেছে রেখে গেছে ওরা।'

এক দৌড়ে বেনেদেতার পাশে চলে এল রবিন। 'কোথায়?' ছোঁ মেরে কাগজটা কেড়ে নিল বেনেদেতার হাত থেকে ও। কাগজে আঁকা স্কেচটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ তুলল, হাত দিয়ে দেখাল একটা দিক, বলল, 'ওদিকে। এসো।'

রানা আর লোপেজের তৈরি পাথরের নিচু দেয়াল আর টানেলটা দেখতে পেল ওরা। 'আহামরি কিছু নয়, তবে আশ্রয় তো বটে।' টানেলের ভিতর অন্ধকারে চোখ রেখে বলল রবিন। 'সবাইকে এখানে নিয়ে এসো তুমি, ভিতরের অবস্থাটা দেখতে যাচ্ছি আমি।'

সবাই এসে পৌঁছুল, ইতিমধ্যে টানেলটা পরীক্ষা করা হয়ে গেছে রবিনের। 'এটা থেকে বেরুবার আর কোন পথ নেই,' বলল ও। 'এখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টা করব আমরা।' বেল্ট থেকে টেনে একটা পিস্তল বের করল ও। 'লোপেজের পিস্তলটা এখনও রয়েছে—কিন্তু বুলেট আছে মাত্র একটা।' বেনেদেতার হাতের দিকে তাকাল ও। 'কি ওগুলো?'

'লোপেজ কিছু খাবার রেখে গেছে আমাদের জন্যে,' বলল বেনেদেতা। 'দুপুরের জন্যে যথেষ্ট।'

'তবে, ক্ষুধায় মরব না আমরা,' ব্যঙ্গের সুরে বলল কোনালি।

অকস্মাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরল জনসন, 'ফর গডস সেক, ওভাবে কথা বলো না!'

'দুঃখিত,' বলল কোনালি।

'সোহানাদি তাহালে মারা গেচে!'

চোখের পাতা ভিজে উঠল গিলটি মিয়ার।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। শুধু মিস জুডি হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে

এলেন। ঝুঁকে পড়ে চামড়া ঝুলে পড়া একটা হাত রাখলেন গিলটি মিয়ার কাঁধে। 'শান্ত হও, ভাই। না জেনে অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই। তুমি তাকে মরতে দেখেছ?' একে একে সব দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'তোমরা কেউ তাকে মরতে দেখেছ?'

কেউ দেখেনি।

'তবেই ভেবে দেখো,' গিলটি মিয়াকে বললেন তিনি। 'মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ তুমি।'

একটু যেন লজ্জা পেল গিলটি মিয়া। দূরে পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পাথরের দেয়ালটার পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল রবিন। পিস্তলটা রাখল পাশে। এখান থেকে অন্তত একজনকে খুন করব আমি, ভাবছে সে। আসুক শালারা!

একটু পর তুষার ঝরতে শুরু করল।

হাতটা ঢিল করে দিয়ে সাব-মেশিনগানটা ছেড়ে দিল সোহানা। খটাস্ করে পাথরের উপর পড়ল সেটা। ফাটল থেকে হাতটা তুলতে এবার কোন অসুবিধে হলো না ওর। উঠে বসে ম্যাসেজ করতে শুরু করল সেটা।

রাস্তা পরিষ্কার করে ক্যাম্পের দিকে উঠে গেছে সেক্রেটারির জীপটা। আরও তিনটে ট্রাক গেছে সেটার পিছু পিছু। তবে ইঞ্জিন বন্ধ হবার শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছে ও, ক্যাম্পের একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িগুলো, এখনও রওনা হয়নি মাইনের দিকে।

ফাটলের নিচে থেকে ক্রস বো-র সাহায্যে সাব-মেশিনগানটাকে উদ্ধার করতে ঝাড়া দশ মিনিট লেগে গেল ওর। রাস্তা ছেড়ে ঘুরপথ ধরে এগোচ্ছে ও, ক্যাম্প ছাড়িয়ে খানিকটা উঠে আবার রাস্তায় ওঠার জন্যে দিক বদল করল।

ত্রিশ গজ দূর থেকে রাস্তার উপর দাঁড়ানো ট্রাকগুলোকে দেখতে পেল ও। সেগুলোয় লোকজন চড়ছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। তবে লক্ষ্য করল একটা ট্রাকে চড়ছে না কেউ।

সেক্রেটারি লোকটা বসে আছে তার জীপে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ড্রাইভার ছেড়ে দিল এবার সেটা। জীপটাকে অনুসরণ করছে দুটো ট্রাক।

কোন গার্ড আছে কিনা দেখতে পাচ্ছে না সোহানা। ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সেদিক থেকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ও।

রাস্তায় উঠে একবার থামল সোহানা। এখনও ক্যাম্পের দিক থেকে কেউ আসছে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দ্রুত রাস্তা পেরোচ্ছে ও। ট্রাকের পিছন দিকে চলে এসে সামনে তাকাতে যাবে, এই সময় ধাক্কা খেল লোকটার সাথে। পিছু হটে বেরিয়ে এসেছে সে ট্রাকের আড়াল থেকে।

দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করল লোকটা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ তুলল। সোহানাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। হাতের দুটো অস্ত্রই ছেড়ে দিয়েছে সোহানা, কোমরের বেল্ট থেকে ঝট্ করে টেনে নিল চওড়া পাতের ছোরাটা। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠছে লোকটা, চিৎকার করতে যাচ্ছে, ঘ্যাচ করে ঠিক

তার ব্রেস্টবোনের নিচে ঢুকে গেল ছোরাটা। ছোরাটা যখন ঢুকছে, হাতল ধরে উপরের দিকে ঠেলে দিল সোহানা যথাসম্ভব। ঢেকুর তোলার ভঙ্গিতে অদ্ভুতভাবে দু'বার কেশে উঠল লোকটা, সোহানার বাহুর উপর ঢলে পড়ল। ধীরে ধীরে রাস্তার উপর নামিয়ে দিল লোকটাকে সোহানা। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে মারা গেল সে।

হাঁপাচ্ছে সোহানা। ঝুঁকে পড়ে টান দিয়ে বের করে নিল ছোরাটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে এসে কনুই পর্যন্ত হাতটা ভিজিয়ে দিল ওর। সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, কান দুটো সজাগ। তারপর সাব-মেশিনগানটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ট্রাকের সামনের দিকে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ও। সামনে চোখ রেখে স্টার্ট দিল, পরমুহূর্তে ছেড়ে দিল ট্রাক।

মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে সোহানার। অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন লোককে খুন করেছে ও। অথচ, ভাবছে ও, তাতে সত্যিকার কোন লাভ এখনও হয়নি। বাঙ্কো এবং সেক্রেটারি এই দু'জন এখন লক্ষ্য ওর।

একটু পর হেডলাইটের সুইচ অফ করে দিল ও। ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না। মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ট্রাক, বারবার এদিক ওদিক কাত হয়ে যাচ্ছে, মুঠোয় ধরা জ্যান্ত মাছের মত ছটফট করছে স্টিয়ারিং হুইলটা।

অনেকক্ষণ পর একটা বাঁক নেবার সময় পরবর্তী বাঁকে একজোড়া লাল আলো দেখল ও। সাথে সাথে স্পীড আরও কমিয়ে আনল। রাস্তায় কিছু করার নেই ওর, মাইন-এ পৌঁছে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। পাশের সীটে পড়ে থাকা সাব-মেশিনগানটার উপর একটা হাত রাখল ও। মাথাটা হালকা লাগছে এখন।

শেষ বাঁকটা দেখা যাচ্ছে সামনে। যতদূর মনে পড়ছে ওর, এরপরই সমতল খনি এলাকা। ব্রেক কষে রাস্তার ধারে থামাল ট্রাক। স্টার্ট বন্ধ না করেই সাব-মেশিনগানটা তুলে নিয়ে নেমে পড়ল লাফ দিয়ে নিচে। পায়ের ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখটা। পা টেনে টেনে উঠতে শুরু করল রাস্তা ধরে সামনের দিকে। শুনতে পাচ্ছে, এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনগুলো। রাস্তা ছেড়ে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আরও একটু এগিয়ে থামল ও, উঁকি দিয়ে তাকাল প্রশস্ত সমতল জায়গাটার দিকে।

কেবিনগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক দুটো। লোকজন ঢুকছে কেবিনে, বেরুচ্ছে। অত্যন্ত ধীরে গতিতে এগোতে শুরু করল জীপটা। কুয়াশা ভেদ করে পাহাড়ের গোড়ায় আলো ফেলছে। অন্ধকার একটা টানেলের মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর আরেকটা। পরমুহূর্তে, তৃতীয় টানেলের দিকে আলো পড়তেই বিজয়ের উল্লাসে হৈ-চৈ শুরু করে দিল শত্রুরা। হেড লাইটের আলো টানেলের দিক থেকে স্যাঁৎ করে সরে যাবার আগেই ফর্সা একটা মুখ দেখতে পেয়েছে সোহানা। পাথরের দেয়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল লোকটা, চোখে আলো পড়তেই সরিয়ে নিল মাথাটা। রবিনকে চিনতে অসুবিধে হয়নি সোহানার।

পা টেনে টেনে ট্রাকের কাছে ফিরে এল সোহানা। গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল সেটা। মরিয়া হয়ে একটা কিছু করার সময় হয়েছে এখন।

নয়

জ্ঞান ফিরেছে রানার, কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা এখনও দূর হয়নি। একবার চোখ মেলেই পাতা দুটো বুজে ফেলেছিল ও, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। তন্দ্রার ঘোরে এখন ভাবছে, কি একটা জরুরী কাজ রয়েছে ওর, যেভাবে হোক পুরোপুরি জেগে উঠতে হবে তাকে। সময় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে হোক থামিয়ে দিতে হবে ঘড়ির কাঁটাকে।

নড়ছে রানা, প্রতিবাদের সুরে কি যেন বিড়বিড় করছে। কপাল থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছে একজন নার্স, কিন্তু ঘুম ভাঙাচ্ছে না ওর।

একসময় চোখ মেলে আবার তাকাল রানা। সিলিংটা ধবধবে সাদা। ক্রমশ নিচে নামছে সাদা দেয়াল বেয়ে চোখের দৃষ্টি। দেয়ালটাও সাদা। সাদা পোশাক পরা নার্সের চোখে চোখ রাখল ও। প্রথমেই জানতে চাইল, 'লোপেজ···কোথায় সে?'

'কথা নয়,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল নার্স। 'চুপ করে শুয়ে থাকুন।' হাসছে সে। 'আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।' টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

উঠে বসতে গিয়ে পারল না রানা, অসম্ভব ভারী লাগছে শরীরটা। একটা পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ব্যান্ডেজে মোড়া, পা-টা নাড়তে পারছে ও, কিন্তু ভাঁজ করতে পারছে না। কোথায় লোপেজ, কেমন আছে সে? ঘুরে ফিরে এই কথাটা আসছে মনে। তারপরই হঠাৎ যেন চোখ খুলে গেল ওর, এক নিমেষে মনে পড়ে গেল সব কথা। সোহানা, গিলটি মিয়া, মিস জুডি—ওদের সবাইকে ব্রিজের কাছে রেখে পাহাড় টপকাবার অসম্ভব একটা চেষ্টা করেছিল ওরা, কেন তাও মনে পড়ল।

ডাক্তার নয়, এক বাটি সুপ নিয়ে আবার ফিরে এল নার্স। চামচ দিয়ে সবটুকু খাওয়াল ওকে। শক্তি ফিরে আসছে শরীরে, টের পাচ্ছে রানা, সুস্থ বোধ করছে এখন। 'আমার সাথে একজন লোক ছিল—কোথায় সে?'

'এখানেই আছেন তিনি,' বলে আবার চলে গেল নার্স।

আরও অনেক পর সাদা কোট পরা একজন প্রবীণ লোক ঢুকলেন কেবিনে। 'কেমন আছেন, মি. রানা?'

পেশীগুলো ঢিল হয়ে গেল রানার। ভদ্রলোক একজন আমেরিকান।

'আমার নাম জানলেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনার পকেট থেকে বাংলাদেশের একটা পাসপোর্ট পেয়েছি,' বললেন ভদ্রলোক। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমি গুন্থার—ডাক্তার গুন্থার।'

'ডাক্তার গুন্থার,' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল রানা, 'এই মুহূর্তে এখান থেকে রওনা হতে চাই আমি। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারবেন? এটা তো একটা

হাসপাতাল, তাই না? কোন্ জায়গায়?'

'সান অ্যান্টোনিয়ো মিশন এটা,' গুন্থার বললেন। 'এখানকার চীফ আমি, একজন প্রেসবিটেরিয়ান।'

'আলটিমিরোসের কাছাকাছি কোথাও?'

'আলটিমিরোস এখান থেকে দু'মাইল দূরে,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ডাক্তার গুন্থার। 'কিন্তু আপনি অসুস্থ, তাছাড়া···যাই হোক, এই মুহূর্তে বিছানা থেকে ওঠার অনুমতি দিতে পারি না আমি আপনাকে।'

'দুটো মেসেজ পাঠাতে চাই আমি,' দ্রুত বলল রানা। 'একটা কর্নেল কডরিগুয়েজের কাছে। আরেকটা আলটিমিরোসের একজন মিলিওনেয়ার সিনর গুয়েগেরার কাছে···'

'সেসব পরে হবে,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ডাক্তার গুন্থার, 'তার আগে আমি জানতে চাই একজন লোককে কাঁধে নিয়ে আরেকজন লোক পৃথিবীর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ছাদ টপকাবার অবাস্তব চেষ্টা কোন্ সাহসে, কি উদ্দেশ্যে করে?'

'লোপেজ আমাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে?' চোখ কপালে উঠে গেল রানার। 'কেমন আছে সে?'

'সিনর লোপেজ নন, আপনিই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছেন,' বললেন ডাক্তার গুন্থার। 'এবং এখন বুঝতে পারছি, উন্মাদ অবস্থায় কাজটা করেছেন আপনি। কেন?'

'লোপেজ···'

'তার চিকিৎসা চলছে। কেন?'

দ্রুত ভাবছে রানা। একজন আমেরিকান, একজন প্রেসবিটেরিয়ান ডাক্তার—একে বিশ্বাস করে সব কথা বলা যেতে পারে। সময় বাঁচাতে হলে এছাড়া কোন উপায়ও নেই। দ্রুত সাহায্য দরকার ওর। 'শুনুন, বলছি।'

শুরু করল রানা। নিঃশব্দে শুনে গেলেন ডাক্তার গুন্থার, বাধা দিলেন না বা কোন মন্তব্য করলেন না, শুধু অবিশ্বাসে কুঁচকে উঠল তাঁর ভুরু জোড়া।

বিপদ এবং সমস্যার কথাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে সবশেষে বলল রানা, 'ওদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকানও রয়েছেন। ওদেরকে বাঁচাতে হলে আপনার সাহায্য দরকার। এই মুহূর্তে···'

'জীবনে এমন অসম্ভব কাহিনী শুনিনি আমি,' বললেন ডাক্তার গুন্থার। 'আপনার গল্প বিশ্বাস করার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি, কাছাকাছি একটা এয়ারবেস থেকে ফোন করা হয়েছে আমাকে—আপনাকে খুঁজছে তারা। তাছাড়া, আপনার পকেট থেকে এটা পাওয়া গেছে,' পকেট থেকে বেনোর পিস্তলটা বের করে দেখাল সে রানাকে। 'সঙ্গে ফায়ারআর্মস রাখে যারা তাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধর্মে নিষেধ আছে।' একটু থেমে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'যাই হোক, বলুন দেখি, কর্ডিলেরান মিলিটারি আপনার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন?'

'সেনাবাহিনীর একটা অংশ সন্ত্রাসবাদীদেরকে সাহায্য করছে,' বলল রানা। 'আমার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিল লোকটা কে, নাম কি তার? কর্নেল কডরিগুয়েজ?'

'না। একজন জুনিয়ার অফিসার। আপনি কর্নেল কডরিগুয়েজকে চেনেন?'

'চিনি না, তবে তাকেই আমার সবচেয়ে আগে দরকার। সিনর বরগুয়িজের বন্ধু সে। ফোরটিন স্কোয়াড্রন কি এখনও এয়ার ফিল্ডে আছে, আপনি জানেন কিছু?'

'জানি না,' বললেন ডাক্তার গুস্তার। 'মুভ করার ব্যাপারে কি যেন বলছিল বটে কডরিগুয়েজ, কিন্তু মনে নেই কথাটা আমার। সে প্রায় এক মাস আগের কথা, তারপর আর দেখা হয়নি তার সাথে আমার।'

পরিস্থিতি গুরুতর, বুঝতে পারছে রানা। যারা খোঁজ নিচ্ছে তারা বন্ধুও হতে পারে, শত্রুও হতে পারে, বোঝার কোন উপায় নেই। এবং বোঝা যাচ্ছে ডাক্তার গুস্তার ওকে তাদের হাতে তুলে দেবার অপেক্ষায় আছে।

অস্থিরভাবে বিছানার উপর উঠে বসল রানা। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওর। 'প্লীজ, ডক্টর। আপনি সাহায্য না করুন, আমাকে অন্তত চলে যেতে দিন এখান থেকে...'

'আমি তা পারি না,' রানার কাঁধ ধরে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করছেন ডাক্তার গুস্তার। কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। 'পরিস্থিতি এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ, এর ওপর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে মিশনটা বন্ধ করার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

ডাক্তারের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষমতা দখল করলে পরিস্থিতি কি ভাল হবে বলে মনে করেন আপনি?' ডাক্তারের বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করল ও। বলল, 'আপনার ধর্ম কি বলে? মাত্র পনেরো মাইল দূরে একদল নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে, তা জেনেও কি আপনার ধর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে বলে?'

চোখ কুঁচকে উঠল ডাক্তার গুস্তারের। খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু আমি বুঝব কিভাবে যে আপনি সত্যি কথা বলছেন?'

'আমি একজন বিদেশী,' বলল রানা। 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অ্যান্ডেজ টপকে এসে আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমার?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে ডাক্তার গুস্তারকে। 'সিনর গুয়েগেরার কাছে মেসেজ পাঠাতে চান আপনি?' অবশেষে জানতে চাইলেন তিনি!

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সিনর বরগুয়িজের বন্ধু তিনি।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত হয়ে বললেন গুস্তার। 'সে তো আমারও দাবা খেলার সাথী।'

আশার আলো দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানা। 'সুতরাং, সত্য-মিথ্যে যাচাই করতে এখন আর কোন অসুবিধে নেই আপনার, তাই না? আমার অনুরোধ, সবচেয়ে আগে দয়া করে আপনি খোঁজ নিন এয়ারফিল্ডে এখন কত নম্বর স্কোয়াড্রন রয়েছে। তারপর ফোন করুন সিনর গুয়েগেরাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন ডাক্তার। 'তার আগে অত্যন্ত দুঃখের সাথে একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি আপনাকে। সিনর লোপেজের ডান হাতটা কেটে ফেলে দিতে হয়েছে। পুরো হাতটা ফ্রস্ট-বাইটে আক্রান্ত হয়েছিল। এখনও অজ্ঞান।'

উদ্বেগে বিকৃত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর, 'বাঁচবে তো?'

'ডাক্তাররা কখনও হাল ছাড়ে না,' বললেন গুস্তার। 'তবে অবস্থা সিরিয়াস।

বুকের পাঁজরও ফেলে দিতে হবে কয়েকটা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার গুন্থার।

নিজের চেম্বারে ফিরে এসে রিভলভিং চেয়ারে বসলেন ডাক্তার গুন্থার। টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতেই নিরাশ হতে হলো তাঁকে—ডেড, কোন সাড়া শব্দ নেই। ঠিক সেই সময় উঠান থেকে ভেসে এল একটা গাড়ির অকস্মাৎ ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা জীপ, তার পিছনে একটা মিলিটারি অ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে উঠানে। জীপ থেকে লাফিয়ে নামছে স্টেনগানধারী সোলজার। সামনের সীট থেকে একজন অফিসারকে নামতে দেখা যাচ্ছে। দ্রুত গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলছে সৈনিকরা।

গম্ভীর হয়ে উঠল ডাক্তার গুন্থারের চেহারা। চিন্তিত ভাবে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন তিনি।

একটু পরই ইউনিফর্ম পরা সামরিক অফিসার, একজন মেজর দৃঢ় পায়ে ঢুকল চেম্বারে। 'ডাক্তার গুন্থার?'

ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকালেন গুন্থার। 'ইয়েস, মেজর।'

'মেজর পেদ্রো অ্যাট ইওর সার্ভিস,' সহাস্যে বলল মেজর পেদ্রো। ডেস্কে হাত রেখে ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'আপনার এখানে দু'জন আহত লোক পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বলে খবর পেয়েছি আমরা। আরও ভাল চিকিৎসার জন্যে ওদেরকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। এয়ারফিল্ডের হাসপাতালে যাচ্ছে ওরা। অ্যামবুলেন্স অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।'

'আরও ভাল চিকিৎসা?' ভুরু কুঁচকে বললেন গুন্থার। 'এয়ারফিল্ডের হাসপাতালে কিভাবে তা সম্ভব? আমার এই পেশেন্টদের চিকিৎসার জন্যে যে-সব সুযোগ সুবিধে দরকার তার কোন অভাব নেই এখানে, বরং এয়ারফিল্ডের হাসপাতালেই সাজ-সরঞ্জামের অভাব আছে। দুঃখিত, মেজর। আমার পেশেন্টদের অবস্থা খুবই খারাপ, এই অবস্থায় ওদেরকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

হাসিটা মুছে ফেলল মেজর পেদ্রো। 'কিন্তু উপায় নেই, ডক্টর। আমার ওপর নির্দেশ আছে, ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে।'

'অসম্ভব! ওদেরকে এখন কোন মতেই নাড়াচাড়া করা যাবে না—যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে অ্যামবুলেন্স থেকে আপনার ডাক্তারকে ডেকে এনে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন—তিনিও তাই বলবেন।'

'করপোরাল!' দরজার দিকে ফিরে হুঙ্কার ছাড়ল মেজর পেদ্রো। সাথে সাথে ইউনিফর্ম পরা একজন স্টেনগানধারী করপোরাল ঢুকল চেম্বারে। ডাক্তারকে দেখিয়ে পেদ্রো বলল, 'ডক্টর গুন্থারকে পথ দেখিয়ে জীপের কাছে নিয়ে যাও।'

'তার মানে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

কাঁধ ঝাঁকাল মেজর। 'কর্নেল পোয়ালোর অর্ডার, আপনি অসহযোগিতা করলে আপনাকে গ্রেফতার করতে হবে।'

রাগে কাঁপছেন ডাক্তার। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে অতি কষ্টে

নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। 'কর্নেল পোয়ালোকে আমি চিনি না, কিন্তু জানতে চাই তার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমার পেশেন্টদের মধ্যে একজন বিদেশী রয়েছেন। আপনারা যা করতে চাইছেন তা অমানবিক, এর ফলে একটা আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবে…'

'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন,' ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে বলল মেজর পেদ্রো। করপোরালের দিকে ফিরে আবার কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কেউ যদি অপমানিত হতে চায়…'

অবস্থা বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিলেন ডাক্তার গুন্থার। বললেন, 'ঠিক আছে, ডেকে পাঠান আপনাদের ডাক্তারকে, দেখি তাকে বুঝিয়ে পারা যায় কি না।'

'সাথে ডাক্তার আনিনি,' বলল মেজর পেদ্রো।

'ডাক্তার আনেননি?' প্রায় চমকে উঠলেন গুন্থার। 'তাহলে কার হাতে তুলে দেব আমার মুমূর্ষু পেশেন্টদেরকে?' কঠোর হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। 'মেজর পেদ্রো, আপনি আপনার কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছেন বলে মনে হয়। পেশেন্টদের দায়িত্ব নেবার জন্যে উপযুক্ত একজন ডাক্তারকে সাথে করে আনেননি বলে জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'ওদের সাথে এয়ারফিল্ডে আমিই যেতাম, কিন্তু আমার সময় নেই—আমি একজন ব্যস্ত মানুষ।'

একটু ইতস্তত করে মেজর পেদ্রো বলল, 'আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'পারলে করুন,' বললেন ডাক্তার। 'যা রীতি, আজও কাজ করছে না ওটা।'

কিন্তু মুচকি হেসে ক্র্যাডল থেকে রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করল মেজর পেদ্রো। উত্তরও পাচ্ছে সে। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার গুন্থার। তার মানে ভাবছেন তিনি, ব্যাপারটা পূর্ব পরিকল্পিত! টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সামরিক বাহিনীর লোকেরা দখল করে রেখেছে নাকি!

রিসিভার নামিয়ে রেখে খল খল করে হাসল মেজর পেদ্রো। বলল, 'আমার কমান্ডিং অফিসার বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন এই লোক দু'জন দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। এদেরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। কোথায় তারা?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার গুন্থার।

'কোথায়?' কদর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মেজর।

দরজার দিকে এগোলেন ডাক্তার, করিডরে বেরিয়ে এসে রানার কেবিনের সামনে দাঁড়ালেন এবং রানা যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে বললেন, 'গায়ের জোরে আমার পেশেন্টদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এই মিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার মিলিটারির নেই। মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে আমি কর্ডিলেরান সরকারের কাছে এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাইব—কথাটা আপনার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল পোয়ালোকে জানিয়ে দেবেন।'

'কোথায় তারা?' করিডরে পা ঠুকে জানতে চাইল মেজর পেদ্রো।

'এইমাত্র অপারেশন করেছি একজনের—এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার। আমার দ্বিতীয় পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ, তাকে আমি একটা সিডেটিভ দিতে চাই। এখানে দাঁড়ান, সার্জারি থেকে মরফিন নিয়ে আসি আমি।' উত্তপ্ত মেজরকে রাগে ফেটে পড়ার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

চেটেপুটে প্লেটটা সাফ করছে রানা, এমন স্বাদের খাওয়া জীবনে কখনও জোটেনি যেন কপালে, এই সময় ডাক্তারের উঁচু গলা শুনতে পেল ও। চট্ করে বুঝে নিল, কোথাও কোন বিপত্তি দেখা দিয়েছে এবং সে যতটা অসুস্থ তার চেয়ে তাকে বেশি অসুস্থ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন ডাক্তার। দ্রুত বেডের নিচে ট্রেটা নামিয়ে রাখল ও। দরজা খুলে ওরা যখন কেবিনে ঢুকল, ও তখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো বন্ধ। ডাক্তার গুন্থার ওর গায়ে হাত দিতেই মৃদু কাতরে উঠল ও।

'মি. রানা,' ডাক্তার রানার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মেজর পেদ্রো কর্নেল পোয়ালোর হুকুমে আপনাদেরকে এয়ারফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে আমার সম্মতি নেই। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে আমি কথা বলব। এখন আপনাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি আমি, যাতে পথ-কষ্টটা লাঘব হয়।' হাইপডারমিক সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে নিয়ে এসেছেন তিনি, রানার শার্টের আস্তিন গুটিয়ে দিয়ে তৈরি হলেন ইঞ্জেকশনটা পুশ করার জন্যে। তারপর রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'এটা একটা স্টিমুল্যান্ট।'

'কি বললেন?' সন্দেহে তড়পে উঠল মেজর পেদ্রো।

'কই কি বললাম!' ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার গুন্থার। 'দেখুন, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। শুধু একজন মার্কিন নাগরিক নই আমি, সেই সাথে একজন ডাক্তারও। আমার কাজে নাক গলাচ্ছেন, এর জন্যে এ-দেশের সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে প্রতি বছর সাহায্য এবং দান হিসেবে কত টাকা আমার দেশ দেয় আপনাদেরকে? জানেন, আপনার এবং আপনার কমান্ডিং অফিসারের বেতন কোত্থেকে আসে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেজরের চেহারা। 'এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। আমি হুকুম পালন করছি মাত্র।' দরজার দিকে তাকাল সে, বলল, 'করপোরাল, স্ট্রেচার।'

দু'জন সৈনিক স্ট্রেচার নিয়ে ঢুকল কেবিনে। ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে আছে রানা, ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তোলা হলো ওকে। 'নিয়ে যাও এবার,' বললেন ডাক্তার গুন্থার। এক পা পিছিয়ে ইচ্ছে করেই পানি ভর্তি বালতিটায় ধাক্কা খেলেন তিনি। প্রচণ্ড শব্দ হলো বালতিটা উল্টে পড়ায়। পানির স্রোত থেকে পা বাঁচাবার জন্যে সরে যাচ্ছে মেজর পেদ্রো, সবার সাথে সে-ও তাকিয়ে আছে বালতিটার দিকে, গড়িয়ে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে সেটা। এই সুযোগে রানার বালিশের নিচে কি যেন দ্রুত গুঁজে দিলেন ডাক্তার গুন্থার।

অ্যামবুলেন্সে তোলা হয়েছে স্ট্রেচার। ইউনিফর্ম পরা লোকেরা অপেক্ষা করছে নিচে, এখনও নিয়ে আসা হয়নি লোপেজকে। ধীরে ধীরে একটা চোখ মেলে তাকাল রানা। কেউ লক্ষ্য করছে না ওকে। বালিশের নিচে হাত ঢোকাতেই পিস্তলের বাঁট

ঠেকল আঙুলে। ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল মনটা। বাঁট ধরে পিস্তলটা বের করে নিল ও, বালিশের নিচে থেকে নাভির কাছে পা'জামার ফিতের সাথে আটকে রাখল, তারপর চাদর দিয়ে ঢেকে দিল সেটাকে।

আরেকটা স্ট্রেচার তোলা হলো অ্যামবুলেন্সে। ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। গলার নিচ থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সাদা ব্যান্ডেজে মুড়ে রাখা হয়েছে লোপেজকে। ডান হাতটা বগলের নিচ থেকে নেই। এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি তার। মুখটা রক্তশূন্য, বিন্দু বিন্দু ঘামে ভর্তি।

স্টার্ট নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে অ্যামবুলেন্স। চোখ বুজল রানা। ঘুম নয়, সারা শরীরে আশ্চর্য একটা জাগরণ অনুভব করছে ও।

বেশ অনেকক্ষণ পর গতি মন্থর হলো অ্যামবুলেন্সের। চোখ মেলে রানা দেখল লোহার একটা প্রকাণ্ড গেটের ভিতর ঢুকছে গাড়িটা। কংক্রিটের উঠানে বিশাল একটা সাইনবোর্ড দেখল ও। তাতে আঁকা রয়েছে রঙিন একটা ছবি। তুষার মোড়া একটা পাহাড় শৃঙ্গের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা ফাইটার প্লেন। ছবিটার নিচে সোনালী হরফে লেখা রয়েছে: ESQUADRON OCTAVO.

ধীরে ধীরে চোখ বুজল রানা। শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে! ভাবছে ও। এটা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থক এইটথ স্কোয়াড্রন।

দশ

অ্যামবুলেন্স চলে যাবার পর সাদা কোট খুলে জ্যাকেট পরলেন ডাক্তার গুস্তাব, দেরাজ থেকে গাড়ির চাবি নিলেন, তারপর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে এগোলেন গ্যারেজের দিকে। কিন্তু করিডরেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। দেখলেন ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক কাঁধের সাথে স্ট্র্যাপে ঝোলানো স্টেনগান নিয়ে টহল দিচ্ছে। 'এখানে কি করছ তুমি?'

'পাহারা দিচ্ছি,' বলল লোকটা।

'পাহারা দিচ্ছ? কি পাহারা দিচ্ছ?'

অপ্রতিভ দেখাল লোকটাকে। 'তা তো জানি না,' বলল সে। 'মেজর এখানে ডিউটি দিতে বলেছেন, তাই দিচ্ছি। সন্দেহজনক কিছু ঘটতে দেখলে বাধা দিতে বলে গেছেন—এর বেশি কিছু জানি না আমি। আপনি বরং করপোরালকে জিজ্ঞেস করুন—গেটেই পাবেন তাকে।'

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন ডাক্তার। দ্রুত উঠানে নেমে এলেন। দেখলেন গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন স্টেনগানধারী। গেটের দিকে তাকালেন তিনি, একজন সৈনিকের সাথে কথা শেষ করে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে দীর্ঘদেহী করপোরাল।

'এসব কি?' ফুঁসে উঠলেন ডাক্তার। 'আমার মিশনটাকে কি তোমরা সামরিক

ঘাঁটি বানাতে চাও?'

'দুঃখিত,' বলল করপোরাল। 'আমরা কর্তৃপক্ষের হুকুম পালন করছি মাত্র।' ডাক্তারের হাতে গাড়ির চাবির দিকে তাকাল সে। 'মেজরের নির্দেশ, এই হাসপাতাল থেকে কেউ যেন বাইরে বেরুতে না পারে।'

'তোমার মেজরের নিকুচি করি আমি!' চরকির মত আধপাক ঘুরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন ডাক্তার, সোজা নিজের চেম্বারে ফিরে এসে ক্র্যাডল থেকে তুলে নিলেন রিসিভারটা। সেটটা এখনও ডেড, কিন্তু 'কর্নেল পোয়ালোকে চাই আমি,' বলতেই কি এক যাদুমন্ত্রে জ্যান্ত হয়ে উঠল টেলিফোন, অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল, 'একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ। আপনি কে বলছেন?'

পনেরো মিনিট পর লাইনের অপর প্রান্তে এল কর্নেল পোয়ালো।

'গুস্থার বলছি,' কঠিন সুরে বললেন ডাক্তার। 'জানতে পারি, কি উদ্দেশ্যে আমার মিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?'

'না তো!' হাসি হাসি কৌতুকের সুরে বলল কর্নেল পোয়ালো। 'আপনি ভুল বুঝেছেন, ডক্টর। যে-কেউ ঢুকতে পারে ওখানে।'

'কিন্তু আপনার লোকেরা আমাকে বেরুতে দিচ্ছে না।'

'বেরুবার দরকারটা কি? হাসপাতালের ভিতরে থেকেই ডাক্তারী করুন না।'

'কি বলতে চান? রেলওয়ের ডিপো থেকে ওষুধের চালান আনা দরকার আমার, আপনি তাতে বাধা দিচ্ছেন—ব্যাপারটাকে আমি এইভাবে নিচ্ছি। এটা প্রকাশ হলে আপনার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছেন?'

'আহা, সে কথা আগে বলেননি কেন!' সুর করে বলল কর্নেল পোয়ালো। 'ঠিক আছে, এক্ষুণি একজন লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, সে-ই ডিপো থেকে খালাস করে চালানটা পৌঁছে দেবে আপনার হাসপাতালে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'শুনেছি আপনার হাসপাতালটা খুব ভাল, আপনিও একজন খুব ভাল ডাক্তার। যখন যা সাহায্য লাগে বলবেন আমাকে, সাধ্য মত নিশ্চয়ই করব আমি।' ডাক্তারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝনাৎ করে নামিয়ে রাখল সে রিসিভারটা।

ধীরে ধীরে ডাক্তার গুস্থারও নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছছেন তিনি। ভাবছেন, ভাগ্য ভাল যে রেলওয়ে ডিপোতে সত্যিই ওষুধের একটা চালান এসে পড়ে আছে। কিন্তু এখন কি করা যায়? চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, জানালার পর্দা ফাঁক করে একজন গার্ড তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তার মানে আক্ষরিক অর্থেই নজরবন্দী রাখা হয়েছে তাঁকে।

ধীরে ধীরে রিভলভিং চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। প্যাড আর বলপয়েন্ট পেন টেনে নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করলেন তিনি। আধঘণ্টা ধরে রানার মুখ থেকে শোনা কাহিনীটা সংক্ষেপে হুবহু লিখে কাগজটা ভাঁজ করে একটা এনভেলাপে ভরলেন, তারপর সেটা রেখে দিলেন পকেটে। করিডরে বেরিয়ে আসতেই তাঁর পিছু নিল স্টেনগানধারী সৈনিকটা, তাকে দেখতে না পাবার ভান করে সোজা একের পর এক ওয়ার্ড পেরিয়ে অপারেটিং থিয়েটারের দিকে এগোচ্ছেন তিনি, তাঁর সেকেন্ড ইন কম্যান্ড সানচেজ লোয়াঞ্জাকে খুঁজছেন।

একটা ওয়ার্ডে পাওয়া গেল লোয়াঞ্জাকে, ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সে, 'এসব কি ঘটছে, ডক্টর?'

'স্থানীয় মিলিটারির একটা অংশ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে,' নীরস গলায় বললেন ডাক্তার গুন্থার। 'মিশন থেকে বেরুতে দিচ্ছে না ওরা আমাকে।'

'শুধু আপনাকে নয়, কাউকে বেরুতে দিচ্ছে না,' বলল লোয়াঞ্জা।

'কিন্তু আলটিমিরোসে যেতেই হবে আমাকে। তোমার সাহায্য পাব?' প্যাসেজে, ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে ওদেরকে সৈনিকটা। গলা আরও খাদে নামিয়ে গুন্থার বললেন, 'আমি রাজনীতি বুঝিও না, করিও না—কিন্তু এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি, নিজেকে না জড়িয়ে উপায় নেই। অন্তত নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই আমি। পাহাড়ের ওপারে একটা ম্যাসাকার হতে যাচ্ছে।'

চিন্তিত, গম্ভীর হয়ে উঠল সানচেজ লোয়াঞ্জার চেহারা। 'দিন দুই আগে এইটথ স্কোয়াড্রন এসেছে এয়ারফিল্ডে; সেই থেকে ওদের সম্পর্কে নানান গুজব কানে আসছে,' বলল সে। 'আপনি রাজনীতি না করতে পারেন, ডাক্তার গুন্থার, কিন্তু আমি করি। অবশ্যই আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'চলো, তোমার অফিসে যাই।'

অফিসে এসে বোতামে চাপ দিয়ে একটা এক্স-রে ভিউয়ার অন করলেন ডাক্তার গুন্থার, হাত তুলে একটা এক্স-রে প্লেট দেখালেন লোয়াঞ্জাকে। দরজাটা খুলেই রেখেছেন তিনি। সৈনিকটা করিডরের ওদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে, দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে।

সবকিছু ব্যাখ্যা করে বললেন ডাক্তার সহকারীকে। কি করতে যাচ্ছে বললেন বুঝিয়ে।

তিন মিনিট পর গেটের কাছে করপোরালের সাথে দেখা করলেন তিনি। বললেন, 'সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে এটা চলতে থাকলে আমি কাজ করব কিভাবে?'

'অসুবিধেটা কোথায়?'

'মরণাপন্ন একজন পেশেন্টের এই মুহূর্তে অপারেশন দরকার,' বললেন ডাক্তার গুন্থার। 'অপারেশন থিয়েটারে কেউ থাকলে আমার পক্ষে অপারেশন করা কিভাবে সম্ভব?'

একটু চিন্তা করল করপোরাল, তারপর বলল, 'তাই তো! জানি অপারেশনের সময় বাইরের কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। কামরাটায় দরজা ক'টা? আমি দেখতে পারি?'

'দরজা একটা, কোন জানালা নেই,' বললেন ডাক্তার। 'ইচ্ছে হলে দেখে যাও।'

অপারেটিং থিয়েটারটা পরীক্ষা করে ঘাড় কাত করল করপোরাল, 'ঠিক আছে। দরজার বাইরে দু'জন গার্ড থাকবে শুধু।'

ঢিলেঢালা ভাবে গাউন, ক্যাপ এবং মাস্ক পরে তৈরি হয়ে নিলেন ডাক্তার গুন্থার। স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হলো বুড়ো হিউকে।

'কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল করপোরাল।

'দু'ঘণ্টা—তার বেশিও লাগতে পারে,' বললেন ডাক্তার। 'এটা একটা সিরিয়াস অপারেশন, করপোরাল।'

'ঠিক আছে।'

ভিতরে ঢুকে অপারেটিং থিয়েটারের দরজা বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার। পাঁচ মিনিট পর আবার খুলে গেল দরজা, দু'জন নার্স ঠেলে বের করে আনল খালি স্ট্রেচারটা। আবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগে উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়ে করপোরাল দেখল মাস্ক পরা ডাক্তার অপারেটিং টেবিলের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁর হাতে একটা স্কালপেল দেখা যাচ্ছে। সন্তুষ্ট হয়ে গার্ডদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর রোদ পোহাবার জন্যে চলে গেল করিডর ধরে উঠানের দিকে। কথার তুবড়ি ছুটিয়ে স্ট্রেচারটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নার্স দু'জন, তাদের দিকে তাকালই না সে।

আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়ার্ডের নিরাপদ করিডরে থামল স্ট্রেচারটা, সেটার নিচে থেকে ঝুপ করে মেঝেতে নামলেন ডাক্তার গুস্তার। নার্সরা সহাস্যে এগিয়ে এসে তাঁর হাত এবং পা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। স্ট্রেচারের নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় এতক্ষণ থেকে হাত-পায়ে ব্যথা ধরে গেছে ডাক্তারের। 'এই বয়সে এসব কি পোষায়!' মুচকি হেসে বললেন তিনি।

নার্সরা চলে যেতে দ্রুত পোশাক পাল্টে নিলেন ডাক্তার। তারপর সুইপারদের যাওয়া-আসার পথ ধরে বেরিয়ে এলেন মিশনের বাইরে। প্যাসেজ ধরে সোজা পাহাড়ের কাছে চলে এলেন তিনি, সেখান থেকে কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটলেন আলটিমিরোসের দিকে।

এখনও স্ট্রেচারে ফেলে রাখা হয়েছে রানাকে। হাসপাতালের কোন ওয়ার্ড নয়, একটা অফিস-কামরা এটা, দুটো চেয়ারের মাঝখানে স্ট্রেচারটা রেখে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা বেরিয়ে গেছে। তবে বাইরে তাদের হাসি আর কথার আওয়াজ পাচ্ছে ও। কামরার দেয়ালে ম্যাপ আর পাহাড়ী এলাকার এরিয়াল ফটোগ্রাফ দেখে বুঝতে পারছে, এটা হয়তো একজন কমান্ডিং অফিসারের কামরা। একদিকের পুরো একটা দেয়ালই কাঁচের জানালা, মাথা কাত করে সেদিকে তাকিয়ে এয়ারফিল্ডটাকে দেখছে ও। কন্ট্রোল টাওয়ারের বাইরে অ্যাপ্রন, আরও দূরে কয়েকটা বিশাল চেহারার হ্যাঙ্গার। দাঁড়ানো এয়ার-ক্রাফটগুলোকে চিনতে পেরে জিভ এবং টাকরা সহযোগে 'টক্' করে একটা আওয়াজ করল ও। স্যাবর জেট ওগুলো। সারকারামার মত মনের পর্দায় ভেসে উঠল পাকিস্তান আমলের অনেক স্মৃতি, রিসালপুর বেস, স্পেশাল ট্রেনিং, ডগ ফাইট,...এবং রূপালী পাখির মত স্যাবর জেট। দেখে মনে হচ্ছে এগুলো সেই একই মডেলের স্যাবর। এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটে, তেল পানি যোগাচ্ছে গ্রাউন্ড কর্মীরা...। হঠাৎ ঝট্ করে স্ট্রেচারের উপর উঠে বসল রানা। আরও দ্রুত ভাবছে ও, গ্রাউন্ড কর্মী নয়, ওরা গোলন্দাজ বাহিনীর লোকজন! প্লেনগুলোর ডানার নিচে রকেট ঢোকানো হচ্ছে। কামানের শেলগুলো দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু প্লেনগুলোকে যে

আক্রমণের জন্যে তৈরি করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই।

গড! মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে আর ভাবছে রানা। এয়ার অ্যাটাক হলে কোন আশাই নেই রবিনদের।

পরমুহূর্তে আরেকটা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল রানা। এইটথ স্কোয়াড্রনের এই প্রস্তুতি থেকে বোঝা যাচ্ছে এখনও সন্ত্রাসবাদীদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে রবিন, এখনও টিকে আছে, লড়ে যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তায়, ক্লান্তিতে দুর্বল বোধ করছে রানা। আবার শুয়ে পড়ল ও। বিপদের জন্যে তৈরি হওয়া দরকার ওরও, অনুভব করছে। দরজার দিকে একটা চোখ রেখে নাভীর কাছ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল ও। বেনোর পিস্তল এটা—পাহাড়ের ওপার থেকে নিয়ে এসেছে সে। ঠাণ্ডা আর উন্মুক্ত জায়গায় থাকার ফলে এর কোন উপকার হয়নি—তেল শুকিয়ে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে কলকজা, তবে এখনও কাজ দেবে বলে অনুমান করছে ও। কয়েকবার অ্যাকশনটা পরীক্ষা করল ও, ব্রীচ থেকে বেরিয়ে আসা রাউন্ডগুলো লুফে নিল প্রতিবার, তারপর ম্যাগাজিন রি-লোড করে আরও একবার পরীক্ষা করল অ্যাকশনটা। সব শেষে ব্রীচে একটা রাউন্ড ঢুকিয়ে তৈরি করে রাখল।

শরীরের পাশে, চাদরের নিচে পিস্তলটা রেখে দিল ও। হাতটা বাঁটে রেখে অপেক্ষা করছে।

অনেক সময় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ঢুকছে না অফিসে। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা অনুভব করছে রানা। শরীরের খুদে পেশীগুলো এখানে সেখানে তিড়িক করে কেঁপে উঠছে, জীবনে কখনও এত সজাগ হয়ে ওঠেনি ও। ডাক্তার গুস্তারের কীর্তি এটা, ভাবছে ও, স্টিমুল্যান্টটা কি দিয়ে তৈরি কে জানে—কে জানে শরীরে জমে থাকা একগাদা কোকার সাথে মিশে কি কাণ্ড ঘটাচ্ছে!

স্যাবরগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও। কাজ শেষ করে চলে গেছে গোলন্দাজরা। শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকাল রানা। দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে চেহারার একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার ঢুকছে কামরায়। রানার দিকে তাকালই না। গট গট করে এগিয়ে এসে ডেস্কের পিছনে গদি মোড়া চেয়ারটায় বসল। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'এই ফাইটার স্কোয়াড্রনের কমান্ডার আমি—কর্নেল পোয়ালো।'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব করে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল রানা। 'এটা কি একটা হাসপাতাল, কর্নেল পোয়ালো? তা যদি না হয়, আমি কি জানতে পারি কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে?'

'সব জানতে পারবেন,' দরাজ গলায় বলল কর্নেল পোয়ালো। 'তার আগে একটু খোশ গল্প করতে চাই আপনার সাথে। ডক্টর গুস্তারকে মনে আছে আপনার?'

'খুব সামান্য,' বলল রানা। 'জ্ঞান ফেরার পরই তো ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল—তারপর এখানে দেখছি এখন নিজেকে।'

'গুস্তারকে কিছু বলেননি তাহলে আপনি? কিছুই না, একটা কথাও না?'

'সুযোগ পেলাম কোথায়,' বলল রানা। সজ্জন ডাক্তারকে বিপদে জড়াতে চাইছে না ও। 'শুনুন, কর্নেল, আপনাকে পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। পাহাড়ের

ওপারে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটছে—একদল নিষ্ঠুর ডাকাত কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর এয়ার লাইন্‌স্ প্যাসেঞ্জারকে খুন করতে চেষ্টা করছে। এ খবর আপনাকে জানাবার জন্যেই পাহাড় টপকে এখানে এসেছি আমরা।'

'এখানে আসার জন্যে রওনা দিয়েছিলেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। ওখানে একজন সাউথ আমেরিকান লোক আছে, সে-ই এখানে পাঠিয়েছে আমাদেরকে। কি যেন নাম লোকটার…' ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার ভান করছে রানা।

'বরগুয়িজ নাকি?'

'বরগুয়িজ? না—এ নাম কখনও শুনিনি,' বলল রানা। 'মনে পড়েছে, লোকটার নাম মন্টেস।'

'মন্টেস মানে বরগুয়িজ, আর বরগুয়িজ মানেই শত্রু,' কর্নেল পোয়ালো হাসছে। 'সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল বৃদ্ধ কডরিগুয়েজ এখনও এখানে আছে। দু'দিন আগে হঠাৎ সরে যেতে হয়েছে তাকে এখান থেকে তা তো আর বুড়ো শকুন বরগুয়িজের জানার কথা নয়।'

'আপনার কথা আমি ঠিক…' হার্টবিট বেড়ে গেছে রানার।

রানার দিকে তাকাল না কর্নেল পোয়ালো, ডেস্কে পড়ে থাকা একটা ফোল্ডারের ভাঁজ খুলে মিটি মিটি হাসির সাথে পড়তে শুরু করল সে, 'মাসুদ রানা। বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন উজ্জ্বল তারকা। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চীফ। সাংঘাতিক বিপজ্জনক চরিত্র। ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারাস। এর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে বিপদ খুঁজে নেয়ার মারাত্মক প্রবণতা। দেশ; কাল; পাত্র, পরিবেশ নির্বিশেষে অবাঞ্ছিত ভাবে ঝামেলার মধ্যে নাক গলানো এর একটা বদভ্যাস!' মুখ তুলল কর্নেল পোয়ালো, হাসির জায়গায় চেহারায় ফুটে উঠল কুৎসিত একটা নৃশংসতা। 'তথ্যগুলোয় নিশ্চয়ই কোন ভুল নেই?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল কর্নেল পোয়ালো, 'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। কিছু না জানার ভান করুন, তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা জানি জেনারেল মোয়াজার সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে বরগুয়িজ। সরকারের আমি একজন চাকর, তাই এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। বরগুয়িজ আর কিছুক্ষণ পর মারা যাবে, খবরটা পেয়ে খুব খুশি হবেন জেনারেল মোয়াজা। তাঁর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে গিয়ে আরও কয়েকজন নন-পলিটিক্যাল লোককে মরতে হয়েছে শুনে নিশ্চয়ই তিনি দুঃখ বোধ করবেন, কিন্তু রাগ করবেন না।'

'হোয়াট!' রানার চিৎকার শুনে দু'জন গার্ড খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিল ভিতরটা।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কর্নেল পোয়ালো। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তাই।' জানালার দিকে একবার তাকাল সে। 'স্যাবরগুলো দেখেছ? একটু পর আকাশে উঠবে ওগুলো। পাহাড়ের ওপারে ওরা যারা আছে তাদের ওপর বোমা ফেলবে। বরগুয়িজের সাথে তোমার বান্ধবী এবং সহকারীকেও পটল তুলতে হবে, সেজন্যে

আমি সত্যি দুঃখিত। আর কয়েক মিনিটের বেশি তোমার আয়ুও বাড়ানো যাচ্ছে না, সেজন্যেও আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, সিনর রানা। তুমি একটা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট…'

তর্ক বা প্রতিবাদে কাজ হবে না, দ্রুত ভাবছে রানা। যুক্তি দিয়ে বিচার করে নিজেদের স্বার্থে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা। একজনও যদি বেঁচে থাকে, বরগুয়িজের হত্যাকাণ্ড প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য, সুতরাং…'ঠিক,' বলল রানা। 'এই একটা ব্যাপার বুঝতে অন্তত ভুল করছ না তুমি।' ভয়ে কাঁপছে বুক, কিন্তু ঠোঁট বাঁকা করে চমৎকার একটা হাসি ম্যানেজ করল ও। 'হ্যাঁ, আমি একটা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট! কিন্তু এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলো দেখি, তোমরা জানলে কিভাবে ডক্টর গুস্তারের হাসপাতালে পৌঁচেছি আমরা?'

হোঃ হোঃ করে হাসল কর্নেল পোয়ালো। তারপর বলল, 'ওই গিরিপথ টপকে কেউ এলে সে খবর চাপা থাকে নাকি! এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে যে বিদেশী লোকটা আলটিমিরোসের প্রতিটি লোক তাকে চেনে এখন। তাছাড়া,' মুচকি হাসল সে, 'ব্রিজের কাছে আমাদের লোকেরা দেখেছে তোমাকে। ওদের সাথে সারাক্ষণ রেডিও যোগাযোগ রাখছি আমরা।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'বুঝতে পারছি সবাইকে খুন করে গোটা ব্যাপারটাকে প্লেন দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার কথা ভেবেছ তোমরা। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সহজ?'

'কঠিন কোন্খানটায়?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, প্লেনে আমি ছিলাম। এক হপ্তার মধ্যে কয়েকশো এজেন্ট ঢুকবে এই দেশে। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বড়াই করে আমি কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সত্য আবিষ্কার না করে ফিরবে না তারা। কোন অপরাধের সমস্ত সূত্র নিশ্চিহ্ন করতে পারে না কেউ।'

'বুঝতে পারছি, নিজের আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করছ তুমি।' হাসছে কর্নেল পোয়ালো।

'হ্যাঁ, বিপজ্জনক লোকেরা তাই করে, আমিও তাই করছি,' শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল রানা। উঠে বসল স্ট্রেচারের উপর। খুব সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে বলল, 'সিগারেট দাও।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড, তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল পোয়ালো, ডেস্ক ঘুরে স্ট্রেচারের সামনে এসে দাঁড়াল। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। খোলা প্যাকেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, বলল, 'মনে হচ্ছে নিজের প্রাণ নিয়ে দর কষাকষি করতে চাও তুমি?'

'চাই,' সিগারেট ধরিয়ে কর্নেলের মুখের দিকে লম্বা ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা।

গম্ভীর হলো কর্নেল পোয়ালো। 'কিন্তু দর কষাকষির অবস্থায় নেই তুমি।'

নেই জানি, ভাবল রানা। কিন্তু আবার একটা সুন্দর মুচকি হাসি ম্যানেজ করল

ও। বলল, 'নিজেকে এতটা বুদ্ধিমান আর সবজান্তা মনে করা উচিত হচ্ছে না তোমার। বোমা ফেলতে চাইছ, ভাল কথা—কিন্তু নিরীহ একদল লোকই শুধু মারা পড়বে তাতে। আসল লোককে তোমরা ছুঁতেও পারবে না।'

চমকে উঠল কর্নেল পোয়ালো। মনে পড়ে গেল রেডিওর মাধ্যমে বাঙ্কো তাকে জানিয়েছে, বরগুয়িজকে একবারও দেখেনি কেউ তারা, এবং পাইলট রবিনসন বাঙ্কোকে জানিয়েছে ব্রিজের কাছে নেই বরগুয়িজ। 'কি বলতে চাও তুমি?'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে যাচ্ছে রানা, লেগে গেলে আর কিছু নয়, কিছুটা সময় পাওয়া যাবে মাত্র। এই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করছে না ও। 'তোমাদের ব্যাপক পরিকল্পনা দেখে তো মনে হয় বরগুয়িজকে খুব বড় করে দেখো তোমরা, কিন্তু তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন খবরই কি রাখো না?'

ধীরে ধীরে চোখ জোড়া কপালে উঠে যাচ্ছে কর্নেল পোয়ালোর, 'মানে?'

'হার্টের অসুখ ছিল লোকটার, জানো না?'

'ছিল!' চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল পোয়ালো। 'তার মানে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে বরগুয়িজ?'

উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসল রানা। 'হ্যাঁ বা না কিছুই এখনও বলছি না আমি এ বিষয়ে,' বলল ও। 'আরও বিষয়ে কথা বলতে চাই আমি। সময় আছে তো, নাকি আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি?'

ঝুলে পড়েছে মুখটা কর্নেল পোয়ালোর। 'আর কি বলার আছে তোমার?'

'শুনতে ইন্টারেস্টেড তুমি?' একটা চোখ টিপে ঠাট্টার সুরে বলল রানা। 'তবে শোনো। এ-ধরনের বিপদে পড়তে পারি তা আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। তাই···আচ্ছা, অ্যান্ডেজের ওপারে লক্ষ-কোটি নানা সাইজের পাথর আছে, এ তো তুমি জানোই, তাই না?'

'কাজের কথায় এসো···'

'আছে কি না?' হাসছে রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল পোয়ালো। 'আছে।'

'অনেক জায়গায় এক-আধটু নাড়াচাড়া করে রেখে এসেছি ওই পাথরগুলো,' বলল রানা। 'কেউ দেখলেও তা ধরতে বা বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমার খোঁজে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবে তারা দেখেই বুঝবে ক্লুটা। সেই ক্লু ধরে এগোলে ওখানেই কোথাও পেয়ে যাবে আমার রেখে আসা মেসেজ। বুম!' হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্ফোরণের ভঙ্গি করে দেখাল রানা। 'তোমাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারটা না হয় বাদই দিলাম, বোমার মত শব্দ করে ফাটবে তোমাদের সমস্ত কীর্তিকলাপ।'

একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল পোয়ালো।

হাসছে রানা। 'আরও শুনবে? না, থাক আপাতত। পরে···'

'হ্যাঁ,' বলল কর্নেল পোয়ালো। 'কিছুটা হলেও নিজের আয়ু বাড়াতে পেরেছ তুমি। আমার সুপিরিয়রের সাথে আলাপ করতে হবে আমাকে। কিন্তু বরগুয়িজ যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে, তাতে তোমার আনন্দিত হবার কিছুই নেই। অনেক বেশি জানো তোমরা, তাই তোমাদের কাউকে রেহাই দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর মেসেজ রেখে আসার ব্যাপারটা—স্রেফ গুল মারছ তুমি।'

'তোমার সুপিরিয়রের বুদ্ধি যদি তোমার চেয়ে সুপিরিয়র হয়,' বলল রানা, 'সে আমার কথা অবিশ্বাস করবে না।'

উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে এগোল কর্নেল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, 'বোকার মত কিছু করতে চেষ্টা কোরো না। সেন্ট্রিদের ওপর হুকুম আছে, তেমন কিছু করতে দেখলেই গুলি করবে।'

'এই দুর্বল শরীরে কিই-বা করার আছে আমার!' বলল রানা। 'তবে ভুল করে যেন গুলি করে না বসে, সাবধান করে দিয়ে যাও ওদেরকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাদের স্বার্থেই অন্তত আরও কিছুক্ষণ আমার বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা এখনও তো বলিনি।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কর্নেল। দর দর করে ঘামতে শুরু করেছে রানা। লোকটার মনে এভাবে সন্দেহ, অনিশ্চয়তা আর দ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দিতে পারবে বলে আশা করেনি ও। চেষ্টাটা সফল হয়েছে, কিন্তু এরপর?

পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। অ্যাপ্রনে দাঁড়ানো স্যাবরগুলোকে ঘিরে একটা তৎপরতা শুরু হয়েছে আবার। একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে কাছাকাছি, সেটা থেকে ফ্লাইং পোশাকে সজ্জিত তিনজন লোক নামছে নিচে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনজন তিনটে প্লেনে গিয়ে উঠল। গ্রাউন্ড কর্মীরা সাহায্য করল ওদেরকে ককপিটে উঠতে। স্টার্টার ট্রাকটা একটার পর একটা প্লেনের কাছে গিয়ে থামছে। স্টার্ট নিল ইঞ্জিনগুলো, তারপর ধীর গতিতে এগোল সামনের দিকে এক এক করে তিনটে প্লেন। খানিক পর রানার দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল ওগুলো।

অবশিষ্ট স্যাবর জেটটার দিকে তাকাল রানা। একটা বিশেষ চিহ্ন রয়েছে প্লেনটার গায়ে। এটা কি তবে কর্নেল পোয়ালোর ফাইটার? তার জন্যেই অপেক্ষা করছে?

এগারো

রেমন শুয়েগেরা একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী, ভাবছেন ডাক্তার গুস্থার, সরকার উৎখাতের মত ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সাথে কিভাবে জড়িয়ে পড়ল সে সেটা একটা রহস্য বটে! সামনের গেট দিয়ে শুয়েগেরার অফিস ভবনে ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তার ঠিক উল্টোদিকেই রয়েছে টেলিগ্রাফ অফিসটা। গুস্থারের দৃঢ় সন্দেহ, টেলিগ্রাফ অফিসে এইটথ স্কোয়াড্রনের লোকজন গিজ গিজ করছে। পিছনের গেট দিয়ে ঢুকলেন তিনি, এবং সেক্রেটারির সাথে হাসি এবং কুশলাদি বিনিময় করে রোজকার মত সরাসরি শুয়েগেরার চেম্বারে প্রবেশ করলেন।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মাঝারি গড়নের, স্যুট পরা শুয়েগেরা। পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'গুস্থার, তুমি! এই অসময়ে? দাবা

দেখছি তোমাকে পেয়ে বসেছে, বন্ধু।'

'দাবা খেলতে আসিনি,' পকেট থেকে এনভেলাপটা বের করে গুয়েগেরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার। 'মুখ থেকে শোনার চেয়ে এটা পড়তে অনেক কম সময় লাগবে তোমার।'

পড়তে শুরু করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল গুয়েগেরা, ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। 'ঘটনা সত্যি, ঠিক জানো তুমি?'

'মাসুদ রানা এবং লোপেজকে মিশন থেকে নিয়ে চলে গেছে ওরা,' বললেন ডাক্তার। 'জোর করে।'

'মাসুদ রানা, একে আমি চিনি না—কিন্তু মিগুয়েল লোপেজের এখানে পৌঁছুবার কথা দু'দিন আগে,' বলল গুয়েগেরা। 'কথা ছিল পাহাড়ী এলাকার দায়িত্ব নেবে সে, যখন…'

'যখন বিপ্লব শুরু হবে?'

মুখ তুলে তাকাল গুয়েগেরা। কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'বিপ্লব বলো, আপত্তি নেই। জেনারেল মোয়াজাকে সরাবার জন্যে আর কি উপায় আছে, বলো?' ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তার ওপারের টেলিগ্রাফ অফিসটা দেখল সে। 'ওখানে যা ঘটছে তার একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছি এখন।' হাত বাড়িয়ে সাদা একটা টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে, বলল, 'জুয়ানকে পাঠিয়ে দাও।'

'কি করবে এখন তুমি?' জানতে চাইলেন ডাক্তার গুস্থার।

মোটা একটা হাভানা চুরুট ধরাল গুয়েগেরা। তর্জনী তাক করে কালো রঙের টেলিফোন সেটটা দেখিয়ে বলল, 'পোস্ট-অফিস দখল-মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওটা কোন কাজে লাগছে না। এই লোকাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জটাই আমাদের পার্বত্য এলাকার সমস্ত কম্যুনিকেশন কন্ট্রোল করে। আমার ছেলে জুয়ানকে পাহাড়ের ওপারে পাঠাচ্ছি আমি—কিন্তু অনেক দূরের রাস্তা, প্রচুর সময় লাগবে…'

'রাস্তার যা অবস্থা, চার-পাঁচ ঘণ্টার আগে পৌঁছুতে পারবে না।'

'এদিকে আরও দ্রুত কাজ দেখাব আমরা,' জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল গুয়েগেরা, রাস্তার ওপারের পোস্ট-অফিসের দিকে চোখ রেখে বলল, 'সবচেয়ে আগে দখল করতে হবে পোস্ট-অফিসটা।'

চোখ কপালে উঠে গেল ডাক্তারের। 'এইটথ স্কোয়াড্রনের সাথে লড়তে চাও নাকি?'

চরকির মত আধপাক ঘুরে ডাক্তারের দিকে তাকাল গুয়েগেরা। 'অবশ্যই। শুধু কি টেলিফোন, তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে এর সাথে।' ডেস্কের কাছে হেঁটে এসে রিভলভিং চেয়ারে বসল সে। 'আমরা জানতাম বিপ্লব যখন শুরু হবে তখন যদি এইটথ স্কোয়াড্রন এখানে থাকে তাহলে বিপদ দেখা দেবে। তাই আগে থাকতেই সাবধান হতে হয়েছে আমাদেরকে। কর্নেল কডরিগুয়েজ এয়ারফিল্ডের সবক'টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মাইন ফিট করে রেখেছেন। সেগুলো বিদ্যুতের সাহায্যে ফাটানো যাবে—এয়ার ফিল্ড থেকে তারগুলো এখানে, এই আলটিমিরোসে নিয়ে আসা হয়েছে। টেলিফোনের তারের সাথে গা ঢাকা দিয়ে

আছে সবগুলো। বোতামে একটা চাপের অপেক্ষা শুধু, সাথে সাথে এইটথ স্কোয়াড্রন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে।'

'সেই বোতামটা কোথায়?'

'আজ সকালে অতিরিক্ত একটা তার এয়ার ফিল্ড থেকে আমার অফিসে টেনে নিয়ে আসার কথা ছিল,' ডেস্কে চাপড় মারল শুয়েগেরা। 'কিন্তু সুযোগ পাওয়া যায়নি। এখন একমাত্র উপায় বাইফোর্স পোস্ট-অফিসটা দখল করা—ইলেকট্রিক কানেকশনটা ওখানেই।'

'আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নই,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু যতদূর বুঝি, চাইলে বোধহয় পোস্ট-অফিসের বাইরে ট্যাপ করা যায় তারগুলো।'

'খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ফোরটিনথ স্কোয়াড্রনের ইঞ্জিনিয়াররা করেছে কাজটা,' বলল শুয়েগেরা। 'তাছাড়া আগাম কোন নোটিস না দিয়ে এইটথ স্কোয়াড্রন হঠাৎ এসে পড়ায় এয়ারফিল্ড ত্যাগ করতে হয়েছে ওদেরকে। সিভিল এবং মিলিটারি নেট ওয়ার্কের কয়েকশো তার রয়েছে, এগুলোর মধ্যে কোনটা মাইনের সাথে যুক্ত কেউ তা জানে না। কিন্তু পোস্ট-অফিসের ভিতর নির্দিষ্ট কানেকশনটা আমি চিনি—কর্নেল কডরিগুয়েজ আমাকে দেখিয়েছিলেন।'

তীক্ষ্ণ গগনবিদারী আওয়াজ তুলে একটা স্যাবর জেট উড়ে যাচ্ছে আলটিমিরোসের উপর দিয়ে, শব্দটা দূরে সরে যেতে শুয়েগেরা বলল, 'যা করার এখুনি করতে হবে—এইটথ স্কোয়াড্রনকে বাড়াবাড়ি করতে দেয়া যায় না।'

ব্যবসায়ী লোকটা অদ্ভুত দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার প্রস্তুতি দেখে চোখ কপালে উঠে গেল ডাক্তার গুস্থারের। চোখের সামনে ম্যাজিক দেখছেন যেন তিনি। শুয়েগেরার অয়্যার হাউজের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল রাইফেল এবং অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রধারী অসংখ্য লোকজন। তাদের সামনে দিয়ে একজন দোর্দণ্ড প্রতাপ জেনারেলের মতই হেঁটে গেল শুয়েগেরা। মাথার পিছনটা চুলকে ডাক্তার গুস্থার বললেন, 'আমি কিন্তু যুদ্ধ টুদ্ধ করতে পারব না।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শুয়েগেরা।

প্রস্তুতিটা ব্যাপক ছিল, কিন্তু পোস্ট-অফিসে তেমন কোন সংঘর্ষ বাধল না। আক্রমণটা শক্তিশালী এবং অপ্রত্যাশিত, এইটথ স্কোয়াড্রন ডিটাচমেন্ট প্রতিরোধ করার কোন সুযোগই পেল না। ওদের একজন মাত্র করপোরাল গুলি খেলো পায়ে, তাও অনভিজ্ঞ একজন রাজনৈতিক কর্মী তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ অফ করে রেখেছিল বলে দুর্ঘটনাটা ঘটল।

পোস্ট-অফিসে ঢুকে হুঙ্কার ছাড়ছে শুয়েগেরা, 'জুম্মন! জুম্মন! ব্যাটা ইলেকট্রিশিয়ান গেছে কোথায়? জুম্মন!'

'এই যে, আসছি আমি,' বগলের নিচে বড় একটা বাক্স নিয়ে দ্রুত ছুটে এল জুম্মন। তাকে নিয়ে মেইন সুইচরুমে চলে এল শুয়েগেরা। ওদের সাথে ডাক্তার গুস্থারও এলেন।

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে পড়ছে শুয়েগেরা। 'সুইচগুলোর তৃতীয় ব্যাঙ্কে আছে ওটা,' বলল সে। 'ডানদিক থেকে পনেরো, এবং নিচে থেকে উনিশ নম্বর।'

সাবধানে শুনছে জুম্মন। 'তার মানে এটা,' বলল সে। 'ওই দুটো স্ক্রুর কানেকশন বাকি আছে।' একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করল সে। 'দু'মিনিটের বেশি লাগবে না, সিনর।'

জুম্মন কাজ করছে, এই সময় শহরের উপর দিয়ে বিকট আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা ফাইটার প্লেন, সেটার পিছু পিছু আরও দুটো। 'কে জানে দেরি হয়ে গেল কিনা!' বিড় বিড় করে বলল গুয়েগেরা।

হঠাৎ চমকে উঠে গুয়েগেরার একটা হাত চেপে ধরলেন ডাক্তার গুস্থার। 'রানা আর লোপেজের কি হবে? ওরাও তো এয়ার ফিল্ডে রয়েছে।'

'হাসপাতালের কোন ক্ষতি করছি না আমরা,' আশ্বাস দিয়ে বলল গুয়েগেরা। 'ফুয়েল এবং অ্যামুনিশন ডিপো, হ্যাঙ্গার, রানওয়ে, কন্ট্রোল টাওয়ার এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোয় মাইন বসানো হয়েছে। আমরা শুধু ওদেরকে অচল করে রাখতে চাই—ওরাও তো কর্ডিলেরান, তাই না?'

'রেডি!' বলল জুম্মন।

অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে গুয়েগেরাকে। 'দেশের স্বার্থে এ-কাজ না করে উপায় নেই,' বলেই বোতামে চাপ দিল সে।

প্লেন চালাবার জন্যে পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে এসেছে কর্নেল পোয়ালো। পরনে ফ্লাইং স্যুট, পিঠে প্যারাস্যুট, মাথায় হেলমেট, হাতে-রয়েছে শুধু অক্সিজেন মাস্কটা। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে। 'আরও কিছু সময় বরাদ্দ করা হয়েছে তোমার জন্যে। আরও জরুরী একটা কাজে যাচ্ছি এখন আমি। তবে, তার আগে একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে—তেমন কিছু নয়, স্রেফ একটা শিক্ষামূলক প্রদর্শনী।' দরজার দিকে ফিরে হাতছানি দিল সে।

দু'জন সেন্ট্রি ঢুকল কামরায়। চেয়ারের উপর থেকে স্ট্রেচারটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে তারা।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না রানা। স্ট্রেচার নিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসেছে সেন্ট্রিরা। কন্ট্রোল টাওয়ারের সামনে অ্যাপ্রনের উপর দিয়ে এগোচ্ছে তারা। একা দাঁড়িয়ে থাকা স্যাবর ফাইটারের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় একজন মেকানিককে ডেকে বলল কর্নেল পোয়ালো, 'দশ মিনিটের মধ্যে।'

বিকট আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল রানওয়ে ধরে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করেছে একটা স্যাবর। মুহূর্তে আকাশে ডানা মেলল সেটা। তাকে অনুসরণ করল আরও দুটো স্যাবর। উত্তর দিকে পাহাড়ের আড়ালে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। মৃদু একটু স্বস্তি বোধ করল রানা। রবিনরা ওদিকে নেই।

ছোট দলটা একটা হ্যাঙ্গারের সামনে থামল। প্রকাণ্ড স্লাইডিং দরজাটা বন্ধ, ছোট দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল কর্নেল পোয়ালো, সেন্ট্রিরা স্ট্রেচার নিয়ে অনুসরণ করল তাকে। হ্যাঙ্গারে কোন প্লেন নেই, ওদের পায়ের আওয়াজ প্রকাণ্ড জায়গাটার চারদিকের ধাতব দেয়ালে লেগে ভরাট প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে। ফ্লাইং গিয়ার পরিহিত কর্নেল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। মাঝারি একটা কামরায় ঢুকল সে, স্ট্রেচারটা ভিতরে নিয়ে আসার জন্যে ইঙ্গিত দিল

সেন্ট্রিদেরকে। কামরার ভিতর ঢুকে দুটো চেয়ারের মাঝখানে স্ট্রেচারটা রাখল তারা, তারপর কর্নেলের নির্দেশে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কর্নেলের চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'এসবের মানে কি?'

আবছা অন্ধকারে হাসল কর্নেল। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালল সে। 'সবুর করো, দেখতে পাবে,' এগিয়ে গিয়ে জানালাটার সামনে দাঁড়াল সে, কর্ড টেনে ভারী পর্দা সরাল। কামরার বাইরে হ্যাঙ্গারের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে এখন। রানার দৃষ্টিপথ থেকে একপাশে সরে জানালার পাশে দাঁড়াল কর্নেল। 'দেখো।'

কয়েকজন সৈনিক মার্চ করে ঢুকল হ্যাঙ্গারে, এক সারিতে দাঁড়াল তারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল।

'অ্যাটেনশন!' হুঙ্কার ছাড়ল একজন করপোরাল।

পরমুহূর্তে লোপেজকে দেখতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক।

হাঁটতে পারছে না বেচারা, দেখতে পাচ্ছে রানা। অথচ কংক্রিটের মেঝের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে। একটা পেন্সিল দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে জানালার কাঁচে টোকা মারল কর্নেল পোয়ালো। পিছন থেকে লাথি, হাঁটুর গুঁতো মেরে, ধাক্কা দিয়ে জানালার কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো লোপেজকে। বীভৎস চেহারা হয়েছে তার। ভুরুর উপর থেকে চুলের রেখা পর্যন্ত কপালের চামড়া নেই। দগ দগ করছে ক্ষতটা। চোখ দুটোর চারপাশ ফুলে উঠেছে, পানি গড়াচ্ছে। নাকের ফুটো দুটো জমাট রক্তে বন্ধ। মুখে আরও অনেক কাটা ছেঁড়ার দাগ। ক্ষতগুলোকে ঘিরে ভন ভন করে উড়ছে মাছি। ফুলে থাকা চোখের ভিতর থেকে তাকাল লোপেজ। চোখ রাখল রানার চোখে। শিউরে উঠল রানা। কিছু বলার জন্যে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করল লোপেজ, শব্দ বেরুল না, দেখা গেল সামনের কয়েকটা দাঁত নেই তার।

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত ঘষে স্ট্রেচারের উপর ঝট করে উঠে বসল রানা। উত্তেজনায় কাঁপছে ও। 'শূয়ারের বাচ্চা! বেজন্মা—তোকে শালা আমি কুকুরের মত গুলি করে খুন করব! মুমূর্ষু লোকটাকে মারধর করেছিস তুই···তোর আমি···'

রানার চিৎকার চাপা পড়ে গেল কর্নেলের প্রবল অট্টহাসিতে। তারপর হঠাৎ সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলো। 'একজন কর্ডিলেরানের জন্যে এত কেন মায়া তোমার, রানা? তুমি কি জানো না ও একজন দেশদ্রোহী, একটা আইনসিদ্ধ সরকারকে উৎখাত করার জন্যে অবৈধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? বাংলাদেশে তোমরা দেশদ্রোহীদের কি শাস্তি দাও, ভায়া?'

'কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা—তুই-ও তো জেনারেল মোয়াজার সরকারকে উৎখাত করতে চাস···'

'সে কথা আলাদা,' ভুরু নাচিয়ে হাসছে কর্নেল। 'আমার বিরুদ্ধে এখনও কোন অভিযোগ আনা হয়নি, কোন প্রমাণও নেই, আমি ধরাও পড়িনি। যখন যে দল বেশি শক্তিধর তখন আমি সেই দলে থাকি। বর্তমানে আমি জেনারেল মোয়াজার অতি ভক্ত একটা কুকুর। আমার কাজ মোয়াজা সরকারকে রক্ষা করা। তাই বরগুয়িজ এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের খতম করছি। লোপেজ এখনই খতম হচ্ছে,

বড়জোর আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বরগুয়িজও খতম হবে—অবশ্য এখনও যদি বেঁচে থাকে সে।'

মাথাটা একদিকে কাত করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করছে কর্নেল, কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

উন্মাদের মত লাগছে নিজেকে রানার, নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করছে, অশ্রাব্য খিস্তি করছে কর্নেলকে, কিন্তু শয়তানটার হাত থেকে লোপেজকে বাঁচাবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। স্যাবরগুলো ফিরে আসছে এয়ার ফিল্ডের আকাশে। কর্নেলকে হাসতে দেখে হঠাৎ বুঝতে পারল রানা, প্লেনগুলো ফিরে আসার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। ফাইটারগুলোর গর্জনে রাইফেলের শব্দ যাতে শুনতে পাওয়া না যায়।

হ্যাঙ্গারটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রানার। ওই আরেকটা প্লেন আসছে।

হাতলহীন শক্ত কাঠের একটা চেয়ার নিয়ে এল একজন সৈনিক। ধরাধরি করে লোপেজকে বসানো হলো সেটায়। চেয়ারের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো পতনোন্মুখ শরীরটাকে। হুঙ্কার দিয়ে একটা নির্দেশ ছাড়ল করপোরাল। একযোগে রাইফেল তুলল ফায়ারিং স্কোয়াড। করপোরাল শূন্যে তুলল তার একটা হাত।

হতভম্ব, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, চোখ দুটো আটকে গেছে ওর, ফিরিয়ে নিতে পারছে না। আরেকটা স্যাবর ডাইভ দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছে। ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তীব্র গগনবিদারী হয়ে উঠছে আওয়াজটা। এইবারই ঘটতে যাচ্ছে মর্মান্তিক ঘটনাটা। কি করতে পারি আমি? অক্ষম, অসহায় লাগছে নিজেকে রানার, ভাবছে—গুলি করতে পারি পোয়ালোকে, কিন্তু তাতে লোপেজকে বাঁচানো যাবে না···

হ্যাঙ্গারের মাথার উপর চলে এসেছে স্যাবরটা। করপোরালের জন্যে তোলা হাতটা একটু একটু কাঁপছে, ঝট্ করে নামিয়ে আনল সেটা সে। সাথে সাথেই সব ক'টা রাইফেলের নলের মুখে দেখা গেল আগুনের ঝলক। চমকে উঠল লোপেজের শরীরটা, খিঁচুনি দিয়ে বাঁধন ছেঁড়ার একটা ভাব দেখা গেল তার মধ্যে। তারপরই একদিকে কাত হয়ে গেল সে, চেয়ারটা নিয়ে উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে। স্থির হয়ে গেছে লোপেজ, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে শরীরের খাঁচা ছেড়ে। পিস্তল বের করে লাশটার দিকে হেঁটে গেল করপোরাল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে সত্যি মারা গেছে কিনা।

কর্ড ধরে টানল কর্নেল, পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল জানালাটা। বীভৎস দৃশ্যটা আড়াল হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। রানার দিকে তাকাল সে। 'আমাকে গালাগালি করে কোনও লাভ নেই, রানা,' বলল সে। হাসছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিল আরামের সাথে। বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আমার সুপিরিয়র ভদ্রলোক তোমার বক্তব্য পাত্তা দেননি।' বেল্ট থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে সিধে হলো সে, এগিয়ে আসছে রানার দিকে। 'একের পর এক তাঁর নির্দেশ পালন করছি আমি। লোপেজের পর এখন তোমার পালা। তারপর বরগুয়িজ এবং অন্যান্যদের।' চার হাত দূরে দাঁড়াল সে, পিস্তলটা তুলছে রানার দিকে। 'গুডবাই, ফ্রেন্ড!'

'গুডবাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। কিন্তু আরেকটা স্যাবর ডাইভ দিয়ে নামছে, আওয়াজের ধাক্কায় কাঁপছে হ্যাঙ্গারটা, পোয়ালো শুনতেই পেল না ওর কণ্ঠস্বর। পিস্তলের আওয়াজটাও কানে ঢোকেনি তার। কিন্তু ধাক্কাটা লেগেছে।

শান্ত এবং নিখুঁতভাবে পরপর দু'বার গুলি করল রানা কর্নেলের তলপেটে। পিস্তলটা বের করেনি ও, গুলি করেছে চাদরের নিচে থেকে।

যন্ত্রণা এবং বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল পোয়ালো। চার হাত দূর থেকে রানার কানেও সে-চিৎকার ঢুকল না, ফাইটার প্লেনের গর্জনে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। হাঁ করে আছে পোয়ালো, তার মুখের ভিতর গর্তের শেষ সীমানা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে রানা। এবার রানা শেষ গুলিটা করল। দুই সারি দাঁতের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল বুলেটটা।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে পিছন দিকে সরে গেল মাথাটা। সটান পড়ে গেল পোয়ালো পিছন দিকে, চিৎ হয়ে। নিঃসাড় চোখ দুটো। সিলিংয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, উদাস ভঙ্গিতে যেন কি চিন্তা করছে।

পিস্তল হাতে স্ট্রেচার থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল রানা। চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করল সেটা। তারপর সন্তর্পণে জানালার পর্দা একটু সরিয়ে হ্যাঙ্গারের ভিতর তাকাল। মার্চ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ফায়ারিং স্কোয়াড হ্যাঙ্গার থেকে, দু'জন সৈনিক একটা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে লোপেজের লাশটা। কাজটা শেষ করে তারাও বেরিয়ে গেল হ্যাঙ্গার থেকে।

দরজার কাছে ফিরে এসে কান পাতল রানা। পোয়ালোর পার্সোনাল গার্ড হাঁটাহাঁটি করছে বাইরে। ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করল রানা, তারপর ফিরে এল পোয়ালোর লাশের কাছে।

দৈহিক গঠন দু'জনের প্রায় একই—পোয়ালোর ফ্লাইং ওভারঅল আর বুট ঠিক মতই ফিট করল রানার। দ্রুত স্ট্র্যাপ দিয়ে প্যারাস্যুটটাও বেঁধে নিল ও। তারপর ভারী প্লাস্টিকের ফ্লাইং হেলমেট আর অক্সিজেন মাস্কটা পরে নিল মাথায়। লাশটা স্ট্রেচারে তুলে চাদর দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল ও।

দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছে রানা, দু'হাত দিয়ে মুখের সামনে অক্সিজেন মাস্কটা ধরে নাড়াচাড়া করছে ও, যেন ঠিকমত বসাবার চেষ্টা করছে সেটাকে। 'গো ব্যাক,' ইংরেজিতে বলল ও।

হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল গার্ডটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল সে। নির্দেশ শুনে দ্রুত একটা স্যালুট ঠুকল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে।

গার্ড বেরিয়ে যেতে কামরার দরজায় তালা লাগাল রানা, উরুর কাছে একটা পকেটে ভরল পিস্তলটা, তারপর বেরিয়ে এল হ্যাঙ্গার থেকে।

আওয়াজ শুনে মাথার উপর তাকাতেই তিনটে স্যাবরকে পাশাপাশি একটা ঝাঁক বেঁধে চক্কর মারতে দেখল ও। অর্ধবৃত্ত রচনা করে দিক বদলাল সেগুলো, পুবের পাহাড়গুলোর দিকে সোজা উঠে যাচ্ছে এখন। পোয়ালোর জন্যে অপেক্ষায় না থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওরা, ভাবল রানা। তারপর অপেক্ষমাণ স্যাবরটার দিকে ছুটতে শুরু করল।

ওকে ছুটে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল গ্রাউন্ড কর্মীরা। হাত দিয়ে অক্সিজেন

মাস্কটা এখনও ঠিকঠাক করে নিচ্ছে রানা। সোজা ককপিটের নিচে গিয়ে দাঁড়াল ও। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। উঠতে যাচ্ছে রানা, দুপাশ থেকে দুটো হাত ওকে উপরে উঠতে সাহায্য করল।

ককপিটে বসে কন্ট্রোলের দিকে তাকাল রানা। একটা ঢোক গিলল ও। সবকিছুই চিনতে পারার কথা, মনেও পড়ছে, কিন্তু অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই বলে প্রতিটি জিনিস নতুন লাগছে। স্টার্টার ট্রাক চলে এসেছে ইতিমধ্যে, ফিট করা হয়েছে প্লাগ। ট্রাকের কর্মীরা চেয়ে আছে ওর দিকে। সেরেছে, ভাবছে ও, স্প্যানিশ ভাষার কমান্ড রুটিন জানা নেই তার। চোখ বুজল ও, হাত দুটোকে দায়িত্ব দিল নির্দিষ্ট সুইচগুলোকে হাতড়ে বের করার জন্যে।

অভ্যাস মত ঠিক সুইচগুলো অন করল রানা। তারপর হাত নাড়ল কর্মীদের উদ্দেশে। ইঞ্জিন স্টার্ট নিতেই ছুটল তারা প্লাগ খুলে নেবার জন্যে।

বিশ সেকেন্ড পর স্যাবরের চাকা গড়াতে শুরু করল। প্লেনটাকে ঘুরিয়ে রানওয়েতে নিয়ে যাচ্ছে রানা। শেষ মাথায় পৌঁছে অন করল রেডিওটা। 'কর্নেল পোয়ালো?' হেডফোনে বেজে উঠল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর।

'সি,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা।

'টেক অফে কোন বাধা নেই, কর্নেল পোয়ালো।'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। রানওয়ে ধরে ছুটছে স্যাবর। চাকাগুলো শূন্যে উঠতেই এক নিমেষে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গোটা এয়ারফিল্ড। রানার চোখের সামনে গোটা রানওয়েটা লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, মৃদু একটা ঝাঁকি খেল প্লেনটা। প্রায় খাড়া ভাবে তির্যক ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে রানা, চোখ নামিয়ে এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে। চারদিকে অসংখ্য বিস্ফোরণ ঘটছে, শূন্যে লাফ দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের শিখা। কন্ট্রোল টাওয়ারটা ধরে কে যেন নাড়া দিল একবার, পরমুহূর্তে সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেটা চারদিকে, ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে একটা ধোঁয়ার মোটা স্তম্ভ উঠে আসছে উপর দিকে।

'যুদ্ধ শুরু করল কে!' প্রশ্ন নয়, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। কয়েক মুহূর্ত আগেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে। ব্যাপারটা যাই হোক, ভাবছে রানা, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে সে। তবে এইটথ স্কোয়াড্রনকে আর মাথা চাড়া দিতে হবে না। নিচের বিশাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে শেষবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘ উত্থান পর্বে সেট করে নিল ও প্লেনটাকে, তারপর রেডিওর সুইচগুলো অন করে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করল অন্য স্যাবর তিনটের সাথে। দুটো চ্যানেল কাজ করছে না, আবিষ্কার করল রানা, কিন্তু তৃতীয়টার মাধ্যমে যোগাযোগ হলো ওদের সাথে। অনেক দূরে চলে গেছে ওরা, এয়ারফিল্ডের ঘটনা কিছুই জানে না, জানাবার কোন প্রয়োজনও বোধ করল না রানা। সাধারণ দু' একটা বিষয়ে কথা বলে চুপ মেরে গেল ও।

নিচে তাকিয়ে গিরিপথটা দেখতে পেল রানা, যেখানে প্রায় মরতে যাচ্ছিল ও। স্যাঁত করে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল লোপেজের ছবি। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের আকাশের দিকে তাকাল রানা,

স্যাবরগুলোকে খুঁজছে। আলাপের সময় জেনেছে ও নির্দিষ্ট একটা জায়গায় কর্নেল পোয়ালোর জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা। কিন্তু, ভাবছে রানা, পোয়ালো কি ওদেরকে অপারেশনের কথা বলে রেখেছিল, নাকি ভেবেছিল আকাশে ওঠার পর বলবে? উত্তরটা জানা থাকলে নিধনযজ্ঞের কৌশল নির্বাচনে সুবিধে হত ওর।

অবশেষে গিরিপথের পাশের পাহাড়ের কাছাকাছি, কিন্তু অনেক উঁচুতে দেখতে পেল স্যাবরগুলোকে রানা, ছোট একটা বৃত্ত রচনা করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তির্যক ভঙ্গিতে উঠতে শুরু করল রানা, ওদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের এই দোসরদেরকে একটু চমক দেয়া যাক, ভাবল ও।

বারো

নুড়ি পাথরের সাথে চাকার ঘর্ষণ শুনতে পাচ্ছে রবিন। 'আসছে ওরা,' বলল ও। বুক পর্যন্ত উঁচু পাথরের দেয়ালের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল, পিস্তলের বাঁটটাকে পেঁচিয়ে ধরছে আঙুলগুলো।

খানিক আগে থেকেই পাতলা হতে শুরু করেছে কুয়াশা, কেবিনগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন সে, যেখানে সমতল জায়গাটার উপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাস্তাটা। কুয়াশায় ঘোলাটে দেখাচ্ছে হেডলাইট দুটোকে, গাড়িটার শরীর এখনও পরিষ্কার নয়।

টানেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে রবিনের পাশে শুয়ে পড়ল বেনেদেতা। ট্রাকের শব্দ পেয়েছে সে-ও। 'এখানে আবার কেন এলে?' রূঢ়, কর্কশ শোনাল রবিনের কণ্ঠস্বর। 'কারও কিছু করার নেই।' পিস্তলটা দেখাল সে। 'মাত্র একটা বুলেট। এটা দিয়ে কি করতে পারব আমরা?'

'একটা, না একশোটা, ওরা তা জানে না।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার উঁকি দিল রবিন। 'তোমার কাকা কেমন আছেন?'

'ভাল,' মিথ্যে কথা বলল বেনেদেতা। দুঃসংবাদ দিয়ে চিন্তায় ফেলতে চায় না রবিনকে। সিনর বরগুয়িজ অক্সিজেনের অভাবে দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

'মিস জুডি?'

বেনেদেতা মুখ খোলার আগেই পিছন থেকে মিস জুডি বললেন, 'আমার কথা চিন্তা কোরো না, ভাই। আমি ভালই আছি।'

'আপনি ভিতরে যান,' অসন্তুষ্ট হয়ে বলল রবিন। 'বুড়ো মানুষ...'

'সেজন্যেই হয়তো আমাকে কিছু বলবে না ওরা,' চশমার ফাঁক দিয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে মিস জুডি। 'ভাবছি ওরা থামলে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলব ওদের সাথে...'

'পাগল হয়েছেন!'

কিছুই শুনছে না ওদের কথা বেনেদেতা, হঠাৎ বলল সে, 'ক্যাম্পে ওদেরকে আমরা তিন ঘণ্টা দেরি করিয়ে দিয়েছি।'

আড়চোখে বেনেদেতার দিকে তাকাল রবিন। 'এটাই আমাদের শেষ ব্যর্থ চেষ্টা হতে যাচ্ছে, বেনেদেতা। যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি করেছি আমরা, তাই করে এ পর্যন্ত টিকে আছি, কিন্তু এভাবে তো আর সারা জীবন চলতে পারে না। এর একটা শেষ আছে।'

'আমিও তাই মনে করি,' পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ইতিহাসবেত্তা কোনালি। 'নেপোলিয়ন ঠিকই বলেছিলেন—গড ইজ অন দ্য সাইড অফ দ্য বিগ ব্যাটালিয়নস্।'

'আপসে রাজী না হয়ে যদি হত্যাই করতে চায়, তাহলে মরব; কিন্তু ওদের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মরতে পারি আমরা,' দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বললেন মিস জুডি।

'পাগল হয়ে গেছেন আপনি!'

'পুরোপুরি,' রবিনকে সমর্থন করল কোনালি।

গাড়ির শরীরটা দেখা যাচ্ছে এখন, উঠে এসেছে সমতল রাস্তায়। একটা জীপ। পিছনে একটা ট্রাক। সেটার পিছনে আরেকটা। উঁচু গলার নির্দেশ শুনতে পেল রবিন, কেবিন পর্যন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকগুলো। জীপটা একটা বড় বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে, কুয়াশা ভেদ করে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে হেডলাইটের দুই ফালি আলো। হঠাৎ রবিন বুঝতে পারল পাহাড়ের ভিত খুঁজছে আলো দুটো, যেখানে টান্নেলগুলো থাকার কথা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, মাথাটা দেয়ালের আড়ালে টেনে নেবার আগেই আলোটা তার মুখে এসে পড়ল। পরমুহূর্তে পিছিয়ে এল ও, শুনতে পেল এক পাল হিংস্র হায়েনার মত বিজয়ের উল্লাসে চিৎকার করছে সন্ত্রাসবাদীরা।

'ইস, সাংঘাতিক বোকামি করে ফেলেছি!'

'কিছু এসে যায় না,' বলল বেনেদেতা। 'একটু পরই দেখতে পেত আমাদেরকে ওরা।' দেয়ালের নিচের দিক থেকে খুব সাবধানে একটা পাথর সরিয়ে ফেলল ও। 'মাথা না বের করে এই ফুটোয় চোখ রেখে দেখি।'

'শুয়ে পড়ুন,' ফিসফিস করে বলল মিস জুডিকে কোনালি।

বসে পড়লেন মিস জুডি। উঁকি দিতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না সামনেটা।

'যদি জানতে পারে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই আমাদের কাছে,' বলল রবিন, 'স্রেফ হেঁটে চলে আসবে ওরা।'

'আরেকটা ট্রাক আসছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল বেনেদেতা। অদ্ভুত ভাবে হাসল সে। 'আমাদেরকে শেষ করার জন্যে সম্ভব হলে আরও কয়েকশো ট্রাক ভর্তি লোকজন নিয়ে আসত ওরা।'

'সরো, দেখতে দাও আমাকে,' বলল রবিন। গড়িয়ে সরে গেল বেনেদেতা, তার জায়গায় চলে এল রবিন, চোখ রাখল গর্তে। 'কোন আলো জ্বালেনি নতুন ট্রাকটা—কেন? খুব জোরে আসছে···দিক বদলে কেবিনগুলোর দিকে যাচ্ছে এখন। ভাবছি···আরে, স্পীড কমাচ্ছে না এখনও···'

ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। এবং চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'স্পীড আরও

বাড়ছে ওটার—মাই গড, ব্রেক ফেল?'

উঠে দাঁড়িয়েছেন মিস জুডি। পরিস্থিতি ভুলে চূড়ান্ত ছেলেমানুষির পরিচয় দিচ্ছেন তিনি। 'পিষে মারছে ওদেরকে! কি মজা! কি মজা!' হাত তালি দিচ্ছেন তিনি। 'ও ভাই গিলটি...'

গিলটি মিয়া আগেই পৌঁছেচে দেয়ালের ক্বাছে, মিস জুডির পিছন থেকে সে বলল, 'আমার মন বলচে ট্রাকে সোহানাদি আচে।'

দু'হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে আছে স্টিয়ারিং হুইলটা সোহানা, পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডের সাথে। জীপটাকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল ও, কিন্তু হঠাৎ একদল লোককে একটা লাইট মেশিনগান জোড়া লাগাতে দেখে বন বন করে ঘোরাতে শুরু করল হুইলটাকে সে। তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল ট্রাকটা, চরকির মত সিকি পাক ঘুরে সোজা ছুটল সামনের দিকে।

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল লোকগুলো, উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ, দ্রুত মুখের সামনে হাত তুলল তারা। বিপদটা টের পেতে আরও দু'সেকেন্ড সময় লাগল তাদের। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে, কিন্তু দু'জন হতভম্ব লোক দেরি করে ফেলল। একটু বাঁ দিকে ঘোরাল ট্রাকটাকে সোহানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের পিছনে দ্বিতীয় লোকটা মাথা নিচু করে লুকিয়ে আছে, যেন এভাবেই সে আত্মরক্ষা করতে পারবে। ধাক্কা দিয়ে দু'জনকেই ফেলে দিল ছুটন্ত ট্রাকটা। মড় মড় করে হাড় ভাঙার এবং ফট্ করে একটা খুলি ফাটার স্পষ্ট শব্দ কানে ঢুকল সোহানার। আবার একটু উঁচু হয়ে উঠল একদিকে ট্রাকটা, বাঁ দিকের চাকাগুলো মেশিনগানের উপর চড়ছে, পিষে সমান করে দিচ্ছে পাথরের সাথে।

গুলির আওয়াজে কান না দিয়ে দ্রুত আবার বাঁক নিচ্ছে সোহানা। মেশিনগানের উপর দিয়ে ফিরে আসছে আবার সে, খুঁজছে জীপটাকে। সামনেটা উঁচু হয়ে গেছে, সেখানে উঠেই জীপটাকে দেখতে পেল ও। বিদ্যুৎবেগে নামছে ট্রাকটা ঢাল বেয়ে সোজা জীপটার দিকে। মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রায় অবধারিত। কিন্তু বিপদটা দেখতে পেয়ে দিক-ভ্রান্তের মত বাঁক নিল জীপের ড্রাইভার। তার পাশে বসা সেক্রেটারি লোকটা একটা পিস্তল তুলল। এক ঝলক আগুনের ফুলকি দেখল সোহানা, সেই সাথে চোখের সামনে উইন্ডস্ক্রিনটাকে শতধা বিভক্ত হয়ে ফেটে যেতে দেখল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে আগেই মাথাটা নামিয়ে নিয়েছে ও।

বাঁক নিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারল জীপের ড্রাইভার। সামনে পাহাড়ের উঁচু ভিত দেখতে পাচ্ছে সে, এগোবার রাস্তা নেই। ব্রেক কষে দাঁড় করাল জীপটাকে, ঘোরাবার জায়গাও নেই, ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনছে। সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করল না সোহানা। হুইল চেপে ধরে থাকল শুধু, বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে জীপের পাশে গুঁতো মারল ট্রাক। লাফ দিয়ে নেমে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল সেক্রেটারি। কিন্তু পা দুটো মাটিতে নামার আগেই ধাক্কা খেল সে, তাকে এবং জীপটাকে ঠেলে পাহাড়ের গায়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল ট্রাকটা। ইস্পাত চ্যাপ্টা হবার বিকট আওয়াজের সাথে তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আসছে এবার সোহানা। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ট্রাকগুলোর দিক

থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকজন লোক ওর দিকে। নিচে থেকে সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল ও। পিছনের জানালার উপর নল রেখে তিনবার চাপ দিল ট্রিগার। ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো, ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে।

ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে ট্রাকের নাক। কিন্তু ছুটে আসছে সেটার দিকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। দ্রুত এদিক ওদিক হুইল ঘুরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগোচ্ছে সোহানা, কিন্তু ঠিক কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না ও। উইন্ডস্ক্রিনটা ফেটে ঝাপসা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

সংক্রামক ব্যাধির মত মিস জুডির বাতাস লেগেছে রবিন, বেনেদেতা, গিলটি মিয়া, কোনালি এবং জনসনের গায়েও। গা ঢাকা দেবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আনন্দে শোরগোল করছে ওরা, অথচ একটা বুলেটও আসছে না এদিকে। ওদের চেয়ে সোহানা অনেক বেশি বিপজ্জনক এখন। ট্রাকটা মাতালের মত টলছে, বাঙ্কোর লাগানো ইস্পাতের পাতে বুলেট লেগে আগুনের ফুলকি ছুটছে চারদিকে। 'সোহানা ভাই বিপদে পড়েছে,' হায় হায় করে উঠলেন মিস জুডি।

স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই ওরা। কেউ লক্ষ্য করছে না মিস জুডি কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগোতে শুরু করেছেন।

একহাতে হুইল ধরে আছে সোহানা। সাব-মেশিনগানের বাঁটটাকে হাতুড়ির মত অকেজো উইন্ডস্ক্রিনে মারতে যাচ্ছে ও। জানালা দিয়ে ঢুকল পর পর দুটো বুলেট, মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা, দ্বিতীয়টা ধাক্কা খেল সোহানার কাঁধে। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ও। পড়ে গেল সীট থেকে।

ঠিক এই সময় একটা চামড়া ঝুলে পড়া হাত এগিয়ে এসে ধরে ফেলল স্টিয়ারিং হুইলটাকে। চলন্ত ট্রাকের পাদানিতে কিভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন মিস জুডি কেউ তা দেখেনি। 'সোহানা ভাই? কোথায় লেগেছে ভাই? অ্যাকসিলারেটরটা চেপে রাখতে পারবে?'

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে সোহানা। মিস জুডি কোত্থেকে···ভাবছে সে, দূর, ভুল শুনছি আমি। কিন্তু অ্যাকসিলারেটরটা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল সে।

'মাই গড!' অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ট্রাকের পাদানিতে মিস জুডি!'

হাত দিয়ে চোখ কচলাচ্ছে কোনালি। 'স্বপ্ন দেখছি না তো!'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকবেন সে-সুযোগ নেই মিস জুডির। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা। এক হাত দিয়ে দরজার কিনারা ধরে আছেন, অপর হাতে ঘোরাচ্ছেন হুইলটাকে। মুচকি হাসলেন ট্রাকের নাক দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে দেখে। পাহাড়ের ভিতের দিকে এগোচ্ছে সেটা। দপ করে নিভে গেল মুখের হাসিটা, মিস জুডি দেখলেন সাইডের রিয়ার ভিউ মিররটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছেন তাঁর এবং ট্রাকের শরীরের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে বুলেটটা।

ট্রাকের নাক ঘুরে যেতে দেখে 'দৌড়াও!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। সবাই দেখছে, সোজা টানেলের দিকে ছুটে আসছে ট্রাকটা। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল ওরা।

অন্ধকার টানেলটা মুখ ব্যাদান করে আছে সামনে, দেখতে পাচ্ছেন মিস জুডি। শরীরটা ট্রাকের গায়ে সাঁটিয়ে আনলেন তিনি। ট্রাকের নাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে

ভেঙে গেল পাথরের নিচু পাঁচিলটা, তীরবেগে ছুটে গেল পাথরগুলো টানেলের ভিতর, দু'পাশের দেয়ালে গিয়ে ঠোকর খেয়ে গড়াচ্ছে। গুঙিয়ে উঠলেন মিস জুডি। নিতম্বের একটু উপরে লেগেছে, নাভি ফুটো করে বেরিয়ে এসেছে বুলেটটা। দরজার কিনারা এবং হুইল থেকে খসে এল হাত দুটো। পর মুহূর্তে টানেলে ঢুকে পড়ল ট্রাকটা। টানেলের মুখের সাথে ধাক্কা খেলেন মিস জুডি, গোটা শরীর থেঁতলে গেল, পাদানি থেকে ধুপ করে নিচে পড়ে গেলেন তিনি ঠিক টানেলে ঢোকার মুখের কাছে।

সোজা ছুটে গিয়ে বাঁকের কাছে, সামনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকটা।

প্রবেশপথের কাছে, একটু একটু নড়ছেন মিস জুডি। ঠাণ্ডা পাথরে কিলবিল করছে তাঁর হাতের আঙুলগুলো। এই সময় প্রায় একই সাথে দুটো বুলেট এসে লাগল তাঁর গায়ে, একবার ঝাঁকি খেয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে টানেলের ভিতর। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে ট্রাকের উপর থেকে বেনেদেতা আর রবিন নামিয়ে এনেছে অজ্ঞান সোহানাকে। বাইরেও কোন শব্দ নেই, অনেকক্ষণ হয়ে গেল গুলি করছে না শত্রুরা।

অন্ধকারে কাজ করছে ওরা, কারণ সোজা ছুটে এলে কারও না কারও গায়ে গুলি লাগবেই।

সোহানাকে বাঁকের এদিকে নিয়ে শেষ প্যারাফিন ভর্তি বোতলের সলতেটা জ্বালল বেনেদেতা। বাঁ কাঁধের বেশ খানিকটা নিচের দিকে গুলি খেয়েছে সোহানা, এখনও হু হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

অন্ধকার দেয়ালের কাছ থেকে এগিয়ে এলেন সিনর বরগুয়িজ। 'ফর গডস সেক, কি ঘটছে জানাও আমাকে।'

'জেনেও কিছু করার নেই তোমার,' বলল বেনেদেতা। 'যাও, আবার শুয়ে পড়ো তুমি।'

'মিস জুডি কোথায়?' রবিনের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন তিনি।

'বোধহয় মারা গেছেন,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল রবিন। সোহানার কাঁধে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ও। 'আশ্চর্য, আমরা কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারিনি!'

রবিনকে সাহায্য করছে গিলটি মিয়া। 'মারা গেচেন, দেকেচি আমি। সোহানাদিকে বেঁচিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেলেন।' গলাটা বুজে এল তার।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জনসন। 'নিজেকে আমার কাপুরুষ মনে হচ্ছে।'

'পাহারায় থাকা দরকার একজনের,' বলল কোনালি। সাব-মেশিনগানটা রয়েছে তার হাতে। 'একটু পরই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক, আমার মনে হয় সেজন্যেই অপেক্ষা করছে ওরা।' সাব-মেশিনগানটা তুলল ও। 'কেউ চালাতে জানো এটা?'

'রেকে যাও,' বলল গিলটি মিয়া। 'দরকার হলে ডেকো আমাকে। তুমি ক্রস-বো আর বোল্ট দুটো নিয়ে যাও।'

তাই করল কোনালি। অসম্ভব হাঁপাচ্ছেন সিনর বরগুয়িজ, তাঁকে ধরে ভিতর

দিকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল জনসন।

নড়ে উঠে চোখ মেলে তাকাল সোহানা। 'মিস জুডি কোথায়?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল ও।

ম্লান মুখে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল সোহানা।

যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করল ওরা সোহানার জন্যে। বেনেদেত্তাকে তার দেখাশোনার জন্যে রেখে উঠে দাঁড়াল রবিন। ট্রাকের দিকে এগোচ্ছে ও, সাব-মেশিনগানটা তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল গিলটি মিয়া।

ট্রাকের পাশে শুয়ে আছে কোনালি। রবিন আর গিলটি মিয়া তার দু'পাশে চলে এল ক্রল করে।

'ট্রাকটাকে চালানো যাবে আর?'

'বোধ হয় যাবে,' বলল রবিন। 'কিন্তু তাতে লাভ কি?'

'চেষ্টা করলে পালানো যায় না?'

'অসম্ভব। কোথায় পালাবে তুমি? টানেলের মুখ থেকে বেরুলেই হাজার হাজার গুলি ছুটে আসবে। তাছাড়া, সেই ব্রিজের কাছে ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? ওখানেও নিশ্চয়ই লোকজন আছে ওদের, তারপর এদিক থেকে ধাওয়া করবে—মাঝখানে পড়ে যাব আমরা।'

'অনেক ক্ষতি হয়েচে ওদের, তাই খামোশ হয়ে আচে।'

'কিন্তু,' বলল রবিন, 'বিজয়ের দোরগোড়ায় এসে হাল ছেড়ে দেবার লোক নয় এরা। পাহারা দিয়ে এখানে আমাদেরকে আটকে রাখতে পারলেও উদ্দেশ্য পূরণ হবে ওদের—সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাব আমরা।'

চুপ করে গেল ওরা। খানিকপর নিঃশব্দে পিছিয়ে এল বাঁকের কাছে রবিন, ত্যরপর উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে এল সোহানার কাছে। বিছানা থেকে সিনর বরগুয়িজও চলে এসেছেন ওর কাছে।

'কি অবস্থা বাইরে?' জানতে চাইল সোহানা।

'চুপচাপ।'

'শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে যাচ্ছে মনে করো তুমি, রবিন?' সিনর বরগুয়িজ জানতে চাইলেন।

'আমাদের কোন আশা নেই,' সংক্ষেপে উত্তর দিল রবিন।

'হুঁ,' গম্ভীর হলেন সিনর বরগুয়িজ। 'অথচ একটু আগে আশ্চর্য সুন্দর এক কর্ডিলেরার স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। ভাবছিলাম তোমাকে কাজে লাগাব।'

'আমাকে কাজে লাগাবেন মানে?'

'প্রশংসা করা হয়ে যায়, তবু এখন বললে কিছু এসে যায় না,' বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার মত উদ্যোগী, মহৎ-প্রাণ ছেলে দরকার আমার। অন্তত আমার ব্যক্তিগত বিমানের জন্যে ভাল একজন পাইলট তো আমার দরকারই। তুমি যদি কর্ডিলেরায় থাকতে চাও, এয়ারফোর্সেও তোমাকে একটা পজিশন দেয়ার কথা চিন্তা করতে রাজী আছি আমি।'

মুহূর্তের জন্যে হলেও ভুলে গেল রবিন যে তার জীবনের আয়ু বড়জোর আর

কয়েকটা ঘন্টা মাত্র। বলল, 'আপনার প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বৃদ্ধ রাজনীতিবিদও বিপদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন, দেশের সমস্যা সমাধান করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। 'তোমার প্রথম কাজ হবে এইটথ স্কোয়াড্রনটাকে কলুষ-মুক্ত করা। বেনেদেতার ঘাড়ে প্রাইমারী শিক্ষার সমস্যাগুলো চাপাব—আমি চাই আগামী বছর থেকে প্রতিটি ছেলেমেয়ে যেন স্কুলে যেতে পারে...'

গালে হাত দিয়ে বসে অবাক বিস্ময়ে ওদের কথা শুনছে প্রফেসর জনসন। 'কে পাগল? আমি না আপনারা?'

'জানি মারা যাব,' বলল বেনেদেতা, 'কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছি, স্বপ্ন দেখতে দোষ কি?' রবিনের চোখে চোখ রাখল সে।

হাসছে রবিন।

'রানা আর লোপেজের কথা ভাবছি,' ব্যথায় মুখ কুঁচকে বলল সোহানা। 'কে জানে কতদূর কি করতে পেরেছে ওরা!'

রাত্রি।

ট্রাকের হেডলাইট জেলে টানেলের মুখটা আলোকিত করে রেখেছে ওরা। কিন্তু সেই থেকে আর একটাও গুলি করেনি, বাইরে ওদের কোন সাড়া শব্দও নেই। গভীর রাতে গিলটি মিয়ার কাছ থেকে সাব-মেশিনগান চালাবার সহজ নিয়মটা শিখে নিল রবিন আর কোনালি। গিলটি মিয়াকে বিশ্রামের জন্যে ভিতর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'উঁকি ঝুঁকি দিয়ে এবার দেখা দরকার কি করছে ওরা। ওদের এই নিষ্ক্রিয়তা আমার কাছে ভীতিকর লাগছে।'

'যাও,' বলল কোনালি, 'কিন্তু খুব সাবধানে।'

সাব-মেশিনগানটা নিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে রবিন। টানেলের মুখটা গজ দশেক দূরে থাকতে থামল ও, এর বেশি এগোনো বিপজ্জনক। টানেলের কাছ থেকে অনেক দূরে, পঞ্চাশ গজের কম হবে না, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক দুটো। কুয়াশায় ঘোলাটে দেখাচ্ছে হেডলাইটগুলোকে। বাঁ দিকের একটা আলো কেঁপে উঠল একবার, রবিন বুঝতে পারল ওটার সামনে দিয়ে চলে গেল কেউ।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল রবিন, শূন্যে হাত তুলে নাড়ল সেটা দু'বার—কিন্তু ও যা ভেবেছে তাই, শত্রুরা টানেলের ভিতর ওকে দেখতে পাচ্ছে না। হাতড়ে পাথরগুলো জড় করল ও, সেগুলো দিয়ে নিজের সামনে আঠারো ইঞ্চি উঁচু একটা পাঁচিল তৈরি করল। এটার পিছনে শুয়ে থাকলে রাইফেলের বুলেট অন্তত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ফিরে এসে কোনালিকে বলল, 'কোন সাড়া শব্দ নেই ওদের। তুমি থাকো এখানে, আমি ট্রাকটা পরীক্ষা করে দেখি।'

আধঘন্টা পর বাঁক নিয়ে ফিরে এসে দেখল রবিন জেগে আছে সোহানা, ব্যথায় ছটফট করছে সে।

'ট্রাকের কি অবস্থা দেখলে?'

'দুটো টায়ারের ক্ষতি হয়েছে, তবে টিউবগুলো ফুটো হয়নি একটাও,'

সোহানার পাশে বসে পড়ে বলল রবিন। 'পেট্রল ট্যাঙ্কটাও অক্ষত রয়েছে। কিন্তু স্টিয়ারিং এবং ইঞ্জিনের কথা বলতে পারি না। বোধহয় একেবারে অচল হয়ে যায়নি।'

'আমার মনে হয় শেষ চেষ্টা হিসেবে ট্রাকে চড়ে বেরিয়ে যাবার ধারণাটা মন্দ নয়,' বলল সোহানা।

'দেখা যাক,' এবার রবিন ধারণাটা উড়িয়ে দিতে পারল না।

সকালবেলা সবাইকে খেতে দিয়ে বলল বেনেদেতা, 'খাবার এবং পানি দুটোই শেষ হয়ে গেল।'

খবরটাকে সহজভাবেই নিল সবাই। কারও মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। শুধু সোহানা বলল, 'খুব বেশি প্রয়োজন দেখা দিলে র‍্যাডিয়েটর থেকে সামান্য একটু পানি বের করে নেয়া যাবে। কিন্তু সমস্যার সমাধান এটা নয়। রবিন, ট্রাকটাকে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখো তুমি।'

খানিক পর ফিরে এসে বলল রবিন, 'ট্রাক চালানো যাবে। কিন্তু টানেলের বাইরে ওরা পাথরের শেলটার তৈরি করে কড়া পাহারা দিচ্ছে...'

'কুয়াশা কি...'

'পড়ছে, তবে গাঢ় নয়।'

'তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।'

দুপুরের দিকে উঠে বসল সোহানা। বাঁ হাতটা অসাড় ভাবে ঝুলছে শরীরের পাশে। কিন্তু ডান হাতে ধরে আছে লোডেড পিস্তলটা। আঠারো ইঞ্চি উঁচু রবিনের পাঁচিলটার কথা কানে গেছে ওর, সেখানে গিয়ে বাইরেটা দেখতে চায়, কারও বারণ শুনবে না।

কিছুই দেখার নেই বাইরে। লোকজন শেলটারের ওপারে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছে, সিগারেট ফুঁকছে। কোন ব্যস্ততা নেই তাদের মধ্যে। 'উদ্দেশ্য কি ওদের?' বাঁকের কাছে ফিরে এসে বলল সোহানা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে ওরা পরস্পরের, কেউ জবাব দিতে পারল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে যাচ্ছে, এই সময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জনসন। 'ফর গডস সেক, কিছু একটা করো কেউ—এভাবে বেশিক্ষণ থাকলে এমনিতেই দম আটকে মারা যাব!'

'কিছু কি করব বলে দাও!' মারমুখো হয়ে উঠল কোনালি।

বোবা হয়ে গেল জনসন।

খানিক পর পিস্তল নিয়ে নিচু দেয়ালের কাছে, রবিনের পাশে চলে এল সোহানা, বলল, 'ট্রাকে চড়ে যদি পালাতে চাই, আর দেরি করার কোন মানে হয় না। সিনর বরগুয়িজের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে আজ। তাঁকে বরং ড্রাইভিং সীটের পাশে তোলার ব্যবস্থা করো। তুমি ড্রাইভ করতে পারবে তো?'

'পারব,' বলল রবিন। তারপর সটান সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাপের মত কত আর বুকে হাঁটা যায়, ভাবছে সে; মানুষের মত একবার অন্তত হাঁটি। দিব্যি ট্রাকের কাছে ফিরে এল সে। সন্ত্রাসবাদীরা হয় তাকে দেখতে পায়নি, অথবা দেখেছে কিন্তু গ্রাহ্য করেনি। কোন গুলি ছোঁড়া হলো না।

ট্রাক নিয়ে টানেল থেকে বেরুবার জন্যে তৈরি হতে খুব বেশি সময় নিল না ওরা। রবিন নিচু পাঁচিলের কাছে ফিরে আসতে সোহানা তাকে বলল, 'বারোজন পর্যন্ত গুনেছি, সংখ্যায় আরও বেশি হতে পারে ওরা। এখন বেরুলেই গুলি করে বারোটা বাজাবে আমাদের। গাঢ় কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।'

সুতরাং অপেক্ষা করছে ওরা। অপেক্ষা করছে শত্রুরাও। বিকেলে তিনটের সময় নড়েচড়ে সোহানা বলল, 'মনে হচ্ছে···না।'

কিন্তু এক মুহূর্ত পর ঝট্ করে মাথা তুলল ও। 'ওটা একটা···তুমি শুনতে পাচ্ছ না, রবিন?'

'কি শুনব?' ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের।

'প্লেন—অনেকগুলো,' উত্তেজিত ভাবে বলল সোহানা।

কান পাতল রবিন। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মাই গড!' ঝট্ করে সোহানার দিকে তাকাল ও। 'কাদের? ওদের, না আমাদের?'

ইতিমধ্যে মাথার উপর এসে পড়েছে একটা প্লেন, তীক্ষ্ম শব্দে চাপা পড়ে গেল সোহানার উত্তরটা।

উত্তরটা শুনতে না পেলেও, পরমুহূর্তে স্বচক্ষে দেখতে পেল রবিন। মাথা তুলে নিচু পাঁচিলের উপর দিয়ে টানেলের মুখের দিকে আতঙ্কিত, স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। চৌকো একটা সিনেমার পর্দার মত লাগছে আকাশটাকে, সেই পর্দার গায়ে একটা প্লেনকে দেখতে পাচ্ছে, প্লেনটা নাক নিচু করে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে এদিকে, কি যেন পড়ছে দুটো ডানা থেকে, বাষ্প দেখতে পাচ্ছে রবিন।

'রকেট!' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা। 'ফর গডস সেক, গেট ডাউন!'

তেরো

স্যাবরগুলোর সাথে ঝাঁক বাঁধার জন্যে ওদের সমান উঁচুতে উঠে এসেছে রানা প্লেনটা নিয়ে। ওকে আসতে দেখে পরস্পরের সাথে দীর্ঘ দূরত্ব সৃষ্টি করে অপেক্ষা করছে ওরা। প্রতি সেকেন্ডে স্পীড বাড়িয়ে পিছন দিক থেকে আসছে রানা, সাইটে ধরে রেখেছে লীডারকে। ঝাপ্টা মেরে সেফ্‌টি সুইচগুলো অফ করল ও, বুড়ো আঙুল বুলিয়ে আদর করছে ফায়ারিং বাটনটাকে। মুচকি হাসল একটু, ভাবছে, কোত্থেকে কি এসে আঘাত করল টেরও পাবে না বাছাধন।

এয়ারফোনগুলো একনাগাড়ে উৎপাত করছে কান দুটোর উপর, কর্নেল পোয়ালোকে ডাকছে লীডার। অবশেষে, কর্নেলের রেডিও নষ্ট হয়ে গেছে ধরে নিয়ে বলল সে, 'আপনার তরফ থেকে সাড়া পাচ্ছি না, তাই আক্রমণে আমিই নেতৃত্ব দিচ্ছি।'

বুঝতে পারল রানা, এয়ার ফিল্ডে থাকতেই আক্রমণের প্ল্যান সম্পর্কে জানানো হয়েছে ওদেরকে। লীডার থামতেই ফায়ারিং-বাটনে চাপ দিল ও।

শূন্যে সেই অতি পরিচিত ঝাঁকিটা অনুভব করল অনেকদিন পর রানা, দেখল

রঙিন সরল রেখা সৃষ্টি করে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে ট্রেসার শেলগুলো। সেগুলো যখন বিস্ফোরিত হলো, আলোর অসংখ্য ঝিলিক মৌমাছির মত চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল লীডারের স্যাবরটাকে। অকস্মাৎ প্লেনটা বিস্ফোরিত হয়ে কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল, শুধু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল হৃৎপিণ্ডের মত একটুকরো আগুন।

দিক বদলে ধ্বংসস্তূপটাকে পাশ কাটাল রানা। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিতে শুরু করে একটানা উঠে যাচ্ছে উপরে। অন্যান্য পাইলটদের আতঙ্কিত বিস্মিত চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে ও, কয়েক মুহূর্ত পর ওদের একজন বলল, 'চুপ। ওকে নিচ্ছি আমি।'

আকাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল ওদেরকে রানা। একটা স্যাবর আচমকা ডাইভ দিয়ে নেমে যাচ্ছে মাটির দিকে, অপরটা বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে উঠে আসছে উপর দিকে, ওর পিছনে জায়গা দখল করার উদ্দেশে। তাকিয়ে আছে রানা, এই সময় দেখতে পেল ধাবমান পাইলট তার রকেটগুলো লক্ষ্যহীনভাবে যেদিক ইচ্ছা ছুঁড়তে শুরু করেছে। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে ও। দ্রুত গতি আদায়ের জন্যে প্লেনের ওজন কমিয়ে ফেলছে পাইলট। মুহূর্তের জন্যে ওরও তাই করার ঝোঁক চাপল, ভাবল, খোলা আকাশেই চ্যালেঞ্জ করা যাক শত্রুকে। কিন্তু, না, ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হবে না ওর। তাছাড়া, নিজের রকেটগুলো অন্য কাজে লাগাতে হবে ওকে।

কন্ট্রোল কলাম সামনে ঠেলে দিল রানা, তীক্ষ্ণ চিৎকার জুড়ে ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে ওর স্যাবর। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিয়েছে ও। ডাইভ প্রতিযোগিতায় ষোলোআনা জিতে যাবার সম্ভাবনা ওর প্রতিপক্ষের। তাছাড়া ট্রেনিংয়ের সময় হাজার বার বলে দেয়া হয়েছে ওকে আকাশ যুদ্ধে কখনোই হাইট লুজ কোরো না, ভুলেও না।

মিররে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। একটু পরই পিছন দিকে দেখতে পেল স্যাবরটাকে, দ্রুত কাছে চলে আসছে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। এখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছে এবার গুলি করবে ওকে প্রতিপক্ষ। দ্রুত আবার স্টিকটা সামনে ঠেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আত্মহত্যার ভঙ্গিতে খাড়া ডাইভে।

মাটির এত কাছাকাছি এমন একটা কল্পনাতীত কাণ্ড করে বসবে রানা, ভাবতেই পারেনি প্রতিপক্ষ, গোলাটা অনেক উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল রানা, দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এবারটা তাকে হারিয়ে দিয়েছে ও। সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে এখন শুধু চেষ্টা করছে চারদিকের পাহাড়ের গায়ের সাথে প্লেনটা যাতে ধাক্কা না খায়। সাউন্ড ব্যারিয়ারের কাছাকাছি এসে গেছে স্যাবর। ডাইভ থেকে উত্থানের সময় গোটা প্লেন থরথর করে কাঁপতে শুরু করায় ভয় হলো ওর—ডানা দুটো ছিঁড়ে না যায়।

খাড়া অবস্থা থেকে নাক তুলে সোজা হয়ে মাটির সাথে সমান্তরাল ভাবে ছুটছে স্যাবর, দুশো ফিট নিচে তুষার আর পাথর মিলেমিশে একাকার ধূসর এক পোচ রঙের মত দেখাচ্ছে। কয়েকশো ফিট উপরে উঠে দীর্ঘ চক্কর মেরে পাহাড়গুলোর কাছ থেকে দূরে সরে আসছে রানা, খাদ আর ব্রিজটাকে খুঁজছে। এক মুহূর্ত পরই

খাদটা চোখে পড়ল ওর, তারপর দেখতে পেল আস্ত ব্রিজটাকে। উপর দিয়ে উড়ে গেল ও, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখার চেষ্টা করল দুপাশটা, কিন্তু নিজেদের বা শত্রুদের কাউকে দেখতে পেল না। রাস্তাটার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্লেন।

কোর্স বদল করে পাহাড়ের গা ঘেঁষে মাইনের দিকে এগোচ্ছে রানা। হঠাৎ এক হাজার ফিট উপরে দেখতে পেল একটা স্যাবরকে, দুটো রকেট ছুঁড়ছে। তিন নম্বর স্যাবর এটা, ভাবল রানা, দেরি করে ফেলেছি আমি।

আবার বাঁক নিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজের সাথে মাইনের উপর দিয়ে চলল রানা। নিচে দেখা যাচ্ছে এয়ার-স্ট্রিপটা। সামনে কেবিনগুলো, কয়েকটা ট্রাক, পাথর সাজিয়ে তৈরি করা প্রকাণ্ড একটা তীর-চিহ্ন, পাহাড়ের ভিতের দিকটা নির্দেশ করছে। তীরচিহ্নের মাথা বরাবর পড়েছে রকেট দুটো, গুহামুখের কাছাকাছি। কালো ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ উঠে আসছে উপর দিকে। 'ওরা বেঁচে থাকলে হয়!' আপন মনে বলল রানা। এক মিনিট পর দ্রুত একটা ডিগবাজি খেয়ে আগের পথ ধরে ফিরে আসতে শুরু করল ও, কিন্তু এরই মধ্যে পিছু নিয়েছে দ্বিতীয় প্লেনটা। উপর আকাশে ধোঁকা দিয়েছিল এটাকে রানা। আবার খুঁজে পেয়েছে ওকে, একের পর এক গোলা ছুঁড়ছে দূর থেকে। কিন্তু দূরত্ব অনেক বেশি এখনও, ভয়ের কিছু নেই। পাইলট একবার ধোঁকা খেয়ে আশা করছে, রানা আবার কোন কৌশল দেখাবে। ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে সে, অনুসরণ করছে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে। রকেট ফেলে দিয়ে ওজন কমানো দরকার এখন, ভাবল রানা।

টার্গেট দেখতে পেল ও। কিন্তু আঘাত করতে হলে একটা সাবলীল ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে যেতে হবে ওকে, সেক্ষেত্রে পিছনের প্রতিপক্ষ দারুণ একটা অনুকূল সুযোগ পেয়ে যাবে ওকে আঘাত করার। তবু ঝুঁকিটা নিতেই হবে এখন। নাক নিচু করে বিদ্যুৎগতিতে নামতে শুরু করল রানা, সাইটে চোখ রেখে ট্রাক, কেবিন এবং শেলটারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে ও। এক হাতে রকেট-আর্মিং সুইচগুলো অন করল ও, প্রায় একই সাথে ফায়ার করল।

লোকগুলো হাত নাড়ছে পাইলটের উদ্দেশে। শেষ মুহূর্তে যখন দেখল স্যাবর থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যু নেমে আসছে, ছুটতে শুরু করল তারা। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। ট্রাক এবং লোকগুলোর মাঝখানে আটটা রকেট বিস্ফোরিত হলো। সগর্জনে উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা তিন টন ওজনের একটা ট্রাক লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে কাত হয়ে পড়ে গেল।

রকেট খালাস করে হালকা হয়ে গেছে রানার স্যাবর; অনেক বেড়ে গেছে স্পীড। জিরো ফিট উচ্চতায় সগর্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে এয়ার-স্ট্রিপের উপর দিয়ে, পিছনের শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্যে। এত নিচে না নেমে উপায় ছিল না রানার। রানওয়ের শেষ মাথার কাছে আরও নিচে নামল প্লেনটা, বিধ্বস্ত ডাকোটার উপর পৌঁছে উন্মত্তের মত বাঁক নিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছুটল সোজা।

মিররে চোখ রেখে পিছনটা দেখছে রানা। ওর প্রতিপক্ষ অনেক উঁচু থেকে, অনেক বড় জায়গা নিয়ে বাঁক নিচ্ছে। নিঃশব্দে হাসছে রানা। এই সুযোগ।

পাহাড় ঘেঁষে ঢালের সাথে সমান্তরালভাবে মাটি থেকে মাত্র ত্রিশ ফিট উপর দিয়ে উড়ছে রানা। ঝুল-পাথরের বাঁকা পিঠ বা তীক্ষ্ণ-মুখো খাড়া স্তম্ভের সাথে

স্যাবরের পেটের ধাক্কা লাগার ভয় রয়েছে, রানা যদি এক চুল ভুল করে হিসেবে। ত্রিশ সেকেন্ড লাগল খোলা আকাশে পৌঁছুতে, এরই মধ্যে জুলফি থেকে ঘাম গড়াতে শুরু করেছে ওর।

চারদিকে এখন পাহাড় নেই। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল শত্রু, নাক নিচু করে ঝুঁকে পড়ছে সে আক্রমণের জন্যে। কিন্তু এটাই আশা করছিল রানা। অকস্মাৎ ডিগবাজি খেতে শুরু করল ওর স্যাবর, সেইসাথে বিদ্যুৎবেগে সোজা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এক নিমেষে তিনবার ডিগবাজি খেয়ে উল্টোদিকে ছুটছে এখন প্লেনটা। পিছন দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে হাসছে রানা। পরীক্ষা করে বুঝে নিয়েছে সে—ভীতু পাইলট, কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নয়। এইবার আক্রমণ করা যেতে পারে মনে করে সোজাসুজি শত্রুর প্লেনের দিকে নাক ঘুরাল রানা।

দুটো স্যাবর জেট দুদিক থেকে একই সরল রেখা ধরে পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘণ্টায় পনেরোশো মাইল বেগে দূরত্ব কমছে দেখে প্রতিপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস হলো মুখোমুখি সংঘর্ষই রানার উদ্দেশ্য। ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত নাক ঘুরিয়ে নিল সে তার নিজের প্লেনের। রানাও নাক ঘুরাল, কিন্তু একটু দেরিতে—ফলে শত্রুর ঠিক পেছনে চলে আসতে কোনই অসুবিধে হলো না তার। এক মহূর্ত সময় নষ্ট না করে ফায়ার করল রানা। একেবারে কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কামানের গোলা বিস্ফোরিত হলো মধ্য-আকাশে। দ্রুত দিক বদল করল রানা ধ্বংসস্তূপকে পাশ কাটাবার জন্যে।

চোদ্দ

কানে তালা লেগে গেছে রবিনের। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ টানেলের ভিতর এখনও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু কিছুই ঢুকছে না তার কানে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে টানেলটা। খক খক করে কাশছে সে, দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। দুই হাতে পাথর আঁকড়ে ধরে টানেলের মেঝের সাথে চেপে রেখেছে মুখটাকে।

একই অবস্থা সোহানারও, তবে আগে সংবিৎ ফিরল ওরই। বেঁচে আছে এবং নড়াচড়া করতে পারছে এখনও, এটুকু বুঝতে পেরে মাথা তুলে টানেলের মুখের দিকে তাকাল সে। ধুলোর মধ্যে আবছাভাবে একটু আলো দেখতে পাচ্ছে। পাথর সাজিয়ে তীরচিহ্ন কেন তৈরি করেছিল শত্রুরা, বুঝতে পারছে এখন পরিষ্কার। ফাইটারের পাইলট প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছে লক্ষ্যে আঘাত করতে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হবে না। 'রবিন, এক্ষুণি বেরুতে হবে এখান থেকে। বেরোতে না পারলে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে আমাদের!'

কিন্তু নড়ছে না রবিন। তার গায়ে ধাক্কা মারল সোহানা। রবিন ফিরে তাকাতে মূক অভিনয়ের সাহায্যে দু'হাত দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাবার ভঙ্গি করল সোহানা, তারপর পিছন দিকটা দেখাল ইঙ্গিতে।

ক্রল করে পিছিয়ে আসছে ওরা।

জনসন, কোনালি, গিলটি মিয়া এবং বেনেদেতা উঠল ট্রাকের পিছনে। ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন, তার পাশে সিনর বরগুয়িজ আগেই বসেছেন। ডান হাতে পিস্তল নিয়ে উঠল সোহানা।

স্টার্ট দেবার আগে সিনর বরগুয়িজের দিকে তাকাল রবিন, 'উঁহুঁ,' বলল সে, 'সীটে নয়, ফ্লোরে বসতে হবে।'

বিনা প্রতিবাদে সীট থেকে নেমে নিচে বসলেন সিনর বরগুয়িজ। সোহানা আগেই বসেছে।

স্টার্টার বাটনে চাপ দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

রিভার্স গিয়ার দিয়ে জানালা পথে পিছন দিকে তাকাল রবিন, তারপর ছেড়ে দিল ক্লাচ। দুলে উঠে পিছু হটছে ট্রাক, পাশের দেয়ালে ঘষা খাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রাকটাকে দাঁড় করাল সে।

ট্রাকের পিছনে মাথা নিচু করে বসে আছে গিলটি মিয়া, সেফটিক্যাচ অফ করা সাব-মেশিনগানটা দু'হাত দিয়ে বাগিয়ে ধরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত সে। গালে হাত দিয়ে বসে আছে একধারে জনসন। বেনেদেতা আর কোনালি নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে।

ঝাপসা উইন্ডস্ক্রিনটা ভাঙছে রবিন, শব্দ পাচ্ছে গিলটি মিয়া। রাইফেলের আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ হয়ে আছে তার। কিন্তু একটা গুলিও হচ্ছে না। সাহস করে মাথাটা তুলল এবার সে। যা দেখল, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো। টানেলের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত, ছেঁড়া-ফাড়া লাশ। একজন আহত লোক গোঙাচ্ছে, একটা পা এবং একটা হাত নেই তার। দুটো ট্রাকেই আগুন জ্বলছে, সামনেরটা পাড়ে আছে কাত হয়ে।

গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল রবিন ট্রাক। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ছুটল সামনের দিকে। সামনের বীভৎস দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। নিশ্চয়ই ভুলে সেম-সাইড করে ফেলেছে স্যাবর জেট। স্পীড কমাল না, সমতল জায়গাটা পেরিয়ে ঢালু রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে ট্রাকটাকে। ব্রিজের কাছে কি ঘটবে ভাবছে ও, এই সময় একটা জেট প্লেনের তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ শুনতে পেল।

মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে স্যাবর জেটটা। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে সব ক'টা শরীর, বিস্ফোরণের শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে—কিন্তু কিছুই ঘটল না। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে প্লেনটা।

চলন্ত ট্রাকটাকে উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে রানা। 'আরে, এখনও একটা অক্ষত রয়েছে!'—ভাবল ও। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে সেটার দিকে নামতে শুরু করল, বুড়ো আঙুল ঠেকে আছে ফায়ারিং-বাটনে। একেবারে শেষমুহূর্তে জানালায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলওয়ালা একটা মাথা দেখতে পেল ও, কেমন আবছামত পরিচিত লাগছে, ঠিক এই সময় মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা উপর দিকে। সোহানা!

পরম স্বস্তি এবং শান্তির শীতল ঝির ঝিরে একটা স্পর্শ অনুভব করল রানা মেয়েটাকে জীবিত দেখে। সোহানার মুখে ভয় আর নৈরাশ্যের ছায়া দেখে হাসল ও। সগর্জনে ট্রাকের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে আপন মনে বলল, 'আর ভয় নেই, সোহানা, কোন ভয় নেই—আমি এসে গেছি।'

স্যাবর নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে রানা। আকাশের চারদিকে তাকাচ্ছে। অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের কথা ভোলেনি ও। অনেক উঁচুতে উঠে—ট্রাকটাকে কেন্দ্র করে চক্কর মারতে শুরু করল বারবার। পাহাড়ী পথ ধরে হেলেদুলে ছুটছে ট্রাকটা।

প্লেনটার দিকে চোখ রেখে বলল রবিন, 'পাইলট বোধহয় ভাবছে আমরা ওদের দলেরই লোকজন।'

চিন্তিতভাবে উপর দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল ও। এই সময় চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'সেরেছে! আর একটা প্লেন আসছে!'

প্রথম প্লেনটাকে ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গেল সোহানার দৃষ্টি, দেখল আরেকটা স্যাবর বাঁক নিচ্ছে দ্রুত। সেটার সাথে ঝাঁক বাঁধার জন্যে নিচের প্লেনটা প্রায় খাড়া ভাবে উঠতে শুরু করেছে উপর দিকে। ধীরে ধীরে ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'উঁহুঁ, অন্যরকম লাগছে,' বলল সে। একটু বিরতি নিয়ে দেখল প্লেন দুটোর হাব-ভাব, তারপর বলে উঠল, 'মাই গড, ওরা লড়তে যাচ্ছে! পজিশন নেবার জন্যে পাঁয়তারা কষছে, দেখতে পাচ্ছ না!'

এক সেকেন্ড পরে হলেও পাইলটের অভিজ্ঞ চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ল, সায় দিল রবিন, 'হ্যাঁ, তাই তো, কিন্তু এর মানে কি?'

নিকট অতীতের কথা মনে রেখে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে আছে রানার প্রতিপক্ষ। রানাকে উঠতে দেখেই, দূরত্ব অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিল সে। কিন্তু তবু রানা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে স্যাবর নিয়ে উঠে আসছে দেখে রণে ভঙ্গ দিল সে, বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করে পাহাড়ের দিকে পালাচ্ছে। পিছু ধাওয়া করে খানিকদূর গেল রানা, তারপর কি মনে করে দিক বদলে উড়ে চলল অ্যান্ডেজের উপর দিয়ে।

'রানা আর লোপেজ! ওরা ফিরে এসেছে!' ফিস ফিস করে বলল সোহানা।

ব্রেক কষে ট্রাক দাঁড় করাল রবিন। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' ঝাঁপ দিয়ে নিচে নামল সে। চিৎকার করে বলল, 'নামো সবাই! মাথার ওপর যুদ্ধ নিয়ে খোলা জায়গায় থাকা উচিত হচ্ছে না। নামো, কুইক!'

'ওই আবার ধাওয়া করে আসছে একটা আরেকটাকে!' বলল সোহানা। পাহাড়ের উপরে দেখা যাচ্ছে আবার স্যাবর দুটোকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের মাথার উপর।

সোজা পথে এগিয়ে গিয়ে আলটিমিরোসের মাথার উপর অপেক্ষা করছিল রানা। ঘুরপথে সেদিকে যাচ্ছিল প্রতিপক্ষ। দূর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে আবার লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছে এদিকে। পিছনে আঠার মত লেগে গেছে রানা।

'পিচনের পেলেনটা আমাদের,' ট্রাক থেকে নেমে বোল্ডারের দিকে দৌড়াচ্ছিল গিলটি মিয়া, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে দাবি করল সে।

দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়েছে কোনালি, বেনেদেতা, জনসন। রবিন চিৎকার করে গা ঢাকা দিতে বলছে সবাইকে, কিন্তু কেউ কান দিচ্ছে না তার কথায়। অসুস্থ সিনর বরগুয়িজকে ছেড়ে যেতেও পারছে না সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে রয়েছে সোহানা, কিন্তু মুখের চেহারায় ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে

আশা নিরাশার ছায়া।

পিছনের স্যাবরের ডানা দুটোর নিচে আগুনের ফুলকি দেখা গেল, পরমুহূর্তে সামনের স্যাবরটা কালো ধোঁয়ার বোরখায় ঢাকা পড়ে গেল। এক সেকেন্ড পর বোরখার ভিতর বিস্ফোরিত হলো প্লেনটা। নাক উঁচু করে এই নিয়ে তৃতীয়বার দিক বদল করছে ধ্বংসস্তূপকে পাশ কাটাবার জন্যে রানা।

উল্লাসে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিল গিলটি মিয়া। তার সাথে যোগ দিল জনসন। পাগলের মত অট্টহাসি ছাড়ছে সে।

'থামো,' ধমক দিয়ে ওদেরকে থামিয়ে দিল রবিন। 'ওই আবার আসছে প্লেনটা। এখনও জানি না আমরা ও আমাদের শত্রু নাকি...'

বাঁক নিয়ে ওদের মাথার দিকে এগিয়ে আসছে স্যাবরটা। হঠাৎ সেটা ডিগবাজি খেল একটা। তারপর আরেকটা। তারপর আবার; আবার; আবার...। এদিক থেকে ওদিকে দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে ওদের মাথা, ডিগবাজি খেতে খেতে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল প্লেনটা।

বোবা, পাথর হয়ে গেছে ওরা। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে আর কোন ভয় নেই। ওই আবার ফিরে আসছে স্যাবর নিয়ে দুর্দান্ত পাইলট। আবার সেই কাণ্ড শুরু করল সে। প্রথমে নাক খাড়া করে নীল অসীমের দিকে উঠে গেল, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসতে শুরু করল নিচে। নামছে, নামছে, নামছে...

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল জনসন। থরথর করে কাঁপছে সে। মুক্তির প্রচণ্ড অনুভূতি উথলে উঠেছে তার মনের ভিতর, সর্বশরীর অবশ হয়ে গেছে।

ট্রাউজার থেকে ধুলো ঝাড়ছে প্রফেসর কোনালি। তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। চোখের পানি কেউ দেখে ফেললে লজ্জায় পড়তে হবে, ভাবছে সে।

সব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রবিনের বুকের উপর বেনেদেতা। দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষছে সে।

আর উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত মুখে স্যাবরটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা।

সিনর বরগুয়িজকে দেখে কে বলবে তিনি দু'মিনিট আগেও সাংঘাতিক অসুস্থ ছিলেন। মাথার উপর দুই হাত তুলে নাড়ছেন তিনি, মুখে মৃদু হাসি।

চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছে স্যাবরটা। ঠিক যখন মাথার উপর এসে পড়ল, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মস্ত এক স্যালুট ঠুকে অভিনন্দন আর শ্রদ্ধা জানাল রানাকে গিলটি মিয়া।

হঠাৎ লাফ দিয়ে কি যেন বেরিয়ে এল প্লেনটা থেকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওদের বুক। তারপরই দেখতে পেল ওরা, খুলে যাচ্ছে প্যারাস্যুটটা। সেটার শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা।

ক্ষত, আঘাত, বেদনা, শোক—সব ভুলে হেসে উঠল ওরা সবাই, ছুটল প্যারাস্যুট লক্ষ্য করে।

আবার ওরা ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন।

* * * *